প্রবন্ধ সমগ্র

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত





প্রবন্ধসমগ্র

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত

ভূমিকা

তহমিনা আলম

গবেষক

বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন

চিন্তা-চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম

কথাশিল্প প্রকাশন

প্রকাশকাল
এপ্রিল-২০২৩

প্রকাশক
মোঃ আশ্রাফুর রহমান
কথাশিল্প প্রকাশন
১২ বাংলাবাজার (সিকদার ম্যানশন)
ঢাকা-১১০০
০১৭১৮-৪৩৫৯৬১

গ্রন্থসত্ত্ব : প্রকাশক

প্রচ্ছদ : আক্কাস খান

কম্পোজ
মোঃ আবুল হোসেন

মুদ্রণ : সুন্দরবন প্রিন্টার্স
প্যারীদাস রোড
ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৩২০ টাকা মাত্র

ISBN 978-984-93904-4-3

Probandasamagro by Begum Rokeya Sakhawat, Edited KM Badiar Rahman
Published by Md. Asrafur Rahman, Kathashilpa Prokashan
12 Banglabazar (Sikdar Mension), Dhaka-1100

Price : 320 Taka Only. U$: 15

পরিবেশক

http://rokomari.com

সূচিপত্র

ভূমিকা	৭
বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সময়কাল	৭-২৬
বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : চিন্তা-চেতনার ধারা	২৭-৬৯
স্ত্রীজাতির অবনতি	৭১
নিরীহ বাঙ্গালি	৮০
অর্ধাঙ্গী	৮৩
সুগৃহিণী	৮৯
বোরকা	৯৮
গৃহ	১০৩
রসনা-পূজা	১১১
ঈদ-সম্মিলন	১১৬
আশা-জ্যোতিঃ	১১৭
দজ্জাল	১২০
সুবেহ্ সাদেক	১২৩
কূপমণ্ডূকের দর্শন	১২৫
নারী-পূজা	১২৮
নূতন পুস্তক ধর্ম্মসাধননীতি	১৩৫
সিসেম ফাঁক	১৩৭
চাষার দুক্ষু	১৩৮
এণ্ডি শিল্প	১৪২
"কাটা মুণ্ড কথা কয়"	১৪৮
রাঙ্ ও সোনা	১৫০
বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি	১৫১
লুকানো রতন	১৫৭
রানী ভিখারিনী	১৫৯
উন্নতির পথে	১৬২
সুলতানার স্বপ্ন	১৬৪
ডেলিশিয়া হত্যা	১৭৯
জ্ঞানফল	১৯৮
সৃষ্টি তত্ত্ব	২০৫
ইসলাম	২০৯

ভূমিকা

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সময়কাল

বাংলার মুসলিম নারীজাগরণের ইতিহাসে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) এক অনন্য ও অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন বাঙালি মুসলিম নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত। অসাধারণ প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব বলে যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত বাঙালি মুসলিম নারীসমাজকে তিনি দিয়েছিলেন আলোর সন্ধান, দেখিয়েছিলেন মুক্তির পথ। বেগম রোকেয়াই সর্বপ্রথম বাঙালি মুসলিম সমাজে পুরুষের সাথে নারীর সমাধিকার দাবি উত্থাপন করেন এবং নারী স্বাধীনতার সপক্ষে শক্তিশালী মতবাদ প্রচার করেন। নারীমুক্তি অর্জনের জন্য নারীশিক্ষার ব্যাপক প্রসার, নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি ও নারীকে অবরোধবাসিনী করে রাখার প্রথার মূলোচ্ছেদ– এই তিনটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে আমরণ তিনি আন্দোলন অব্যাহত রাখেন।

বেগম রোকেয়া জন্মকাল ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ। সেই সময়কাল ছিল বাঙালি মুসলিম সমাজ তথা সমগ্র ভারতীয় মুসলিম সমাজের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ও সংকটময় সময়কাল। ব্রিটিশ শাসকের অধীনে মুসলিম সমাজের সমকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল তখন চরমভাবে বিপর্যস্ত।

ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় উপমহাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন (১৭৯৩) ও লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ আইন (১৮২৮) প্রণয়ন করেন এবং ফারসীর স্থলে ইংরেজিকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে ঘোষণা করেন। ইংরেজ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত উপরোক্ত নীতিগুলি মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে মারাত্মক আঘাত হানে।

ইংরেজ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে বাংলার মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁদের জমির মালিকানা স্বত্ব হারায়। ফলত অভিজাত মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়। অপরদিকে এই আইনের ফলে বহু বিত্তশালী হিন্দুরা জমিদারি ক্রয় করে জমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করে।

পরবর্তীতে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ আইন মুসলমানদের ভাগ্য একেবারে উলটপালট করে দেয়। এই আইন মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে মারাত্মক আঘাতস্বরূপ ছিল, কারণ মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা লাখেরাজ সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল।

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রণীত উপরোক্ত নীতিসমূহের ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে।

শাসক ইংরেজদের নীতি ছিল বিজিত মুসলমানদের প্রতি বৈরীসুলভ। এ উদ্দেশ্যে শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ ইত্যাদি চাকরি থেকে ইংরেজরা মুসলমানদের পদচ্যুত করে এবং তাদের স্থলে হিন্দুদের নিয়োগ করে। কারণ ইংরেজরা জানত যে হিন্দু কর্মচারীগণ স্বাভাবিক কারণেই মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর অনুগত ও বিশ্বস্ত হবে। মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ শাসকদের বৈরী মনোভাব সম্পর্কে সমকালীন পত্রিকা দূরবীণ-এ বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। অথচ ইংরেজরা যখন এদেশে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তখন মুসলমানরা সরকারি গঠনমূলক কাজে এবং শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে একটি শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে সুপরিচিত ছিল। ইংরেজরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য সেনাবিভাগেও মুসলমানদের নিয়োগ বন্ধ করে দেয়। ফলস্বরূপ চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায় হতাশাজনকভাবে পিছিয়ে পড়ে।

'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন কর্তৃক ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে লর্ড রিপনকে প্রদত্ত স্মারকলিপি থেকে আমরা জানতে পারি যে, ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে গেজেটেড অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমান নিয়োগ করা হয়েছিল একসপ্তাংশ এবং ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে একদশমাংশ।

ইংরেজ শাসনামলে অর্থ উপার্জনের প্রধান দুইটি উৎস ভূমি ও চাকরি উভয়ই হারিয়ে মুসলমান সম্প্রদায় আর্থিক দিক দিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যায়।

শিক্ষা-দীক্ষায় একদা একটি শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে সুপরিচিত ছিল মুসলমান সম্প্রদায়। অথচ ইংরেজ শাসনামলে শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের চরম অবনতি পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত প্রাচ্য শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন ও ফারসীর স্থলে ইংরাজিকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে ঘোষণা করার পর হতেই শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনগ্রসরতা শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ্য, মুসলমান সম্প্রদায় যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি বিমুখতাভাব পথে তুলনামূলকভাবে অনেক অগ্রগামী হয়ে যায়। কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করাকে মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণের সালিম মনে করে সেই শিক্ষা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে।

এছাড়া ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রণীত শিক্ষা-পদ্ধতিতে মুসলমান ধর্মমত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা না থাকায় ঐ শিক্ষা গ্রহণ করা তারা নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করে। আবার রাজভাষার সম্মান হতে ফারসী স্থানচ্যুত হওয়াকে মুসলমানরা দেখেছেন শাসকগোষ্ঠীর সাথে কলিকাতার ইংরাজি-শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের একটি ষড়যন্ত্র হিসাবে। তাঁদের আশঙ্কা হয়েছিল, ফারসী ত্যাগ করলে তাঁরা স্বাধীন মনোবৃত্তি হারিয়ে 'দাস মনোভাবাপন্ন' হয়ে পড়বেন। ইংরাজি প্রবর্তনকে কোনো কোনো মুসলমান খ্রিস্টান ধর্মমতে দীক্ষা গ্রহণের পথে একপদ অগ্রসর বলে বিবেচনা করেছিল। এছাড়া তৎকালে মুসলিম সমাজে এ অহেতুক আশঙ্কাও বিরাজমান ছিল যে, ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণ ছেলেমেয়েদের কুপথে পরিচালিত করে।

এসব নানাবিধ কারণে মুসলমান সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি বিমুখতা পোষণ করে নিজেদের অনিষ্ট সাধন করে। অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায় ইংরেজ সরকার কর্তৃক

প্রবর্তিত শিক্ষানীতি সাদরে গ্রহণ করে নিয়ে শিক্ষা-দীক্ষায় প্রভূত উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এ সময় মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় হতাশাজনকভাবে পিছিয় পড়ে তা অতি পরিষ্কারভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে নিম্নোক্ত ছকে–যা থেকে শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের চরম অবনতি লক্ষ্য করি :

	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য	মোট
স্কুল	১,৪৯,৭১৭	২৮,০৮৬	১৫,৪৮৯	১,৯৩,৩০২
কলেজ	১,১৯৯	৫২	৩৬	১,২৮৭
মোট্	১,৫০,৯১৬	২৮,১৪৮	১৫,৫২৫	১,৯৪,৫৮৯

শিক্ষার অভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমান সমাজে নানাবিধ কুসংস্কার পরিলক্ষিত হয়। ইসলামের মূল আদর্শ সাম্যবাদ ও ভ্রাতৃত্বের নীতি থেকে ভারতীয় মুসলিম তথা বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায় তখন অনেক দূরে সরে যায়। তৎকালে মুসলিম সমাজে শ্রেণীভেদ প্রথার কঠোরতাও পরিলক্ষিত হয়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমানদের মধ্যে নিষ্ক্রিয় ভাব পরিলক্ষিত হয়। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধের ফারায়েজী আন্দোলন ও ওহাবী আন্দোলন যদিও ব্রিটিশ বিরোধী ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক আন্দোলন ছিল, তথাপি এ আন্দোলনগুলি ছিল মূলত ধর্মীয়। উক্ত আন্দোলনগুলির উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করে ইসলামের আদি অবস্থায় ফিরে যাওয়া।

ফারায়েজী আন্দোলন ও ওহাবী আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর পতনশীল বাঙালি মুসলিম সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই সংস্কার আন্দোলনগুলি উল্লেখযোগ্য ও যুগোপযোগী কোনো ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি। বরং এই সকল আন্দোলনের অসফল পরিণতিতে শাসক ইংরেজ ও শাসিত মুসলমানদের সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে। এবং বাঙালি মুসলিম সমাজের পশ্চাদমুখী প্রবণতা ও রক্ষণশীলতা আরও বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যস্ততা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালি মুসলিম সমাজ তথা সমগ্র ভারতীয় মুসলিম সমাজে চরম অবনতি ও অবক্ষয় পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় মুসলমানদের এই মহাসংকটকালে সমাজে আমরা নওয়াব আবদুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ ও সৈয়দ আমীর আলী–এই তিনজন সমাজসচেতন মহান মনীষীর আবির্ভাব লক্ষ্য করি; যাঁরা ইংরেজদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন ও মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দীর নিপীড়িত ও হতাশাগ্রস্ত ভারতীয় মুসলিম সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সেই শিক্ষা আন্দোলন ছিল শুধুমাত্র পুরুষ সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

স্বসমাজকে পাশ্চাত্য শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে আবদুল লতিফ 'Mohomedan Education In Bengal' শীর্ষক এক নিবন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলমানদের তৎকালীন শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্পর্কে এক চিত্র জনসম্মুখে তুলে

ধরেন। সেই সাথে তিনি, বিশেষ করে কলিকাতা মাদ্রাসার ইতিহাসও শ্রোতাদের সম্মুখে তুলে ধরেন। কিন্তু আবদুল লতিফ তাঁর অতি সারগর্ভ প্রবন্ধে কোথাও নারীশিক্ষা সম্পর্কে একটি কথাও উল্লেখ করেননি।

নারীশিক্ষা প্রশ্নে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ-র মধ্যেও আমরা কোনো প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় পাই না। তিনি কামনা করতেন যে, প্রাচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পারিবারিক জীবনের প্রতি মুসলিম নারীরা মনোযোগী হবেন।

তবে নারীর মর্যাদা উন্নতিকরণ ও নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে আমরা সৈয়দ আমীর আলীর মধ্যে কিছুটা সচেতনতাবোধের পরিচয় পাই। আমীর আলী অনুধাবন করেন যে, সমাজে প্রচলিত কঠোর পর্দা প্রথাই মুসলিম নারীশিক্ষার অনগ্রসরতার অন্যতম প্রধান কারণ, তাই তিনি এর কঠোরতা শিথিল করার প্রস্তাব উত্থাপিত করেন এবং সমসাময়িক তুর্কী মুসলিম মহিলা সমাজের উন্নত অবস্থা ভারতীয় মুসলমানদের অনুসরণমূলক দৃষ্টান্ত বলে অভিমত প্রকাশ করেন। নারীজাতির উন্নতি ব্যতীত সমাজের উন্নতি অসম্ভব, তাই আমীর আলী তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি স্বসমাজের নারীদের ইসলামের আদি যুগের সম্মানিত অবস্থায় উন্নীত করার আহ্বান জানান।

রক্ষণশীলদের বিরোধিতার ফলে তৎকালে নারীশিক্ষা বিষয়টি মুসলিম সমাজে অচলাবস্থায় পড়ে। আমীর আলী কর্তৃক 'Central National Mohammadan Association' এই অচলাবস্থা দূর করার জন্য একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল বহু বিতর্কিত নারীশিক্ষা বিষয়টি সম্পর্কে এমন একটি সমাধান বের করা যা প্রগতিবাদী ও রক্ষণশীল দুই দলেরই গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁরা কোনো সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন কিনা–তা আমাদের আজো অজানা। তবে একথা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে, 'ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' কর্তৃক ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে লর্ড রিপনকে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে মুসলিম নারীদের শিক্ষা সম্পর্কে পৃথকভাবে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু এটাও সত্য যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং 'সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশন'-এ মুহাম্মদ ইউসুফ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাসমূহে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি প্রথম উত্থাপন করেন।

সমাজে মুসলিম নেতৃবৃন্দের আবির্ভাব, তাঁদের শিক্ষা-আন্দোলন এবং সমাজের উন্নয়নের অভিপ্রায়ে তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের মুসলমানদের প্রতি সরকারের সহনশীল মনোভাব পরিলক্ষিত হয়, অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষার প্রতি মুসলিম সমাজের মানসিক পরিবর্তন হতে থাকে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও মুসলমান সমাজে পূর্বে যে অনুন্নত অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, ক্রমশ সেটা অপসারিত হতে থাকে।

এখানে লক্ষণীয় যে, কারিগরি বিদ্যালয়ের এবং কলেজের ছাত্র সমেত ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল ২৮,১৪৮ এবং ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২,৬১,১০৮ জনে দাঁড়ায়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিভাগে মুসলমান ছাত্র ছিল মাত্র ৮৫৬ এবং ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৩,২৬১ হয়। সরকারি এক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে

পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের আর্ট কলেজগুলিতে সুমলিম ছাত্রসংখ্যা ছিল ১২৫ কিন্তু ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে এই ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৩০ জনে দাঁড়ায়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও এ সময় মুসলমানদের অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা প্রশাসন ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার বিভিন্ন কলেজে অধ্যয়নরত মুসলিম ছাত্রসংখ্যা ছিল ৮১০ এবং ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে কলেজে অধ্যয়নরত মুসলিম ছাত্রসংখ্যা হয় ১,৬৩৯।

উপরোক্ত তথ্যের আলোকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ঊনবিংশ শাতব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মুসলমান পুরুষদের মধ্যে ধীরগতিতে শিক্ষা বিস্তার হতে থাকে এবং বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম ছাত্রদের আশাপ্রদ সংখ্যাবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। যদিও শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমান সম্প্রদায় তখনও অনেক পশ্চাৎপদ ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান পুরুষদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন শুরু হয়, কিন্তু দুঃখজনক যে, নারীশিক্ষা প্রশ্নে বাঙালি মুসলমান সমাজে তখনও রক্ষণশীলদের প্রভাবই প্রাধান্য লাভ করেছিল। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত বামাবোধিনী পত্রিকা-র এক তথ্য থেকে জানা যায়, সেই সময় মুসলমানগণ তাদের মেয়েদের স্কুলে শিক্ষা দিবার জন্য আগ্রান্বিত ছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান মেয়েদের মধ্যে লক্ষণীয় কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না বলে বামাবোধিনী পত্রিকা-য় ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় মন্তব্য করা হয়। অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক থেকেই সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় অতি অল্প সংখ্যক মুসলমান মেয়েদের স্কুলে পড়ার বিক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায়। এরও পূর্বে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মুসলিম বালিকার বিদ্যা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের তথ্য পাওয়া যায়। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম নারীসমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার তেমন একটা উল্লেখযোগ্য হারে হয়নি। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকা-র জানুয়ারি সংখ্যায় লোকগণনা রিপোর্টে কলিকাতায় নারীশিক্ষার অগ্রগতির অবস্থা সম্পর্কে বামাবোধিনী পত্রিকা-র সম্পাদকের মন্তব্য অতি তাৎপর্যপূর্ণ :

স্ত্রীশিক্ষার সর্বাপেক্ষা উন্নতি পারসী সমাজে এবং সর্বাপেক্ষা দুর্গতি মুসলমানদের মধ্যে।

১৮৮১-৮২ শিক্ষাবর্ষ বাংলার বিভিন্ন শিক্ষায়তনে মুসলমান ছাত্রীর সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	মোট ছাত্রী সংখ্যা	মুসলমান ছাত্রী সংখ্যা	হার
উচ্চ ইংরাজি বালিকা বিদ্যালয়	১৮৪	–	–
মাধ্যমিক ইংরাজি বালিকা বিদ্যালয়	৩৪০	৬	১.১
দেশীয় মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	৫২৭	৬	১.১
দেশীয় প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়	১৭,৪৫২	১,৫৭০	৮.০
শিক্ষয়িত্রী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৪১	–	–

বোরকার আবশ্যক হয়। রেলওয়ে ভ্রমণকালে সাধারণের দৃষ্টি (public gaze) হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঘোমটা কিম্বা বোরকার দরকার হয়।

সময় সময় ইউরোপীয়া ভগ্নীগণও বলিয়া থাকেন, "আপনি কেন পর্দা ছাড়েন না (Why don't you break off purdah)?" কি জ্বালা! মানুষে নাকি পর্দা ছাড়িতে পারে? ইহাদের মতে পর্দা অর্থে কেবল অন্তঃপুরে থাকা বুঝায়। নচেৎ তাঁহারা যদি বুঝিতেন যে তাঁহারা নিজেও পর্দা র (অর্থাৎ privacy র) হাত এড়াইতে পারেন না, তবে ওরূপ বলিতেন না। যদিও তাঁহাদের পোশাকেও সম্পূর্ণ পর্দা রক্ষা হয় না, বিশেষত সান্ধ্য-পরিধেয় (evening dress) ত নিতান্তই আপত্তিজনক। তবু তাহা বহু কামিনীর একহারা মিহি শাড়ি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

তারপর অন্তঃপুর ত্যাগের কথা—অন্তঃপুর ছাড়িলে যে কি উন্নতি হয়, তাহা আমরা ত বুঝি না। প্রকারান্তরে উক্ত স্বাধীনা রমণীদেরও ত শয়নকক্ষরূপ অন্তঃপুর আছে।

মোটের উপর আমরা দেখিতে পাই সকল সভ্যজাতিদেরই কোন না কোন রূপ অবরোধ প্রথা আছে। এই অবরোধ-প্রথা না থাকিলে মানুষ ও পশুতে প্রভেদ কি থাকে? এমন পবিত্র অবরোধ-প্রথাকে যিনি "জঘন্য" বলেন, তাঁহার কথার ভাব আমরা বুঝিতে অক্ষম।

সভ্যতা (civilization) ই জগতে পর্দা বৃদ্ধি করিতেছে! যেমন পূর্বে লোকে চিঠিপত্র কেবল ভাঁজ করিয়া পাঠাইত, এখন সভ্য (civilized) লোকে চিঠির উপর লেফাফার আবরণ দেন। চাষারা ভাতের থালা ঢাকে না; অপেক্ষাকৃত সভ্য লোকে খাদ্যসামগ্রীর তিন চারি পাত্র একখানা বড় থালায় (tray তে) রাখিয়া উপরে একটা "খানপোষ" বা "সরপোষ" ঢাকা দেন; যাঁহারা আরও বেশি সভ্য তাঁহাদের খাদ্য বস্তুর প্রত্যেক পাত্রের স্বতন্ত্র আবরণ থাকে। এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, যেমন টেবিলের আবরণ, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়—ইত্যাদি।

SH জিকালি যে সকল ভগ্নী নগ্নপদে বেড়াইয়া থাকেন, তাঁহাদেরই আত্মীয়া সুশিক্ষিআ (enligthtened) ভগ্নীগণ আবার সভ্যতার পরিচায়ক মোজা জুতার ভিতর পদযুগল আবৃত করেন। ক্রমে হাত ঢাকিবার জন্য দস্তানার সৃষ্টি হইয়াছে। তবেই দেখা যায়—সভ্যতার (civilization এর) সহিত অবরোধ-প্রথার বিরোধ নাই।

তবে সকল নিয়মেরই একটা সীমা আছে। এ দেশে আমাদের অবরোধ-প্রথাটা বেশি কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। যেমন অবিবাহিতা বালিকাগণ স্ত্রীলোকের সহিতও পর্দা করিতে বাধ্য থাকেন! কখন কোন প্রতিবেশিনী আসিয়া উপস্থিত হইবে, এই ভয়ে নবম বর্ষীয়া বালিকা প্রাঙ্গণে বাহির হয় না। এইভাবে সর্বদা গৃহকোণে বন্দিনী থাকায় তাহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের সুশিক্ষার ব্যাঘাত হয়। যেহেতু খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয়া আত্মীয়া ব্যতীত তাহারা অন্য কাহাকেও দেখিতে পায় না, তবে শিখিবে কাহার নিকট? নববধূদের অন্যায় পর্দা ও উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বিবাহের পর প্রথম দুই চারি মাস কেবল "জড় পুত্তলিকা" সাজিয়া থাকিতে বাধ্য হন! এরূপ কৃত্রিম অন্ধ ও বোবা হইয়া থাকায় কেমন অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা যে সশরীরে ভোগ করে, সেই জানে!! কথিত আছে, কোন সময় একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের নববধূর পৃষ্ঠে

ঘটনাক্রমে বৃশ্চিক দংশন করে—তিনি সে যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন! তৃতীয় দিবস "চৌথী"র স্নানের সময় অন্য স্ত্রীলোকেরা তাঁহার পৃষ্ঠের ক্ষত দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছিল! আজি কালি বৃদ্ধাগণ খুব প্রশংসার সহিত ঐ বধূটির উপমা দিয়া থাকেন! বোধ হয় বৃশ্চিকটা খুব বিষাক্ত ছিল না!

যাহা হউক ঐ সকল কৃত্রিম পর্দা কম (moderate) করিতে হইবে। অনেক পরিবারে মহিলাগণ ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব ব্যতীত অপর কাহারও বাড়ি যাতায়াত করেন না। ইহাতে পাঁচ রকমের স্ত্রীলোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইতে পারে না বলিয়া তাঁহারা একেবারে কূপমণ্ডুক হইয়া থাকেন। অন্তঃপুরিকাদের পরস্পর দেখাশুনা বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুরুষেরা যেমন সকল শ্রেণীর লোকের সহিত আলাপ করিয়া থাকেন, আমাদের তদ্রূপ করা উচিত। অবশ্য যাঁহাদিগকে আমরা ভদ্র-শিষ্ট বলিয়া জানি, কেবল তাঁহাদের সঙ্গে মিশিব,—তাঁহারা যে কোন ধর্মাবলম্বিনী (য়িহুদী, নাসারা, বুৎপরস্ত বা যা'ই) হউন, ক্ষতি নাই। এই যে "গয়ের মজহব" বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের সহিত পর্দা করা হয়, ইহা ছাড়িতে হইবে। আমাদের ধর্ম নষ্ট হইবে, এরূপ আশঙ্কার কারণ কি?

আমরা অন্যায় পর্দা ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব। প্রয়োজন হইলে অবগুণ্ঠন (ওরফে বোরকা) সহ মাঠে বেড়াইতে আমাদের আপত্তি নাই। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য শৈলবিহারে বাহির হইলেও বোরকা সঙ্গে থাকিতে পারে। বোরকা পরিয়া চলাফেরায় কোন অসুবিধা হয় না। তবে সেজন্য সামান্য রকমের একটু অভ্যাস (practice) চাই; বিনা অভ্যাসে কোন কাজটা হয়?

সচরাচর বোরকার আকৃতি অত্যন্ত মোটা (coarse) হইয়া থাকে। ইহাকে কিছু সুদর্শন (fine) করিতে হইবে। জুতা কাপড় প্রভৃতি যেমন ক্রমশ উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ বোরকারও উন্নতি প্রার্থনীয়। যে বেচারা (বোরকা) সুদূর আরব হইতে এ দেশে আসিয়াছে, তাহাকে হঠাৎ নির্বাসিত করিলেই কি আমরা উন্নতির সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠিব?

সম্প্রতি আমরা যে এমন নিস্তেজ, সঙ্কীর্ণমনা ও ভীরু হইয়া পড়িয়াছি, ইহা অবরোধে থাকার জন্য হয় নাই—শিক্ষার অভাবে হইয়াছে। সুশিক্ষার অভাবেই আমাদের হৃদয়বৃত্তিগুলি এমন সংকুচিত হইয়াছে। ললনাকুলের ভীরুতা ক্রমে বালকদের হৃদয়ে সংক্রামিত হইতেছে। পঞ্চম বর্ষীয় বালক যখন দেখে যে তাহার মাতা পতঙ্গ দর্শনে মূর্ছিতা হন, তখন কি সে ভাবে না যে পতঙ্গ বাস্তবিকই কোন ভয়ানক বস্তু?

এইখানে বলিয়া রাখি যে কীট পতঙ্গ দেখিয়া মূর্ছা যাওয়ার দোষে কেবল আমরা দোষী নহি। সুসভ্যা ইংরাজ রমণীও এ অপবাদ হইতে মুক্তি পান না। "গালিভরের ভ্রমণ" নামক পুস্তকে ("Gullivers' Travels" এ) দেখা যায়, যখন ডাক্তার গালিভর "ব্রব্‌ডিঙ্গন্যাগ" (Brobdingnag) দের দেশে গিয়া শস্যক্ষেত্রে সভয়ে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন একজন ব্রব্‌ডিঙ্গন্যাগ তাঁহাকে হাতে তুলিয়া লইয়া আপন স্ত্রীকে দেখাইতে গেল! ইংরাজ-ললনা যেমন কীট পতঙ্গ বা মাকড়সা দেখিয়া ভীত হন, ব্রব্‌ডিঙ্গন্যাগ রমণীও তদ্রূপ ডাক্তার গালিভরকে দেখিয়া ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল!! কারণ দীর্ঘকায়া ব্রব্‌ডিঙ্গন্যাগ রমণী ডাক্তারকে একটি ক্ষুদ্র কীট-বিশেষ মনে করিয়াছিল!! তাই বলি পর্দা ছাড়িলেও পতঙ্গ-ভীতি দূর হয় না!

মুসলিম নারীর হীন ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার একটি বাস্তব চিত্র। এই মহিলা সম্পর্কে আর কোনো তথ্য আমরা জানি না।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নারীদের শিক্ষার হার ছিল নিম্নরূপ:

মুসলমান	৩%
হিন্দু	৯%
বৌদ্ধ	১৬%
য়িহুদী	৪৫%
ব্রাহ্ম	৫৩%
এবং খ্রিস্টান	৭০%

১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে কেবল উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত বালিকার সংখ্যা ছিল ৮৮৩, তন্মধ্যে হিন্দু ৪৩৯ জন, মুসলমান ৬ জন, দেশীয় খ্রিস্টান ১৮৩ জন, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ৮৯ জন।

উপরোক্ত তথ্যের আলোকে বলা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক হতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে পাশ্চাত্য শিক্ষার কেন্দ্রস্থান কলিকাতায় খুব ধীরগতিতে মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার বিস্তার হতে থাকে। এই সময়ে আরও বালিকা বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে খ্যাতনামা বাঙালি মুসলিম নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো সমাজকর্মী খুজিস্তা আখতার বানু ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় 'সোহরাওয়ার্দীয়া বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলের উদ্বোধন করেন তৎকালীন ভাইসরয়-পত্নী লেডী মিন্‌টো।

পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, প্রায় পুরো ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় মুসলিম সমাজ অশিক্ষা,অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের আবর্তে ছিল চরমভাবে পীড়িত। ভারতীয় মুসলমানদের এই অবক্ষয়ের যুগে সামাজিক ও আইনগত অধিকার-বঞ্চিত বাঙালি মুসলিম নারীর অবস্থা ছিল শোচনীয়ভাবে করুণ ও বেদনাদায়ক।

তৎকালে এদেশের সংস্কার অনুসারে নারীকে অন্তঃপুরের চারি দেয়ালের বেষ্টনে আবদ্ধ করে রাখা হতো। এবং যে যত বেশি অবরোধ জীবনযাপন করত সমাজে সে তত বেশি প্রশংসিত হতো। বাইরের মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের অধিকার তাদের ছিল না। "মেয়ের জাত বাঁদীর জাত"–এ প্রবাদ তখন সমাজে গৃহীত ছিল। অন্ধকারে পিঞ্জরাবদ্ধ রেখে কোনো রকমে ভাত কাপড় দিয়ে পাত্রস্থ করতে পারলেই পিতা তাঁর পিতৃত্বের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে তৃপ্তি লাভ করতেন। বিবাহিত জীবনেও নারী ছিল পুরুষ কর্তৃক নির্যাতিত। মূর্খ স্বামীরা স্ত্রী মেরে বীরত্ব জাহির করত।

সে সময় পুরুষ সমাজে বহুবিবাহের বহুল প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। তৎকালে নারী ভোগের সামগ্রী হিসাবে পরিগণিত ছিল। অবস্থাপন্ন স্বাস্থ্যবান পুরুষ একাধিক বিয়ে করত। এ প্রসঙ্গে ইব্রাহিম খাঁ-র মন্তব্য নিম্নরূপ :

...সম্পত্তি বৃদ্ধির অনুপাতে স্ত্রীও সংখ্যায় বাড়তে থাকত।

বর্তমানকালের তুলনায় তখন তালাক ঘন ঘন ও অধিকতর নির্বিচারে দেওয়া হতো। বেশির ভাগ বিয়েই রেজস্ট্রি হতো না। কাবিন হলেও তাতে মোহরের পরিমাণ

থাকত খুব কম। তালাককে সমাজ তখন আজকের মতো ঘৃণার চোখে দেখত না। ফলে সেকালে অন্যায় তালাকের অপেক্ষাকৃত বাহুল্য ছিল। তালাক-তহবীজের চল কোথাও ছিল বলে মনে পড়ে না।

সেকালে অবরোধ বন্দিনী মুসলিম নারী ছিল শিক্ষার আলো হতে বঞ্চিত। অল্প পরিমাণে আরবি ও উর্দু চর্চা করা ছাড়া অপর কোনো গ্রন্থ পড়ার অধিকার মেয়েদের ছিল না। সে সময় মেয়েদের হাতের লেখা পর্যন্ত পুরুষদের দেখা জায়েজ মনে করা হতো না।

এক কথায় নানাবিধ সুকঠোর ও উৎপীড়ক বিধি-নিষেধের অনুশাসনে বাধা ছিল তৎকালীন মুসলিম নারীসমাজের জীবন।

ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু নারীসমাজের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলিম নারীর ন্যায় হিন্দু সমাজেও নারীর মৌলিক মানবিক অধিকার বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। এই অধিকার অর্জনের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই হিন্দু-প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে উদারনৈতিক চিন্তাচেতনার সংস্পর্শে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে রেনেসাঁস সংঘটিত হয় তারই ফলস্বরূপ হিন্দু নারীসমাজকে ইহার অধঃপতিত অবস্থা থেকে তুলে আনার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় সমাজসংস্কার ও নারীশিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টার মাধ্যমে। হিন্দুনারীর কল্যাণ ও মুক্তির লক্ষ্যে সংগঠিত ঊনবিংশ শতাব্দীর আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা অবহেলিত বাঙালি হিন্দু নারীসমাজের অবমাননায় ও নিপীড়নে উদ্বেলিত হয়ে তাদের নারীসমাজের করুণ অবস্থার উন্নতিকল্পে সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে ব্রতী হয়েছিলেন এবং প্রয়াস করেছিলেন নারীশিক্ষা বিস্তারের। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলার হিন্দু নারীসমাজের সামাজিক ও আইনগত মর্যাদার প্রভূত উন্নতি সাধন হয়। কিন্তু ইহা অতি দুঃখজনক যে, এই সময়কালে বাঙালি মুসলিম নারীসমাজ অন্ধকারের মধ্যে থেকে যায়। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে রেনেসাঁস সংঘটিত হয়েছিল সে রেনেসাঁসের আলোকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় অনগ্রসর বাঙালি মুসলিম সমাজের চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার মুসলমান সমাজে কোনো মানবতাবাদী ও নারী কল্যাণকামী মনীষীর আবির্ভাব ঘটেনি।

বাঙালি মুসলিম নারীর সামাজিক ও আইনগত মর্যাদাদানকল্পে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এগিয়ে আসেন বেগম রোকেয়া। তিনিই সর্বপ্রথম বাঙালি মুসলিম নারীর প্রতি সামাজিক অনাচার, অত্যাচার ও অবহেলার প্রতিবাদে নারী-মুক্তি কামনায় লেখক, সমাজকর্মী ও শিক্ষাব্রতীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। তাঁর সমগ্র কর্মজীবন নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রসারতার জন্য উৎসর্গ করে নারীর অধিকার ও নারী স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেন এবং এর সপক্ষে বাঙালি মুসলিম সমাজে শক্তিশালী জনমত গড়ে তুলতে সমর্থ হন।

অসাধারণ প্রতিভাশালী বেগম রোকেয়া ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর রংপুর জেলার অন্তর্গত বর্তমান মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ নামক গ্রামে সাবের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কবি বেগম সুফিয়া কামাল বেগম রোকেয়ার জন্মতারিখ ৯ ডিসেম্বর বলে উল্লেখ করেছেন।

বেগম রোকেয়ার পূর্বপুরুষের নাম বাবর আলী আবুল বাবর তাব্রিজী। তিনি ছিলেন ইরানের তাব্রিজ শহরের অধিবাসী। প্রধানত জীবিকার সন্ধানে বাবর আলী স্বদেশ পরিত্যাগ করে অন্যান্য পরিচিত পরিব্রাজকের সঙ্গে ভারতে আসেন। বেং ষষ্ঠদশ শতাব্দীর আশি দশকের কোনো এক সময় তিনি বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত রংপুর জেলার পায়রাবন্দ নামক গ্রামে পদার্পণ করেন। এখানে তিনি সম্রাট আকবরের স্থানীয় প্রশাসক নরনারায়ণের আশ্রয় ও সহযোগিতা লাভ করেন। সরকারি নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, বেগম রোকেয়ার পূর্বপুরুষগণ মুঘল সরকারের উচ্চ সামরিক পদে নিয়োজিত ছিলেন। বেগম রোকেয়ার জনৈক পূর্বপুরুষ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে 'মিরতাস' পদেও নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের অনেকে অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট, মুন্সেফ ও কাজীর পদও লাভ করেছিলেন।

মুঘল সম্রাটের অনুগ্রহে বাবর আলী তাব্রিজী বিস্তীর্ণ লা-খেরাজ জমি লাভ করেছিলেন। এই বিশাল জমিদারির অধিকারী সাবের পরিবারের সপ্তম পুরুষ ছিলেন বেগম রোকেয়ার পিতা জহিরুদ্দীন আবু আলী হায়দার সাবের। জহিরুদ্দীন আবু আলী আরবি ও ফারসীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এছাড়া তিনি ইংরাজি, বাংলা, হিন্দিসহ আরো কয়েক ভাষা জানতেন।

জহিরুদ্দীনের চারজন স্ত্রী ছিলেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রী ছিলেন রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরাণী। তিনি ঢাকার বালিয়াদীর জমিদার হোসেনউদ্দিন চৌধুরী সাহেবের কন্যা ছিলেন। রাহাতুন্নেসা রক্ষণশীল ও পর্দাপ্রথার গোঁড়া সমর্থক ছিলেন।

জহিরুদ্দীনের অপর দুই স্ত্রী সফিয়া ও সোনাবর ছিলেন রংপুর নিবাসী। চতুর্থ স্ত্রী সালমা ছিলেন বিদেশী, তাঁর কোনো সন্তানাদি ছিল না। রংপুরের প্রচলিত কিংবদন্তি হতে জানা যায় যে, জহিরুদ্দীন সিপাহি বিপ্লবের সময় কোম্পানি সরকারের সাথে সহযোগিতা করেছিলেন এবং একজন ইংরেজ মহিলার সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এই বিদেশী মহিলাকে খোশ মেজাজে রাখার জন্য সাবের সাহেব প্রচুর অর্থ কুকুর প্রতিপালনে ব্যয় করেছেন। অনুমিত হয় যে, এই বিদেশিনীর নামই ছিল সালমা। জহিরুদ্দীনের সর্বমোট নয় পুত্র ও ছয় কন্যা ছিল।

জহিরুদ্দীন অপব্যয়ী, আরামপ্রিয় ও বিলাসী ছিলেন। তিনি জাঁকজমকপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে পছন্দ করতেন। তাঁর বিলাসবহুল জীবন ও ঐশ্বর্যের কথা স্থানীয় কিংবদন্তিতে চিত্রিত হয়েছে। অপব্যয়ি, বিলাসিতা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে জহিরুদ্দীনের বিশাল সম্পদ ও প্রতিপত্তি ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ার ফলেও জহিরুদ্দীন সাবেরের মোটা অংকের টাকা ব্যয় হয়ে যায়।

মুন্সী আপ্তাবউদ্দিন-এর বর্ণনা অনুযায়ী জমিদারি হারিয়ে জহিরুদ্দীন সাবের রিক্ত ও নিঃস্ব হয়ে যান। তাঁর আর্থিক অবস্থা এত শোচনীয় হয় যে, নিজের বাড়ি, বাড়ির আসবাবপত্র এমনকি দালানের ইট পাথর খুলেও নাকি তিনি বিক্রি করেছেন। এরপর নিজ বাস্তুভিটা ত্যাগ করে অন্যত্র বাঁশ ও খড়ের ঘর তিনি নির্মাণ করেন। অবশেষে জহিরুদ্দীন নিরুদ্দেশে যাত্রা করেন। তবে সাহায্যের আশায় তিনি মাঝে মাঝে পূর্ব-পরিচিতদের নিকট আসতেন। এভাবে দিন যাপন করার পর ৩১ বৈশাখ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ (এপ্রিল, ১৯১৩) শুক্রবার সকাল এগারটা ছত্রিশ মিনিটে জহিরুদ্দীন আবু আলী ইন্তেকাল করেন।

মুন্সি আপ্তারউদ্দিন ও মসিহুজ্জামানের লোককাহিনীতে জমিদার জহিরুদ্দীনের দারিদ্রতার নির্মম পরিণতির বর্ণনা আমাদের নিকট অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, জহিরুদ্দীনের মৃত্যুর বেশ কয়েক বৎসর পর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বেগম রোকেয়া রচিত মতিচূর, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থের 'নার্স নেলী, রচনায় বেগম রোকেয়া তার পিতার বাটীর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–

আমাদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল–আমরা পরম সুখে খাইয়া পরিয়া গা-ভরা গহনায় সাজিয়া থাকিতাম। আমাদের এ নিবিড় অরণ্যবেষ্টিত বাড়ীর তুলনা কোথায়? সাড়ে তিনশত বিঘা লা-খেরাজ জমির মাঝখানে কেবল আমাদের এই সুবৃহৎ বাটী।

তবে একথা মনে হয় যে, অপব্যয়, বিলাসিতা ও বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমার অসফল পরিণতি এবং বহুবিবাহ ও বহু সন্তান-সন্তানাদির জন্মের ফলে জহিরুদ্দীনের বিশাল জমিদারি ও সম্পদ তাঁর জীবনকালেই প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়।

বেগম রোকেয়ার মাতার নাম রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরাণী। বেগম রোকেয়ার সহোদর দুই ভাই : খলিলুর রহমান আবু জায়গাম সাবের ও আবুল আসাদ মোহাম্মদ ইব্রাহীম সাবের, এবং দুই বোন করিমুন্নেসা ও হোমায়রা।

সংস্কারপূর্ণ সামাজিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেও খলিল সাবের ও ইব্রাহীম সাবের উচ্চশিক্ষা লাভ করতে সমর্থ হন। উভয়েই কলিকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে লেখাপড়া করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের পিতা ডা. কে. ডি. ঘোষ এক সময় রংপুরে সিভিল সার্জন হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। শৈশবে খলিল সাবের ও ইব্রাহীম সাবের ডা. ঘোষের সাহচর্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। সৈয়দ আহমদ ও আমীর আলী ছিলেন তাঁদের আদর্শ। শামসুন নাহার তাঁর রোকেয়া জীবনীতে লিখেছিলেন:

শূন্য যায়, ইবরাহীম ইংরেজী শিক্ষার অগ্রদূত আলীর সঙ্গলাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন।

ইব্রাহীম সাবের ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং খলিল সাবের ছিলিন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট।

বেগম রোকেয়ার জ্যেষ্ঠা ভগিনী করিমুন্নেসা ছিলেন অসাধারণ মেধার অধিকারী। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে তাঁকে কোরআন শরীফ পাঠ শিক্ষা দেয়া হয়। কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি ছিল তাঁর অশেষ আগ্রহ। তিনি গোপনে ভাইয়ের সাথে ফার্সি চর্চা করতেন। কন্যাদের লেখাপড়ার ব্যাপারে জহিরুদ্দীনের বিরূপ মনোভাব ছিল না কিন্তু

সামাজিক অনুশাসনে তিনি ছিলেন বাঁধা। একদিন করিমুন্নেসা গোপনে একটা বটতলায় পুঁথি নিয়ে অস্ফুটস্বরে পাঠ করেছিলেন,–সেই সময় হঠাৎ তাঁর পিতা উপস্থিত হন। এতে করে করিমুন্নেসা অত্যন্ত ভীত হয়ে অনুমান করেন, "সর্বনাশ,–বুঝি এখনই আমাকে যমালয়ে যেতে হবে।" কিন্তু না, শোকর-আল্‌হামদুলিল্লাহ্! পিতা কন্যার হাতে পুঁথি দেখে রাগ করলেন না,–বরং ভয়ে মুর্চ্ছিতা-প্রায় বালিকাকে কোলে নিয়ে আদর করলেন এবং সৈদিন হতেই একটু একটু "সাধুভাষা"র বাংলা পড়াতে লাগলেন। কিন্তু মোল্লা মুরুব্বীর দলের নিন্দা ও কটুক্তির জ্বালায় পিতা কন্যার পড়া বন্ধ করতে বাধ্য হলেন। তাঁকে বালিয়াদীতে মামামহের প্রসাদে পাঠানো হয় এবং দেলদুয়ারে বিয়ে দেওয়া হয়। শ্বশুরালয়ে তিনি কয়েকজন দেবরসম্পর্কীয় ছাত্রের সাহায্যে যথাবিধি বাংলাভাষা শিক্ষা লাভ করেন। বিবাহের মাত্র ৯ বৎসর পরই তিনি বিধভা হন।

করিমুন্নেসা খানম স্বভাব-কবি ছিলেন। তিনি পারিবারিক ঘটনা ও সামাজিক বিষয়ে অনেক কবিতা লিখেছিলেন। বেগম রোকেয়া বলেছেন :

...(করিমুন্নেসার) সে কবিতাগুলি "দিনের আলোক দেখিতে পায় নাই। আজি-কালি দেখি, লোকে ভালমতে বর্ণজ্ঞানের সহিত ভালমতে পরিচিত না হইয়াও ভাড়া-করা লেখকের দ্বারা প্রবন্ধ ও পুস্তক লেখাইয়া নিজের নামে প্রকাশ করে। কিন্তু করিমুন্নেসা সাহেবা নিজের রচনা কখনও স্বনামে সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন নাই। কালেভদ্রে কোন রচনা বা পুস্তক বে-নামীতে ছাপা হইত। দুই তিন বৎসর পূর্বে তাঁহার কয়েকটি কবিতা আমি জোর করিয়া কোন হিন্দু সংবাদপত্রে দিয়াছিলাম–তাহাতে নাম প্রকাশ হয় নাই। আমি অনেক পীড়াপীড়ি করায় কবিতার নিম্নে "সাবের বংশের জনৈকা কন্যা" নাম দেওয়া হইয়াছিল। সে পত্রিকার সম্পাদক আমাকে লিখেছিলেন, "সাবের বংশের কন্যার কবিতাগুলি বড় চমৎকার; আমাদের বেশ লাগিয়াছে। দয়া করিয়া আরও পাঠাইবেন।"

করিমুন্নেসা ইংরাজি ও ফারসি ভাষা জানতেন। তিনি ৬৭ বৎসর বয়সে রীতিমতো আরবি ভাষা শিখতে আরম্ভ করেছিলেন।

শিক্ষানুরাগী ও সাহিত্যসেবী করিমুন্নেসার আনুকূল্যে আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ীর সম্পাদনায় ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল থেকে আহমদী নামক এক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্য পত্রিকাটি এদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে বিশিষ্ট আসন লাভ করে আছে।

করিমুন্নেসার দুই পুত্র : আবদুল করিম আবু আহমদ খান গজনভী (১৮৭২-১৯৩৯) ও আবদুল হালিম হুসাইন খান গজনভী (১৮৭৯-১৯৫৬)। উভয়ই মাতার ঐকান্তিক আগ্রহে ও চেষ্টায় উচ্চশিক্ষা লাভ করতে সমর্থ হন। আবদুল করিম রাজনৈতিক জীবনে বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি একাধিক গ্রন্থের রচয়িতাও ছিলেন।

করিমুন্নেসার দ্বিতীয় পুত্র আবদুল হাকিম গজনভী কর্মজীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুসলমানদের বহুল প্রচারিত The Mussalman প্রকাশের প্রথম পর্যায়ে তিনি পত্রিকাটির সাথে জড়িত ছিলেন। রাজনৈতিক জীবনেও তিনি বহু

গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বেগম রোকেয়ার কনিষ্ঠা ভগিনী হোমায়রা 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'-এর তত্ত্বাবধানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি তাঁর কন্যা নূরীকে বেগম রোকেয়ার হাতে তুলে দেন। বেগম রোকেয়া নূরীকে লেখাপড়া শিখিয়ে এমনভাবে গড়ে তুলতে চেয়েচিলেন যাতে করে তাঁর মৃত্যুর পর নূরী বেগম রোকেয়ার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস 'সাখাওয়াত মেমেরিয়াল গার্লস স্কুল'-এ পড়ার সময় মাত্র বারো বৎসর বয়সে নূরী ইন্তেকাল করে। নূরীর মৃত্যুতে বেগম রোকেয়া গভীরভাবে পীড়িত হন।

আমরা জানি যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজব্যবস্থায় অতি নিকটআত্মীয় ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের সম্মুখে যাওয়াও ছিল বাঙালি মুসরিম নারীর জন্য নিষিদ্ধ, আর এ অযাচিত পর্দাপ্রথার কঠোরতা মাত্র পাঁচ বছরের শিশুর উপরও বলবৎ ছিল।

তৎকালীন প্রচলিত সামাজিক কুপ্রথা ও গোঁড়ামি বেগম রোকেয়ার পরিবারে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এ প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়া বলেছেন,

অপরের কথা দূরে থাকুক। এখন নিজের কথা কিছু বলি। সবে মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স হইতে আমাকে পর্দা করিতে হইত। ছাই কিছুই বুঝিতাম না যে, কেন কাহারও সম্মুখে যাইতে নাই; অথচ পর্দা করিতে হইত। পুরুষদের ত অন্তঃপুরে যাইতে নিষেধ, সুতরাং তাহাদের অত্যাচার আমাকে সহিতে হয় নাই। কিন্তু মেয়ে মানুষের অবাধ গতি–অথচ তাহাদের দেখিলে লুকাইতে হইবে। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা হঠাৎ বেড়াইতে আসিল; অমনি বাড়ীর কোন লোক চক্ষুর ইশারা করিত, আমি যেন প্রাণ ভয়ে যত্রতত্র–কখনও রান্নাঘরে ঝাঁপের অন্তরালে, কখনও কোন চাকরাণীর গোল কলিযা জড়াইয়া রাখা পাটির অভ্যন্তরে, কখনও তক্তপোষের নীচে লুকাইতাম।

বেগম রোকেয়া ব্যক্তিগত জীবনের আরো এক চিত্র তাঁর লেখার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন :

আমার পঞ্চম বর্ষ বয়সে কলিকাতা থাকাকালীন আমার দ্বিতীয়া ভ্রাতৃবধূর খালার বাড়ি–বেহার হইতে দুইজন চাকরাণী তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। তাহাদের 'ফ্রী পাসপোর্ট ছিল,–তাহারা সমস্ত বাড়িময় ঘুরিয়া বেড়াইত, আর আমি প্রাণ-ভয়ে পলায়মান হরিণশিশুর মত প্রাণ হাতে লইয়া যত্র-তত্র-কপাটের অন্তরালে কিম্বা টেবিলের নিচে পলাইয়া বেড়াইতাম। ত্রিতলে একটা নির্জন চিলেকোঠা ছিল; অতি সন্তর্পণে আমাকে খালাই কোলে করিয়া সেইখানে রাখিয়া আসিত; প্রায় সমস্ত দিন সেইখানে অনাহারে কাটাইতাম।

কাজেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশের দরুন স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভ বেগম রোকেয়া করতে পারেননি। পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি মাতার সাথে কলিকাতায় আসেন। এখানে এক মেম শিক্ষয়িত্রীর নিকট তাঁর বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয়। কিন্তু তাতেও পর্দার বরখেলাপ হয় বলে তাঁর আত্মীয় সম্পর্কীয় অভিভাবকদের নিকট হতে আপত্তি উঠে। অতএব এখানে তাঁর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর জ্ঞান-

পিপাসা ছিল অসীম। আর এ বিষয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহীম সাবের ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নি করিমুন্নেসার সহযোগিতা ছিল অপরিসীম। বেগম রোকেয়া বলেছেন :

বালিকা বিদ্যালয় বা স্কুল-কলেজ-গৃহের অভ্যন্তরে আমি কখনও প্রবেশ করি নাই, কেবল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অসীম স্নেহ ও অনুগ্রহে যৎসামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছি। অপর আত্মীয়-স্বজনেরা আমার শিক্ষায় উৎসাহ দান করবেন দূরে থাকুক, বরং নানা প্রকার বিদ্রূপ ও উপহাস করতেন–কিন্তু তথাপি আমি পশ্চাৎপদ হই নাই। ভ্রাতাও কাহারো বিদ্রূপে ভগ্নোৎসাহ হয়ে আমাকে পড়াতে ক্ষান্ত হন নাই।

দিনের বেলায় পড়ালেখার সুযোগ হতো না। তাই গভীর রাতে বাড়ির সবাই ঘুমাইলে দুই ভাইবোন বসতেন পড়াশুনা নিয়ে, মিটিমিটি মোমবাতির আলোতে। ইব্রাহীম সাবের তাঁকে মুখে মুখে অনেক দেশ-বিদেশের নানা কাহিনী বলতেন। 'ক্ষুদ্র বোন রকু' অবাক হয়ে সমস্ত শুনত–জ্যেষ্ঠের প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গী যেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের মধ্যে প্রবেশ করত।

গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে ঘুমালে এক একদিন সূর্যোদয়ের আগে শয্যাত্যাগ করে ফজরের নামাজ পড়া হতো না এবং এ অপরাধে বেগম রোকেয়াকে প্রতিবেশীদের নিকট থেকে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হতো। শিক্ষার কুফল ফলতে শুরু করেছে, লেখাপড়া শিখে মেয়ে জজ-ব্যারিস্টার হবে–ইত্যাদি নানা ভাষায় বিদ্রুপের কশাঘাত তারা করত। কিন্তু বেগম রোকেয়ার উৎসাহ তাতে বিন্দুমাত্র কমেনি বরং উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারণ তাঁর সাথে ছিল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আন্তরিক সক্রিয় সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা।

সুযোগ পেলে বেগম রোকেয়া দিনে শতবার ভাইকে পড়া জিজ্ঞাসা করতেন। পুত্রকে বার বার বিরক্ত করছে বলে মা সময় সময় রোকেয়ার প্রতি বিরক্ত হয়ে যেতেন। কিন্তু ইব্রাহীম বলতেন :

মা, তুমি বকিও না। এতে যে আমি কতো আনন্দ পাই, তা তুমি জান না, মা।

বেগম রোকেয়া তাঁর জীবনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পদ্মরাগ উপন্যাসটি ইব্রাহীম সাবেরকে উৎসর্গ করেন। বেগম রোকেয়া উৎসর্গপত্রে লিখেন :

দাদা,

আমি আশৈশব তোমার স্নেহ-সাগরে ডুবিয়া আছি। আমাকে তুমিই হাতে গড়িয়া তুলিয়াছ। আমি জানি না,–পিতা, মাতা, গুরু, শিক্ষক কেমন হয়,–আমি কেবল তোমাকেই জানি।

বেগম রোকেয়ার লেখাপড়া শিক্ষার ব্যাপারে জ্যেষ্ঠ ভগ্নি করিমুন্নেসার ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। রোকেয়া শৈশবে করিমুন্নেসার নিকট বাংলা ইংরাজি পড়তে শিখেন। বেগম রোকেয়া বলেছেন, জ্যেষ্ঠা ভগ্নি আমাকে দু'হরফ বাংলা পড়বার জন্য সমাজে বহু নিন্দা ও ভ্রূকুটি সয়েছেন। বেগম রোকেয়া এই ভগ্নির উদ্দেশ্যে বলেছেন:

অপর আত্মীয়গণ আমার উর্দু ও ফারসী পড়ায় তত আপত্তি না করিলেও বাংলা পড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। একমাত্র তুমিই আমার বাংলা পড়ার অনুকূলে ছিলে।

আনুমানিক ১৬ বৎসর বয়সে বিহার প্রদেশের অন্তর্গত ভাগলপুর নিবাসী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন, বি. এ., এম. আর. এ. সি., ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-এর সাথে বেগম রোকেয়ার বিয়ে হয়। বিয়ের সময় তিনি উড়িষ্যার কণিকা স্টেটের কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার পদে আসীন ছিলেন। তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, উদারপ্রাণ ও প্রগতিশীল মতবাদের অনুসারী। বিয়ের পর স্বামীর উৎসাহে ও সাহায্যে বেগম রোকেয়া লেখাপড়া করার আরও বেশি সুযোগ সুবিধা পান। স্বামীর উৎসাহে তিনি অল্পদিনের মধ্যে ইংরাজি ভাষা আয়ত্ত করেন। মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বলেছেন :

সুশিক্ষিতা মিসেস রোকেয়া হোসেন এরূপ ইংরাজী শিখিয়াছিলেন যে সাখাওয়াতের কথামত ইংরাজীতে লিখিয়া তাঁহার সরকারী কার্য্যের সাহায্য করিতে পারিতেন।

মনে হয় রোকেয়ার অসাধারণ গুণাবলী ও ব্যক্তিত্ব তাঁর স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের নিকট সমাদৃত হয়েছিল। সাখাওয়াত হোসেনের জীবনকালে বেগম রোকেয়া তাঁর অধিকাংশ সৃজনশীল, মুক্ত ও নির্ভীক ভাবদীপ্ত রচনাদি লিখেছিলেন।

সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাস করে হুগলী কলেজে ভর্তি হন! হুগলী কলেজে তাঁর সাথে মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় হয় এবং ধীরে ধীরে তাঁদের পরস্পরের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। মুকুন্দদেবের অভিমতে, সাখাওয়াত হোসেন ছিলেন একজন ত্যাগী, মাতৃভক্ত, উদ্যমশীল, উচ্চবংশজাত মহাত্মা পুরুষ।

কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠে কয়েক মাস পরে সাখাওয়াত পাটনা কলেজে যান এবং সেই কলেজ হতে তিনি ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে কৃষি শিক্ষার বৃত্তি পেয়ে ইংল্যান্ড যান। সংযমশীল, দূরদর্শী, সঞ্চয়ী, পরিশ্রমী, মেধাবী সাখাওয়াত হোসেন সরকারি বৃত্তি হতে ইংল্যান্ডের ব্যয় নির্বাহ করে প্রায় দেড় হাজার টাকা সঞ্চয় করেন এবং অনেকগুলি প্রাইজ ও মেডেল নিয়ে আসেন।

পাঠ্যাবস্থায় প্রতিপত্তিশালী ধনী কর্ণেল হেদায়েৎ আলির কন্যার সাথে সাখাওয়াত হোসেনের বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। কন্যার পিতা নিজ খরচে তাঁকে বিলাতে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠাতে চান। কিন্তু উচ্চ আত্মমর্যাদাশীল সাখাওয়াত এই প্রস্তাবে অসম্মত হন। পরে সাখাওয়াত হোসেন মাতার পছন্দমতো স্বঘরেই (বিহারের আত্মীয়দিগের মধ্যে) বিয়ে করেছিলেন। সাখাওয়াতের একটিমাত্র কন্যা হবার পর সে পত্নীর অল্প বয়সেই দেহান্তর হয়। সাখাওয়াত হোসেন সেই কন্যার একটি বি.এ. পাস ছেলের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। সে কন্যাটি পরে মারা যায়।

চাকরি জীবনে তিনি ছিলেন দক্ষ, সুনিপুণ ও তেজস্বী। একবার কটকের কালেক্টর স্টীভেনসন মুর সাহেব সাখাওয়াত হোসেনের কার্য সম্বন্ধে ভুল বুঝে তাঁর কার্যের দোষ দেখিয়ে একটি কড়া ভাষায় চিঠি লেখেন। তেজস্বী সাখাওয়াত মুর সাহেবের ভুল সুস্পষ্টরূপে দেখিয়ে চিঠির প্রতি উত্তর দেন এবং ম্যানেজারী চাকরি ত্যাগ করে সাধারণ বিভাগে ফিরে আসতে চান। পরে কালেক্টর সাহেব নিজের ভুল বুঝতে সক্ষম হন।

সাখাওয়াত হোসেন মিতব্যয়ী ছিলেন এবং তিনি খুবই অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে সাখাওয়াত হোসেন কমিশনারের পার্সন্যাল এ্যাসিস্টেন্ট

হিসাবে ভাগলপুরে নিযুক্ত ছিলেন। ভাগলপুরের খলিফাবাগে তাঁর পৈত্রিক মাটির দোতালা বাড়ি ছিল। অল্প অল্প করে তিনি সেটা পরিচ্ছন্ন ভালো বাড়িতে পরিবর্তন করেন। সাবেক পৈত্রিক মাটির দেওয়ালের বাহির পিঠে একটি করে ইট গেঁথে সেটা পলস্তারা করিয়ে চুনকাম করান; ভিতর পিঠও পলস্তারা করান কিন্তু ভিতরে সেই সাবেক মাটিই রেখে দেন। উচ্চ চাকরি লাভ করলেও মহৎ চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ সাখাওয়াত হোসেন বিলাসহীন জীবনধারায় বিশ্বাসী ছিলেন।

সাখাওয়াত হোসেনের ধনলোভ একেবারেই ছিল না। মাসিক ১,২৫০ টাকা মাহিনায় কণিকার রাজা একবার তাঁকে ম্যানেজার হিসাবে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সাখাওয়াত হোসেন কণিকার রাজার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অথচ তিনি তখন পাঁচ শত মাহিনার ডেপুটি কালেক্টর।

বেগম রোকেয়া ও সাখাওয়াত হোসেনের সাংসারিক জীবন খুব সীমিত সময়কালের ছিল। দুই সন্তানের জননী হয়েছিলেন তিনি, কিন্তু একজন পাঁচ মাস বয়সে ও অপরটি চারমাস বয়সে মারা যায়। বেগম রোকেয়া অত্যন্ত শোক পেয়েছিলেন সন্তানদের অকাল মৃত্যুতে। তাই দুঃখ করে বলেছেন :

দু'বার মা হয়েছিলুম–তাদেরও প্রাণভরে কোলে নিতে পারিনি।

বিবাহিত জীবনে বেগম রোকেয়া ছিলেন একাধারে ছাত্রী ও সাহিত্যিক অথচ সুগৃহিণী, ঘর সুন্দর করে সাজানোর ব্যাপারে তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। সাখাওয়াত হোসেন একটা আটকোণা সুদৃশ্য ঘর তাঁর শিক্ষিতা পত্নীর জন্য বাড়ির ভিতরে প্রস্তুত করে সুসজ্জিত করেছিলেন।

বিয়ের পরই রোকেয়ার গুণাবলী এবং চিন্তাধারা সাখাওয়াত হোসেনকে প্রভাবিত করে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে মুসলমান মেয়েদের কুসংস্কার ও অজ্ঞতা সম্পর্কে আলোচনা করতেন। উদারচেতা সাখাওয়াত হোসেন বেগম রোকেয়ার সাথে আলাপ-আলোচনায় উপলব্ধি করেন যে, মুসলিম নারী সমাজে শিক্ষা বিস্তার ব্যতীত মুসলমান সমাজের উন্নতি কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়। শিক্ষা সম্পর্কে রোকেয়ার মধ্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বিরাজ করছে, তাও তিনি অনুভব করেছিলেন।

বহু চিন্তা ভাবনা ও আলোচনার পর সাখাওয়াত হোসেন সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলে বেগম রোকেয়ার জীবনের স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সার্থক হয়ে উঠবে। এ উদ্দেশ্যে সাখাওয়াত হোসেন তাঁর সঞ্চিত সত্তর হাজার টাকার মধ্যে দশ হাজার টাকা একটি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য পৃথক করে রেখে দেন–যার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালিকা হবেন সন্তানহীনা বেগম রোকেয়া।

জীবনের শেষ পর্যায়ে সাখাওয়াত হোসেন বহুমূত্র রোগসহ নানাবিধ রোগে ভুগছিলেন। দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর তিনি দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েন। অবশেষে কলিকাতায় চিকিৎসার্থে এসে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ৩ মে সাখাওয়াত হোসেনের দেহান্তর হয়। সাখাওয়াত হোসেনের মৃত্যু সংবাদটি ১৪ মে The Mussalman পত্রিকায় পরিবেশন করা হয়।

সাখাওয়াত হোসেনের মৃত্যুর মাত্র পাঁচ মাস পর ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ১ অক্টোবর বেগম রোকেয়া নারীশিক্ষা বিস্তারের স্বপ্ন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে ভাগলপুরে মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়ের কাজ শুরু করেন। কিন্তু সাখাওয়াত হোসেনের প্রথম পক্ষের কন্যা ও জামাতার অপ্রীতিকর আচরণের জন্য তিনি ভাগলপুর ত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরবর্তীতে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মার্চ কলিকাতার ১৩নং ওয়ালিউল্লাহ লেনের ছোট একটি বাড়িতে দ্বিতীয়বার মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ স্কুলের নাম রাখা হয় 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'। এর পর থেকে বেগম রোকেয়া তাঁর সমস্ত শক্তি, উদ্যম, অর্থ ও সময় নিঃস্বার্থভাবে নিয়োজিত করেন স্কুলটিকে একটি আদর্শ মুসলিম বিদ্যালয়রূপে গড়ে তোলার প্রয়াসে।

বেগম রোকেয়া বিশ্বাস করতেন যে, নারী-শিক্ষার প্রসারই অধঃপতিত নারী সমাজকে উন্নত করার মুখ্য উপায়। তাই নারীশিক্ষা বিস্তারের ব্রতে তিনি দুই দশকের অধিককাল নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। নারীশিক্ষা বিস্তার আন্দোলনে তাঁর কঠোর আত্মত্যাগের ফলে বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার প্রচেষ্টার সফলতা তাঁর জীবনকালেই পরিলক্ষিত হয়।

'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠার শুরুতে ছিল মাত্র ৮ জন ছাত্রী এবং দুই খানা বেঞ্চ। কিন্তু পরবর্তীতে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বেগম রোকেয়ার জীবনকালেই স্কুলটি একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়রূপে আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লক স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক পূর্ব হতেই বাঙালি মুসলিম সুধী সমাজে বেগম রোকেয়া সুপরিচিত ছিলেন। ১৯০৩-১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অবরোধ-বন্দিনী নারী জীবনের দুঃখ, বেদনা ও সমস্যার বিভিন্ন দিক ও নারীর ন্যায্য অধিকার সম্পর্কিত বেগম রোকেয়ার প্রবন্ধাবলী তাঁর সমাজে আলোড়ন তোলে। এই প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়ে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর মতিচূর প্রথম খণ্ড। সমসাময়িক নারীর দুঃখ-দুর্দশা ও তাদের হীনবস্থা থেকে মুক্তির উপায় সম্বন্ধে মুক্তমনা বেগম রোকেয়ার নির্ভীক মতবাদ পড়ে অনেকেই তখন ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ লেখনীর মাধ্যমে বেগম রোকেয়াকে প্রত্যাখ্যাত করার প্রচেষ্টাও করেছেন। কিন্তু মতিচূর, প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত রচনাবলী বাঙালি মুসলিম সমাজে যে নারীমুক্তি আন্দোলন ও বুদ্ধির মুক্তির প্রগতা প্রবর্তন করেছিল–তার গতি রুদ্ধ হয়নি।

বাঙ্গালি মুসলিম নারীর সার্বিক কল্যাণ সাধন করাই ছিল বেগম রোকেয়ার জীবনের ব্রত। এজন্য তিনি নারীদের পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান ও জ্ঞানের বিকাশ সাধন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' নামে এক মুসলিম মহিলা সমিতি স্থাপন করেন। ইহা 'নিখিল বঙ্গ মুসলিম মহিলা সমিতি' ও 'Calcutta Mohamedan Ladies Association' নামেও পরিচিতি লাভ করে। নারীর সামাজিক জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে সচেতনতাবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করা

ছিল উক্ত সমিতির লক্ষ্য। নারী মুক্তির অন্যতম প্রধান শর্ত নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি। আর এজন্য দরিদ্র নারীদের বৃত্তিমূলক ও হস্তশিল্পভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করা সমিতির উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নানাবিধ সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও বাধা-বিঘ্নের মধ্যদিয়ে বেগম রোকেয়া তাঁর জীবদ্দশায় 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম'-কে একটি সুসংগঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত সমিতিরূপে গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে আমৃত্যু বেগম রোকেয়া লেখক, শিক্ষাব্রতী ও সমাজকর্মীরূপে কাজ করতে গিয়ে সমাজের নানা সমালোচনা, বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। তবে কোনো বাধা-বিপত্তি তাঁকে মুহূর্তের জন্য তাঁর ব্রত হতে বিচ্যুত করতে পারেনি।

ব্যারিস্টার মি: আবদুর রসুল, মি: আবদুল করীম জামাল, মি: এ. কে. ফজলুল হক, মৌলবী মুজীবুর রহমান প্রমুখ উদার চেতনাসম্পন্ন মনীষীগণ রোকেয়ার মহান কার্যে বিশেষ সহায়ক ছিলেন। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা The Mussalman মহিলা, নবনূর, সওগাত, মাসিক মোহাম্মদী, নবপ্রভা ইত্যাদি পত্রিকাও তাঁর মহান পরিকল্পনা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। সমকালীন উপরোক্ত পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ, অভিভাষণ ইত্যাদি মুদ্রিত করে তা জনসম্মুখে উপস্থাপন করেছে এবং বেগম রোকেয়া প্রবর্তিত নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রতি জনসমর্থন গড়ে তুলেছে।

নারী কল্যাণ কামনায় নিবেদিতপ্রাণ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর শুক্রবার অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এর বছর খানেক পূর্ব হতেই তাঁর শরীর খুব দুর্বল হয়ে পড়ে; এছাড়া পেটের অসুখ ও কিডনীর গোলমাল ও দেখা দেয়। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি তাঁর কোনো প্রিয়তমা ছাত্রীকে বড় করুণভাবে বলেছিলেন:

মা, সময় বুঝি হইয়া আসিল। মরণের বোধহয় আর বেশি দেরী নাই। আল্লার রহমতে জীবনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে। এইবার ছুটি নিতে ইচ্ছা হয়। সত্য সত্যই জীবনের কুন্দকুসুম যেদিন ঝরিয়া পড়িবে সেদিন আমার শেষ বিশ্রামস্থান রচনা করিও আমার প্রাণের এই তাজমহলের একপাশে–কবরে শুইয়া শুইয়াও যেন আমি আমার মেয়েদের কলকোলাহল শুনিতে পাই।

মৃত্যুর পূর্বরাত্রে প্রায় এগারোটা পর্যন্ত বেগম রোকেয়া লেখাপড়ার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এরপর তাঁর নিয়মমতো শেষরাত ৪টার সময় উঠে ওজু করতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন। এই সময় তাঁর চাচাতো বোন মরিয়ম রশিদ ও ছোট বোন হোমায়রা তাঁর নিকটে ছিলেন। বেগম মরিয়ম রশিদ লিখেছেন :

হঠাৎ...তাঁর (বেগম রোকেয়ার) ডাক শুনতে পেলাম, 'আমার যেন কেমন লাগছে, শিগ্রি আয়।' আমি ও ছোট আপা দৌড়ে গিয়ে দেখি তিনি শুয়ে শুয়ে হাসফাঁস করছেন, আর বলছেন, "খোদা, খোদা"।...৪ মিনিটের মধ্যে তিনি রোগাক্রান্ত এবং শেষ হলেন।

বেগম রোকেয়ার মৃত্যু খবর প্রচার হবার কয়েক প্রহরের মধ্যে কলিকাতার বিভিন্ন স্থান হতে আগত জনগণের উপস্থিতিতে তাঁর বাড়ি পূর্ণ হয়ে যায়। এ সম্পর্কে মরিয়ম রশিদ লিখেছেন :

এক ঘন্টার মধ্যে সমস্ত কলকাতা শহর যেন এই বাড়ীখানার উপর এসে পড়লো। সামনের সমস্ত কম্পাউন্ডখানা, রাস্তার ফুটপাত পর্যন্ত পুরুষে পূর্ণ হল, আর ভিতরটা মেয়ে মানুষে পূর্ণ হল। এতবড় দালান খানায় লোক আটছিল না। অনেক মহিলা আপাজানের চারিদিকে কোরান পড়া আরম্ভ করলেন।

বেগম রোকেয়ার নামাজে জানাযা কাইসার স্ট্রীটের বু-আলি মসজিদে জোহরের নামাজের পর অনুষ্ঠিত হয়। এতে মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গসহ অসংখ্য জনগণ উপস্থিত ছিলেন। যাঁরা তাঁর নামাজে জানাযায় অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে জনাব এ. কে. ফজলুল হক, স্যার আবদুল করিম গজনভী, অনারেবল নবাব কে. জি. এম. ফারুকী, অনারেবল খাজা নাজিমুদ্দিন, কে. বি তোসাদ্দক আহমদ, কে. বি. তোফাজ্জল আহমেদ, জনাব আমিন আহমদ, ড. আর আহমদ, মৌলভী আবদুর রহমান, জনাব রেজাউর রহমান, নবাবজাদা কামরুদ্দীন হায়দার এবং মৌলভী মজিবুর রহমান অন্যতম। জানাযার পর মরহুমার মরদেহ সোদপুরে (ই. বি. আর) নিয়ে যাওয়া হয় এবং তথায় তাদের পরিবারবর্গের গোরস্থানে সমাহিত করা হয়।

মৃত্যুর পরদিন অর্থাৎ ১০ ডিসেম্বর কলিকাতার বিখ্যাত পত্রিকাগুলিতে গভীর শোক ও অতি গুরুত্বের সাথে বেগম রোকেয়ার মৃত্যু-সংবাদটি পরিবেশন করা হয়; সেই সাথে তাঁর কর্মময় জীবনের চিত্রও তুলে ধরা হয়।

নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়াকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তাঁর মৃত্যুর পর, The Mussalman বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। এছাড়া মাসিক মোহাম্মদী প্রকাশ করে 'মরহুমা মিসেস আর. এস. হোসেন' শিরোনামে বিশেষ সংখ্যা। এতে দেশের বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকগণ বেগম রোকেয়ার জীবনী, কৃতিত্ব এবং তাঁর সম্পর্কে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন লেখনীর মাধ্যমে।

বাংলার তৎকালীন গভর্ণর শিক্ষাব্রতী বেগম রোকেয়ার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোক প্রকাশ করে বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য ও বেগম রোকেয়ার নিকট-আত্মীয় আবদুল করিম গজনভীর নিকট এক শোকবার্তা প্রেরণ করেন।

দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও সমিতি, কর্পোরেশন, স্কুল বেগম রোকেয়ার মৃত্যুতে গভীরভাবে মর্মাহত হয়ে শোকসভার আয়োজন করে। এমন কি তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য জনসভাও হয়েছে। এছাড়া 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রাঙ্গণে বেগম রোকেয়ার স্মরণে এক শোকসভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন লেডী আবদুর রহিম। মিসেস পি. কে. রায়, মিসেস আবদুল মমিন, মিসেস হাকিম প্রমুখসহ আরও অনেক খ্যাতনামা হিন্দু-মুসলমান মহিলা উক্ত শোকসভায় যোগদান করে বেগম রোকেয়ার প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। উক্ত সভায় বেনিয়াপুকুর নামে পরিচিত রাস্তা অথবা অন্য কোনো রাস্তা বেগম রোকেয়ার নামে করার প্রস্তাব কর্পোশেনকে জানানোর এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

'বঙ্গীয় মুসলিম মহিলা সমিতি', 'বঙ্গীয় পরিশীলন সমিতি', 'অল্-বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন', এবং 'বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ'-এর সম্মিলিত উদ্যোগে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর আলবার্ট হলে বেগম রোকেয়ার স্মরণে এক বিরাট শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। মিসেস পি. কে. রায় সভায় সভাপতিত্ব করেন। উক্ত শোকসভায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি বেগম রোকেয়াকে শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন। সভায় সভাপতি ছাড়াও আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তব্য পেশ করেন।

বেগম রোকেয়ার মৃত্যুতে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলন'-এর সভাপতি কায়কোবাদ বলেন,

আজ তাঁহার মৃত্যুতে আমরা শোকপ্রকাশ করিতেছি সত্য, কিন্তু তাঁহার জীবিতকালে কয়জন তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছি? এই মহীয়সী নারীর কথা আমরা যতই ভাবি–ততই আমাদের শির তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়।

সৈয়দ এমদাদ আলী বেগম রোকেয়ার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে গিয়ে বাঙালি মুসলিম সমাজের জাগরণে বেগম রোকেয়ার ভূমিকার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন :

'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' আজও দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু মিসেস রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন আর নাই। তিনি না থাকলেও তাঁহার আদর্শ রহিয়াছে। সে আদর্শের অনুসরণকারিণীর কি অভাব হইবে? হয়ত হইবে না। হয়তহইবে। তাঁহার মনের সন্ধান আর কাহারও মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা অপরিসীম ছিল, কারণ তিনি একটা মহৎ উদ্দেশ্যের প্রেরণা লইয়া কাজ করিতেন, যে কাজের ভিতরে আমরা যে সুমঙ্গল নিহিত দেখিতাম তাহার ফলেই তাঁহার দেওয়া আঘাত আমাদের তখনকার ক্ষুদ্র সাহিত্যিক-সঙ্ঘের প্রত্যেকের মনে ফুল হইয়া উঠিত। মৃত্যু আজ তাঁহাকে অমর করিয়া দিয়াছে। তাঁহার স্মৃতির উপরে আজ বাংলার মুসলমান সমাজ যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছেন, বাংলার কোনো মুসলমান পুরুষের মৃত্যুতে সেরূপ করিয়াছে বলিয়া জানি না। ইহা শুধু যুগ-লক্ষণ নহে, ইহা আমাদের জাগরণের লক্ষণ।

বেগম রোকেয়া বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীমুক্তি মহান আন্দোলনের অগ্রদূত হিসাবে ইতিহাস-স্বীকৃত ব্যক্তিত্ব। বেগম রোকেয়ার কর্মজীবন বিংশ শতাব্দীতে আরম্ভ হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার রেনেসাঁসের জ্ঞানের আলোক, মুক্তবুদ্ধি, যুক্তিবাদ ও উদারতা তাঁর চিন্তা-চেতনা ও কর্মজীবনকে উদ্ভাসিত করেছিল। উদ্যম, ত্যাগ, কঠোর কর্মনিষ্ঠা, মুক্তবুদ্ধি, চিন্তাশীলতা ও সৃজনশীলতার বলে তিনি তাঁর জীবন ও সময়কালের পারিপার্শ্বিকতার অনেক ঊর্ধ্বে উঠে এবং সহস্র বাধা ও প্রতিবন্ধকতা দূরে সরিয়ে বাঙালি নারীর সামাজিক ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করতে সক্ষম হন। আর তাই তিনি বাঙালি মুসলিম সমাজের সামাজিক ইতিহাসে যুগপরিবর্তনকারী মানবরূপে চির অমর ও অম্লান হয়ে আছেন।

২

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : চিন্তা-চেতনার ধারা

বাংলা নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তিনি নারীমুক্তি কামনা করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই লেখনীর মাধ্যমে সমাজকে নারীর অধঃপতিত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। জোরালো যুক্তি দিয়ে যে বক্তব্য তিনি সমাজের নিকট উপস্থাপিত করেন সমাজে তার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হয়। সমাজ ও জাতির কল্যাণের নিমিত্ত নারীর শিক্ষিত ও সচেতন হওয়ার যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, নারীর মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হওয়া যে আবশ্যক, নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির যে অপরিহার্যতা রয়েছে এবং নারীর মানসিক দাসত্বের অবসান যে একান্তভাবে কাম্য–তাঁর চিন্তা-চেতনার মধ্যে একথা প্রতিফলিত হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) প্রমুখ মনীষী হিন্দু নারী সমাজের অবমাননায় ও নিপীড়নে উদ্বেলিত হয়েছিলেন এবং তাদের সামাজিক ও আইনগত মর্যাদার উন্নতিকল্পে ধর্মীয় অনুশাসনের বিকৃত ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ফলত উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে বাঙালি হিন্দু নারী সমাজের সামাজিক ও আইনগত অবস্থার অনেক উন্নতি সাধন হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার মুসলমান সমাজে রাজা রামমোহন রায় বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় কোনো মানবতাবাদী সমাজ সংস্কারক জন্মগ্রহণ করেননি। তাই দেখা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে রেনেসাঁসের আন্দোলনে হিন্দু সমাজের মেয়েদের অধঃপতিত অবস্থার উন্নতি হয়, সেই রেনেসাঁসের দীপ্তি মুসলমান জেনানার পর্দা ঠেলে আর অগ্রসর হয় না। ইংরাজি শিক্ষা ও ইউরোপীয় জীবনধর্মের আহ্বানে হিন্দু সংস্কারবাদীরা সমাজের উপেক্ষিত নারী সমাজের নিরক্ষরতা অবসানের জন্য কোমর বেঁধে লাগলেন, কিন্তু সে সৌভাগ্য ঘটল না নির্যাতিত মুসলিম নারী সমাজে। ফলে তারা যে অন্ধকারে ছিল সেই অন্ধকারেই থেকে গেল।

বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রবর্তক বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।

She was the first among the Bengali Muslims of her time who publicly raised the question of equal status for women, and thus she started a new era in the history of Bengali Muslim society.

এই আন্দোলনের সূচনাকাল বেগম রোকেয়া রচিত প্রবন্ধ "অলঙ্কার না Badge of Slavary" প্রকাশনার তারিখে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ (১৩১০ বঙ্গাব্দ) বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। কারণ নারীকল্যাণ ও নারীমুক্তির লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তিনি উক্ত প্রবন্ধ রচনা করে এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রায় প্রতিটি রচনা মূলত নারীমুক্তির অভিপ্রায়েই রচিত। তিনি আমৃত্যু নারীসমাজ সম্পর্কে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অন্ধত্বের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল ভাবধারা প্রচার করে বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীমুক্তি আন্দোলনকে দুর্বার করে তোলেন।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় বেগম রোকেয়ার মতিচূর, প্রথম খণ্ড নামক একটি সংকলন গ্রন্থ। এতে সর্বমোট সাতটি প্রবন্ধ রয়েছে। মতিচূরের প্রবন্ধসমূহ পূর্বে নবপ্রভা, মহিলা, নবনূর মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল? বাঙালি মুসলিম নারীজাগরণের ইতিহাসে এই গ্রন্থরি প্রকাশনা নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী ঘটনা। সমাজের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে উক্ত গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি অবরোধবাসিনী নারীর দুঃখ-দুর্দশা ও সমাজের করুণ চিত্র সমাজের নিকট তুলে ধরেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় মতিচূর-এর দ্বিতীয় খণ্ড। এতে সংকলিত হয়েছে তাঁর দশটি নানাবিধ রচনা–সেগুলি ইতোপূর্বে সমকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর Sultana's Dream নামক একখানা ইংরাজি পুস্তিকা। পরবর্তীতে এর বঙ্গানুবাদ সুলতানার স্বপ্ন শিরোনামে মতিচূর, দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়। উক্ত রচনায় তিনি এক অপূর্ব নারীজগতের কল্পনা করেছেন, সেখানে পুরুষ পর্দার আড়ালে গৃহকোণে আবদ্ধ আর নারী মস্তিষ্কবলে অতি সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। সুবিধা লাভ করলে নারীর সুপ্ত প্রতিভা যে ফুলে-ফলে বিকশিত হতে পারে এটাই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর উক্ত রচনায়। পুস্তকটি ছিল নারীর উপর পুরুষের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে চিন্তাশীল একটি প্রকল্প। মনে হয় এই গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি নারীর হীনমন্যতা দূর করে তার নিজ প্রতিভা ও গুণাবলী সম্পর্কে সচেতন করে তোলার প্রয়াস করেছেন।

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর রচিত উপন্যাস পদ্মরাগ। নারীমুক্তির অন্যতম পন্থা হলো নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা–এ ধ্রুব সত্য কথাটিই ফুটে উঠেছে তাঁর উপন্যাস পদ্মরাগে।

বেগম রোকেয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা অবরোধবাসিনী। উক্ত গ্রন্থের মধ্যদিয়ে বেগম রোকেয়া ভারতবর্ষের অবরোধবাসিনী নারী সমাজের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র অতি চমৎকারভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে সর্বমোট ৪৭টি কাহিনী সন্নিবেশিত রয়েছে। এর অধিকাংশ কাহিনী বেগম রোকেয়ার নিজস্ব রচনা এবং এর মধ্যে কয়েকটি লেখিকা উর্দু কাগজ হতে সংগ্রহ করে তার বঙ্গানুবাদ করেছেন। উক্ত ৪৭টি কাহিনীর মধ্যে ২৯টি মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকার কার্ত্তিক, ১৩৩৫, ভাদ্র, ১৩৩৬ এবং শ্রাবণ ১৩৩৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সমাজকে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে সমসাময়িক বাঙালি মুসলিম সমাজে অবরোধবাসিনীর ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ইনস্পেক্টর মৌলভী আবদুল করিম বি. এ., এম.এল.সি বলেন, "অবরোধবাসিনী লিখে লেখিকা আমাদের সমাজের চিন্তাধারার আর একটা দিক খুলে দিয়েছিলেন। অনেকে অনেক প্রকার ইতিহাস লিখে যশস্বী হয়েছে, কিন্তু ভারতের অবরোধবাসিনীদের লাঞ্ছনার ইতোহাস ইতিপূর্বে আর কেহ লিখেননি।...আমার দৃঢ়বিশ্বাস, অবরোধবাসিনী পাঠে ঘুমন্ত জাতির চিন্তা-চক্ষু উন্মীলিত হইবে।"

বেগম রোকেয়ার অনেক কবিতা, বাংলা ও ইংরেজি প্রবন্ধ সমকালের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল–যেগুলি প্রধানত নারী মুক্তির প্রয়াসেই রচিত।

মতিচূর, প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'স্ত্রীজাতির অবনতি'। এই প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া নারীজাতির দূরবস্থার কারণ চিহ্নিত করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের উন্নতির পথ নির্দেশ করেছেন।

ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে বেগম রোকেয়া লক্ষ্য করেন যে, শুধুমাত্র বাংলার মুসলিম নারীসমাজ নয়,–ভারতীয় উপমহাদেশের সমগ্র মুসলিম-নারীসমাজ চিরাচরিত সামাজিক বিধিব্যবস্থায় চরমভাবে অবহেলিত, নির্যাতিত ও দুর্দশাগ্রস্ত। তিনি এও উপলব্ধি করেন, নারীকুল তাদের এ অসহনীয় অবস্থা সম্পর্কে আদৌ সচেতন নন। তাই নারীমনে চেতনার ভাব সঞ্চারণের উদ্দেশ্যে বেগম রোকেয়া নির্ভীকচিত্তে বলেন:

পাঠিকাগণ! আপনারা কি কোন দিন আপনাদের দুর্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যজগতে আমরা কি? দাসী! পৃথিবী হইতে দাস ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু আমাদের দাসত্ব গিয়াছে কি? না।

জীবনের নানাক্ষেত্রে শক্তি দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে, জগতের অগ্রগতিকে সহায়তা করার অধিকার নারীর আছে। কিন্তু নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে তৎকালীন সমাজব্যবস্থা এমনই প্রতিকূল ছিল যে, নারীর স্বাধীন অস্তিত্বই স্বীকার করা হতো না। এবং নিষ্ঠুর সমাজ বিধানের ফাঁদে পড়ে নারী ছিল সমাজের সকল প্রকার ন্যায্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এই সুযোগের অভাবকেই বেগম রোকেয়া নারীজাতির দাসত্বের অন্যতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে তিনি বলেন:

আমাদের এ বিশ্বব্যাপী অধঃপতনের কারণ কেহ বলিতে পারেন কি? সম্ভবত সুযোগের অভাব ইহার প্রধান কারণ। স্ত্রীজাতি সুবিধা না পাইয়া সংসারের সকল প্রকার কার্য হইতে অবসর লইয়াছে। এবং ইহাদিগকে অক্ষম ও অকর্মণ্য দেখিয়া পুরুষজাতি ইহাদের সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল! ক্রমে পুরুষ পক্ষ হইতে যতই বেশি সাহায্য পাওয়া যাইতে লাগিল, স্ত্রী-পক্ষ ততই অধিকতর অকর্মণ্য হইতে লাগিল।...

...আমাদের আত্মাদর লোপ পাওয়ায় আমরাও অনুগ্রহ গ্রহণে আর সঙ্কোচ বোধ করি না।

পুরুষের সাহায্যের উপর সর্বদা নির্ভরশীল হয়ে থাকার ফলস্বরূপ নারীজাতি ক্রমান্বয়ে এমন অসহায়, পরমুখোপেক্ষী, বড় পুত্তলিকাবৎ ও অবমাননাকর জীবে পরিণত হয়েছে যে, নারীর সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হয় না এবং মানবমনের স্বাভাবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলিও আর নারীহৃদয়ে অঙ্কুরিত হয় না। এ প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়া বলেন :

...আমাদের আলস্যের,–প্রকারান্তরে পুরুষের দাসী হইয়াছি। ক্রমশঃ আমাদের মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হইয়া গিয়াছে। এবং আমরা বহুকাল হইতে দাসীপনা করিতে করিতে দাসত্বে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। এইরূপে আমাদের স্বালম্বন, সাহস প্রভৃতি মানসিক উচ্চবৃত্তিগুলি অনুশীলন অভাবে বার বার অঙ্কুরে বিনাশ হওয়ায় এখন আর বোধ হয় অঙ্কুরিত হয় না।

বেগম রোকেয়া আরো আক্ষেপ করে বলেন যে, মানসিক উচ্চবৃত্তির অভাবে নারীজাতি পুরুষের সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে পড়ছে। এ প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়ার বক্তব্য নিম্নরূপ :

..., আমাদের যখন স্বাধীনতা ও অধীনতাজ্ঞান বা উন্নতি ও অবনতির যে প্রভেদ তাহা বুঝিবার সামর্থ্যটুকুও থাকিল না, তখন কাজেই তাঁহারা ভূস্বামী, গৃহস্বামী প্রভৃতি হইতে ক্রমে আমাদের "স্বামী" হইয়া উঠিলেন! আর আমরা ক্রমশ তাঁহাদের গৃহপালিত পশু-পক্ষীর অন্তর্গত অথবা মূল্যবান্ সম্পত্তি বিশেষ হইয়া পড়িয়াছি!

বাহ্যিক চাকচিক্য বেগম রোকেয়াকে আকর্ষণ করতে পারেনি। অলংকারকে তিনি দাসত্বের নিদর্শনরূপে চিহ্নিত করেছেন এবং অতি স্পষ্টভাবে তিনি মন্তব্য করেছেন যে:

আমাদের অতিপ্রিয় অলঙ্কারগুলি– এগুলি দাসত্বের নিদর্শন বিশেষ! এখন ইহা সৌন্দর্যবর্দ্ধনের আশায় ব্যবহার করা হয় বটে; কিন্তু অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তির মতে অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন (originally badges of slavery) ছিল।[৩] তাই দেখা যায় কারাগারে বন্দীগণ পায় লৌহনির্মিত বেড়ি পরে, আমরা (আদরের জিনিস বলিয়া) স্বর্ণরৌপ্যের বেড়ি অর্থাৎ "মল" পরি। উহাদের হাতকড়ি লৌহ-নির্মিত, আমাদের হাতকড়ি স্বর্ণ বা রৌপ্য-নির্মিত চুড়ি! বলা বাহুল্য, লোহার বালাও বাদ দেওয়া হয় না! কুকুরের গলে যে গলাবন্ধ (dog-collar) দেশি, উহারই অনুকরণে বোধ হয় আমাদের জড়োয়া চিক নির্মিত হইয়াছে! অশ্ব হস্তী প্রভৃতি পশু লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ আমরা স্বর্ণ-শৃঙ্খলে কণ্ঠ শোভিত করিয়া মনে করি "হার পরিয়াছি"। গো-স্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া "নাকাদড়ি" পরায়, এ দেশে আমাদের স্বামী আমাদের নাকে "নোলক" পরাইয়াছেন!! ঐ নোলক হইতেছে "স্বামী"র অস্তিত্বের (সধবার) নিদর্শন! অতএব দেখিলেন ভগিনি! আপনাদের ঐ বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি দাসত্বের নিদর্শন ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

অলংকারের প্রতি নারীকুলের আগ্রহ তাঁর হৃদয়কে করেছিল গভীরভাবে মর্মাহত। আর তাই তো অতি দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি বলেছেন:

এই অলংকারের জন্য ললনাকুলের কত আগ্রহ! যেন জীবনের সুখ সমৃদ্ধি উহারই উপর নির্ভর করে! তাই দরিদ্রা কামিনীগণ স্বর্ণরৌপ্যের হাতকড়ী না পাইয়া কাঁচের চুড়ি পরিয়া দাসী-জীবন সর্থক করে। যে (বিধবা) চুড়ি পরিতে অধিকারিণী নহে, তাহার মত হতভাগিনী যেন এ জগতে আর নাই! অভ্যাসের কি অপার মাহিমা! দাসত্বে অভ্যাস হইয়াছে বলিয়া দাসত্বসূচক গহনাও ভাল লাগে।

দাসত্বসূচক অলংকার অঙ্গে ধারণ করা বেগম রোকেয়া নারীমনের দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে গণ্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে:

বাস্তবিক অলংকার দাসত্বের নিদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি অলঙ্কারকে দাসত্বের নিদর্শন না ভাবিয়া সৌন্দর্যবর্ধনের উপায় মনে করা যায়, তাহাই কি কম নিন্দনীয়? সৌন্দর্যবর্ধনের চেষ্টাও কি মানসিক দুর্বলতা নহে? পুরুষেরা ইহা পরাজয়ের নিদর্শন ভাবেন। তাঁহারা কোন বিষয় তর্ক করিতে গেলে বলেন, "আমার কথা প্রমাণিত করিতে না পারিলে আমি চুড়ি পরিব"!

নারীকে সাহায্য করে ও তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে পুরুষ সমাজ নারীজাতিকে একান্তই পরনির্ভরশীল করে তুলেছে এবং তাদের জ্ঞান-চর্চা, ধর্ম-চর্চা এমনকি বিশুদ্ধ আলো-বাতাস হতে বঞ্চিত রেখেছেন। ফলস্বরূপ তারা ক্রমশ ভীরু, দুর্বল চিন্তাশক্তিহীন ও পরনির্ভরশীল এক নির্জীব প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। পুরুষের এই রক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে বেগম রোকেয়া তীব্র শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেছেন :

পুরুষজাতি বলেন, যে তাঁহারা আমাদিগকে "বুকের ভিতর বুক পাতিয়া বুক দিয়া ঢাকিয়া" রাখিয়াছেন, এবং এরূপ সোহাগ আমরা সংসারে পাইব না বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমরা তাই সোহাগে গলিয়া-ঢলিয়া বহিয়া যাইতেছি! ফলত তাঁহারা যে অনুগ্রহ করিতেছেন, তাহাতেই আমাদের সর্বনাশ হইতেছে। আমাদিগকে তাঁহারা হৃদয়-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া জ্ঞান-সূর্যালোক ও বিশুদ্ধ বায়ু হইতে বঞ্চিতা রাখিয়াছেন, তাহাতেই আমরা ক্রমশ মরিতেছি।... তাহাদের অধিক যত্নই আমাদের সর্বনাশের কারণ।

তৎকালীন ভারতবর্ষে নারীর সামাজিক অবস্থা বেগম রোকেয়াকে পীড়িত করেছিল। তিনি বিহারের এক ধনী মুসলিম পরিবারের বধূর 'প্রতিকৃতি' অংকনের মাধ্যমে আটসের ওজনের স্বর্ণলঙ্কার পরিহিতা পুত্তলিকাস্বরূপ নারী করুণ চিত্র সমাজের নিকট তুলে ধরেছেন এবং শ্লেষের সাথে উক্তি করেছেন :

ইঁহাকে কোন প্রসিদ্ধা জাদুঘরে (museum-এ) বসাইয়া রাখিলে রমণীজাতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হইত।

তিনি আরো বলেন যে,

এই প্রকার জড়পিণ্ড হইয়া জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

শিক্ষা হচ্ছে উন্নতির অন্যতম সোপান। জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। অথচ তৎকালে বাংলার মুসলিম নারীকে জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। তাদের জন্য উপযুক্ত কোনো শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা সমাজ তখনও ভাবেনি। অন্যদিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষের সুযোগ সুবিধা ক্রমশ উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে অসম অবস্থা এবং স্ত্রীজাতির শিক্ষালাভের সুযোগের অভাব বেগম রোকেয়াকে করেছিল গভীরভাবে বিচলিত, কারণ শিক্ষার আলো হতে বঞ্চিত থাকার কারণেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী পশ্চাদপদ, নারী উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত। তাই নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব অনুভব করে বেগম রোকেয়া আক্ষেপ করে বলেন :

আমাদের শয়নকক্ষে যেমন সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রূপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না। যেহেতু আমাদের উপযুক্ত স্কুল কলেজ একপ্রকার নাই। পুরুষ যত ইচ্ছা অধ্যয়ন করিতে পারেন–কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞানরূপ সুধাভাণ্ডারের দ্বার কখনও সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইবে কি? যদি কোন উদারচেতা মহাত্মা দয়া করিয়া আমাদের হাত ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সহস্র জনে বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত করেন।

চাঁদের আলো যেমন দুনিয়াকে উদ্ভাসিত করে, তেমনি শিক্ষা মানবমনের সমস্ত কুসংস্কার সংকীর্ণতা পঙ্কিলতা বিদূরিত করে হৃদয়কে করে তোলে মহান ও প্রশস্ত। শিক্ষা ব্যতিরেকে নিজের সম্বন্ধে সচেতনতাবোধ ও নিজের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। বিদ্যাশিক্ষা অনেক দোষ-ত্রুটিকে চোখের সামনে উপস্থাপিত করে সংশোধিত হতেও সহায়তা করে। অথচ তৎকালে বাঙ্গালি মুসলিম সমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি চরম ঔদাসীন্য ও অবহেলা প্রদর্শন করা হতো। স্ত্রীশিক্ষার নামে অনেকের মনে এক অহেতুক আতংক ছিল। তাদের ধারণা ছিল স্ত্রীশিক্ষা সমাজের মধ্যে বিস্তার লাভ লাভ করলে সমাজের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। তারা আশংকা করত শিক্ষার আলোক পেলে নারীদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিবে, ধর্মে অনাস্থা জন্মাবে, পতিভক্তি কমে যাবে, গৃহলক্ষ্মী না হয়ে তারা অকল্যাণময়ী হয়ে পড়বে। এ ধরনের বহু আশংকা স্ত্রীশিক্ষার পরিপন্থী ধারণারূপে পুরুষদের মনে বাসা বেঁধে ছিল। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে সমাজে প্রচলিত এসব কুসংস্কারসমূহ বেগম রোকেয়াকে গভীরভাবে বিচলিত করেছিল। তাই তিনি ক্ষুব্ধ চিত্তে মন্তব্য করেন :

স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে অধিকাংশ লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে যে তাঁহারা "স্ত্রীশিক্ষা" শব্দ শুনিলেই "শিক্ষার কুফলের" একটা ভাবী বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোন কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারির ঐ "শিক্ষার" ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শত কণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে "স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার!"

এ প্রসঙ্গে রোকেয়া আরো বলেন যে, সামাজিক রীতি অনুসরণ করে নারী চাকুরি গ্রহণ করলেও শিক্ষা তার জন্যে আবশ্যক, কারণ শিক্ষা মানবহৃদয়ের জ্ঞানচক্ষুকে উন্মিলিত করে।

অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত নারী অধঃপতিত অবস্থার প্রতিবাদে বেগম রোকেয়া আজীবন তাঁর লেখনী পরিচালনা করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীকে অধিকার অর্জন করতে হলে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে নারীকুলকে নিজেদের সচেষ্ট হতে হবে; কারণ আপনা হতে পুরুষ নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করবে না। আরো চাই নারীদের যোগ্যতা অর্জন। তাই বেগম রোকেয়া নারীকুলকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য নিজেদের সাধনা করতে হবে, ত্যাগ স্বীকার করতে হবে এবং সর্বোপরি নিজেদেরকে সচেষ্ট হতে হবে, তবেই নারী সমাজের উন্নয়ন সহজতর ও দ্রুত হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

আমাদের উচিত যে স্বহস্তে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করি। এক স্থলে আমি বলিয়াছি "ভরসা কেবল প্রতিতপাবন" কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, ঊর্ধে হস্ত উত্তোলন না করিলে পতিতপাবনও হাত ধরিয়া তুলিবেন না। ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন যে নিজে নিজের সাহায্য করে, ("God helps those that help themselves")। তাই বলি আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোল আনা উপকার হইবে না।

পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর উপর পুরুষের প্রভুত্ব এবং নারীর মানসিক দাসত্ব বেগম রোকেয়াকে পীড়িত করেছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বক্তব্য ছিল এরূপ :

অনেকে মনে করেন যে পুরুষের উপার্জিত ধন ভোগ করে বলিয়া নারী তাহার প্রভুত্ব সহ্য করে। কথাটা অনেক পরিমাণে ঠিক। বোধ হয় স্ত্রীজাতি প্রথমে শারীরিক শ্রমে অক্ষম হইয়া পরের উপার্জিত ধনভোগে বাধ্য হয়। এবং সেইজন্য তাহাকে মস্তক নত করিতে হয়। কিন্তু এখন স্ত্রীজাতির মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হওয়ায় দেখা যায়, যে স্থলে দরিদ্রা স্ত্রীলোকেরা সূচিকর্ম বা দাসীবৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া পতি পুত্র প্রতিপালন করে, সেখানেও ঐ অকর্মণ্য পুরুষেরাই "স্বামী" থাকে। আবার যিনি স্বয়ং উপার্জন না করিয়া প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করেন, তিনিও তার স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব করেন! এবং স্ত্রী তাঁহার প্রভুত্বে আপত্তি করেন না।

নারীর উপর পুরুষ সমাজের অন্যায় প্রভুত্ব বেগম রোকেয়া মেনে নিতে পারেননি এবং এই সামাজিক কুপ্রথার আশু পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে নারীজাতিকে তিনি জেগে উঠার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন:

"অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনী!"

প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, জানি; সমাজ মহা গোলযোগ বাধাইবে জানি; ভারতবাসী মুসলমান আমাদের জন্য "কৎল" এর (অর্থা প্রাণদণ্ডের) বিধান দিবেন এবং হিন্দু চিতানল বা তুষানলের ব্যবস্থা দিবেন, জানি! (এবং ভগ্নিদিগেরও জাগিবার ইচ্ছা নাই, জানি! কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্তে জাগিতে হইবেই। বলিয়াছি ত কোন ভাল কাজ অনায়াসে করা যায় না। কারামুক্ত হইয়াও গ্যালিলিও বলিয়াছিলেন, কিন্তু যাহাই হউক পৃথিবী ঘুরিতেছে ("but nevertheless it (Earth) does move")!! আমাদিগকেও ঐরূপ বিবিধ নির্যাতন সহ্য করিয়া জাগিতে হইবেই।

এ বিরাট বিশ্বে নারীর জন্যও বিশাল কর্মক্ষেত্র রয়েছে। নারীর স্থান অন্তঃপুরের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নয়, অন্তঃপুরের বাইরে পুরুষের; সমকক্ষরূপে সবকর্ম করার অধিকার নারীর আছে–এ কথার ধ্বনি প্রথম শোনা যায় বেগম রোকেয়ার সাহসী লেখনীতে। তাঁর নিকট নারীর স্বাধীনতার লক্ষ্য হচ্ছে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করে পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন। এ বিষয়ে বেগম রোকেয়া মন্তব্য করেন :

স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা বুঝিতে হইবে।...। পুরুষের সমকক্ষতা[১] লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডীকেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডীম্যাজিস্ট্রেট, লেডীব্যারিস্টার, লেডীজজ—সবই হইব! পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী Viceroy হইয়া এ দেশের সমস্ত নারীকে "রাণী" করিয়া ফেলিব!! উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা "স্বামী"র গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী চরমভাবে অবহেলিত, এমন কি কার্যক্ষেত্রেও। নারীর এ অবহেলিত অবস্থা বেগম রোকেয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন

কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষ অপেক্ষা কম পারিশ্রমিক পায়। নারী ও পুরুষের এ অসম অবস্থা দর্শনে অন্তরের ক্ষোভ ফুটে উঠে তাঁর লেখনীতে–

কার্য্যক্ষেত্রেও পুরুষের পরিশ্রমের মূল্য বেশি, নারীর কাজ সস্তায় বিক্রয় হয়। নিম্নশ্রেণীর পুরুষ যে কাজ করিলে মাসে ২ বেতন পায়, ঠিক সেই কাজে স্ত্রীলোকে ১ পায়। চাকরের খোরাকি মাসিক ৩ আর চাকরাণীর খোরাকী ২।

সামাজিক পরিবেশ ও প্রথা এবং অনুশাসন তৎকালীন নারী প্রতিভা বিকাশের পথে অস্বাভাবিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। উপরন্তু সমাজের অনেকে মনে করতেন যে, নারী দুর্বল, মুর্খ, কাজেই উন্নতি করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই নারী তার বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করুক–বেগম রোকেয়া এ কামনা প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ :

যদি বল, আমরা দুর্বলভুজা, মূর্খ, হীনবুদ্ধি নারী। সে দোষ কাহার? আমাদের। আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহুলতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয় না? এখন একবার জ্ঞানচর্চা করিয়া দেখি ত এ অনুর্বর মস্তিষ্ক (dull head) সুতীক্ষ্ণ হয় কি না!

নারী ও পুরুষ নিয়ে সমাজ গঠিত। নারী সমাজেরই এক অঙ্গ। সুতরাং সমাজের এই অর্ধেক নারী সমাজকে অজ্ঞ ও পশ্চাতে রেখে পুরুষের একাকী উন্নতি সাধন করার আশা সুদূরপরাহত। এ ক্ষেত্রে একমাত্র নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই বয়ে আনতে পারে জাতীয় কল্যাণ। তাই সমাজ তথা জাতির কল্যাণের লক্ষ্যে পুরুষের ন্যায় নারীরও সমভাবে এগিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বেগম রোকেয়া বলেন :

আমরা সমাজেরই অর্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে–একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতা-মাতা–উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে–সর্বত্র আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক। প্রথমতঃ উন্নতির পথে তাঁহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন–আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। এখন তাঁহারা উন্নতিরাজ্যে গিয়া দেখিতেছেন সেখানে তাঁহাদের সঙ্গিনী নাই বলিয়া তাঁহারা একাকী হইয়া আছেন! তাই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেছেন! এবং জগতের যে সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন। আমাদের উচিত যে তাঁহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী সহকর্মিণী সহধর্মিণী ইত্যাদি হইয়া তাঁহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্মণ্য পুতুল জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, একথা নিশ্চিত।

নারীর বর্তমান হীনবস্থার জন্য পুরুষ প্রধানত দায়ী। তারা যুগ যুগ ধরে নারীকে তাদের করতলে রাখার জন্য সচেষ্ট। নারী যে পুরুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারছে না এর পিছনে আছে পুরুষের সুকৌশলী পরিকল্পনা। ধর্মের প্রতি মানবজাতি স্বভাবতই

দুর্বল। তাই পুরুষগণ ধর্মকে নারী শাসনের হাতিয়াররূপে ব্যবহার করেছে। ধর্মের নামে পুরুষ সমাজ যে নারীদের উপর প্রভুত্ব করে আসছে–এ অভিযোগও বেগম রোকেয়া তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সমাজের নিকট তুলে ধরেন :

আমাদের যথাসম্ভব অধঃপতন হওয়ার পর দাসত্বের বিরুদ্ধে কখনও মাথা তুলিতে পারি নাই। তাহার প্রধান কারণ এই বোধহয় যে, যখনই কোন ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনই ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচনরূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে।...। আমরা প্রথমতঃ যাহা সহজে মানি নাই, তাহা পরে ধর্মের আদেশ ভাবিয়া শিরোধার্য করিয়াছি।

বেগম রোকেয়া যুক্তি দিয়ে বুঝাবার প্রয়াস পেয়েছেন যে, ধর্মগ্রন্থগুলি আর কিছুই নয়–এগুলি শক্তিশালী পুরুষ-রচিত শাস্ত্র এবং পুরুষ সমাজ–নারীকে নিজ আয়ত্তে রাখার জন্য নিজেদের সুবিধামতো বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে। বেগম রোকেয়ার ভাষায়:

'আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

...এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ-রচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুণিদের বিধানে যে-কথা শুনিতে পান, কোন স্ত্রী মুণির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীতে নিয়ম দেখিতে পাইতেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদের সেরূপ যোগ্যতা কই যে মুণি ঋষি হইতে পারিতেন?...। যদি ঈশ্বর কোন দূত রমণী-শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত বোধহয় কেবল এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন। আমেরিকা এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত যাইয়া "রমণী জাতিকে নরের অধীন থাকিতে হইবে" ঈশ্বরে এই আদেশ শুনান নাই কেন? ঈশ্বর কি কেবল এশিয়ারই ঈশ্বর? আমেরিকায় কি তাঁহার রাজত্ব ছিল না।

ধর্মের নামে পুরুষ যে নারীর উপর প্রভুত্ব করছে এবং প্রভুত্ব যে নারীর সহ্য করা উচিত নয় এ কথাই উচ্চারিত হয় বিদ্রোহী বেগম রোকেয়ার কণ্ঠে। তিনি বলেন:

...এখন আমাদের আর ধর্মের নামে নত মস্তকে নরের অযথা প্রভুত্ব সহ্য করা উচিত নহে। যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানেনারীর প্রতি অত্যাচার অধিক।...। যেখানে ধর্মবন্ধন শিথিল, সেখানে রমণী প্রায় পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থায় আছেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে নারীমুক্তির পথ প্রদর্শিকা বেগম রোকেয়া অসীম সাহসিকতার সাথে ঘুমন্ত নির্জীব নারীজাতিকে জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে পুরুষ শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সমাজে পুরুষের সাথে নারী সমাধিকার ও নারী-স্বাধীনতার দাবি উত্থাপিত করেন। কিন্তু একজন নারী-কণ্ঠের এমন যুক্তিসম্মত তীব্র প্রতিবাদ সেদিনের সমাজের অনেকেই সহজে গ্রহণ করতে পারেননি। পুরুষের উপর বেগম রোকেয়ার তীক্ষ্ণ আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে মৌলভী সৈয়দ আব্দুল্লা আল-মুসাভী ১৩১১ আশ্বিনের নবনূর পত্রিকায় 'অবনতি প্রসঙ্গ' নামক একটি প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধে বলেন।

...যদি সমস্ত বিষয়েই কামিনীকূল পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করেন, তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে ধর্মপ্রচার, এবং সমাজসংস্কার প্রভৃতিতেও তাঁহারা পুরুষের সমকক্ষিনী হইবেন? ইতিহাসে যে কোথাও স্ত্রীলোক ধর্মতারিণী হইয়াছেন বলিয়া দেখি নাই।

তিনি আরো মন্তব্য করেন :

নারী কখনও সমস্ত বিষয়ের পুরুষের সমতুল্য হইতে পারে না–তাহা হইলে স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে।...। কার্যের জন্য যে স্থানে যাহা স্বভাবত: স্থাপিত তাহা সেই স্থানেই শোভা পায়। সেইরূপ কার্যক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের ও পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে। এমতস্থলে যদি উভয়েই কার্যক্ষেত্রে একই কেন্দ্রে অবতীর্ণ হয় তাহা হইলেই বিপরীত ফল নিশ্চিত।

সমাজের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে,–এক কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়া নারী ও পুরুষ উভয়কে সমভাবে এগিয়ে যাবার দাবি জানিয়ে যে বক্তব্য সমাজের নিকট তুলে ধরেন; তার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করে মৌলভী সৈয়দ আবদুল্লাহ আল মুসাভী আরো বলেন যে :

রমণী যেমন "Ministering angle" তেমনই তাঁহার জন্য গৃহকার্য্য, ধর্মকর্ম প্রভৃতি উপযুক্ত ক্ষেত্র। পুরুষের জন্যও রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি যোগ্য কার্যস্থল। ইহার ব্যক্তিক্রম হইলে তাহা ultra vires হইবে; সুতরাং আইন বিরুদ্ধ। বিদ্যাশিক্ষা মোটের উপর ভাল কথা হইলেও যে সকলের নিমিত্ত সকল বিদ্যাই উপকারী বা আবশ্যকীয় তাহা নহে।...। জগতে যদি কোন বিদ্যায় স্ত্রীপুরুষ উভয়েই সমতুল্য অধিকার থাকে তাহা হইলে ধর্মবিদ্যা–ধর্মশিক্ষায় উভয়ের অধিকারে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই; এ স্থলে উভয়ে উভয়ের পুরুষ-সদৃশ হইলেও রমণী কখনও পুরুষের সমকক্ষতা করিতে পারে না।

অবশ্য মৌলভী সৈয়দ আবদুল্লা আল মুসাভী সঙ্গে সঙ্গে বেগম রোকেয়ার ভূয়সী প্রশংসা করে এও বলেন যে :

তাঁহার যে লেখনি পরিচালনে অসাধারণ ক্ষমতা আছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তিনি ঈষৎ হাস্যে, বিদ্রূপের তীব্র কটাক্ষে, মধুর টিপ্পনির দ্বারা আমাদের পুরুষসমাজের উপর তীব্র আক্রমণ বড়ই সুনিপুণা। তাঁহার সুমধুর বাক্যবানে পুরুষসমাজ একান্তই জর্জরিত হইয়া গিয়াছে।

নবনূর, ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩১১ বঙ্গাব্দে বেগম রোকেয়ার, 'আমাদের অবনতি' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদে নওশের আলী খান ইউসুফজী লেখেন, "একেই কি বলে অবনতি?' উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলেন :

পাঠিকাগণ। সত্যই কি আপনারা দাসী? আপনারা কি "খানম", "বেগম", "চৌধুরাণী", "রাণী", "দেবী", "বৃদ্ধা" ও "চণ্ডা" নহেন?...

কে বলে আপনারা অলস? নারীজাতি পুরুষের অপেক্ষা অলস একথা স্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

আপনাদের অতি প্রিয় অলংকারগুলি কি সত্যই আপনাদের দাসত্বের নিদর্শন?...। পুরুষ কি আপনাদিগকে শুধু "মলের বেড়ী", "চুড়ির হাতকড়ী", "নোলকের নাকদড়ি"

ইত্যাদি পরাইয়া সন্তুষ্ট রহিয়াছে? পুরুষ কি আপনাদের জন্য আর কিছু করে নাই? জগদ্বিখ্যাত তাজমহল কাহার নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, সেকেন্দারা কাহার নামে নির্মিত হইয়াছিল? মতীমস্‌জিদ কাহার নামে নিবেদিত হইয়াছিল? জোবেদা নহর কাহার নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল?...।

যখন কোন ভগ্নি মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন অমনই ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচনরূপ অস্ত্রাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে, ইতিহাসে একথা প্রমাণ নাই। বরং আপনাদের কেহ একটুকু মাথা উঠাইলে আমরা তাহাকে আকাশে চড়াইতে চেষ্টা করি, তাঁহার গুণ একশো হাজার বার বর্ণনা করি। "আপনাদিগকে" অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলি ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে...। এ অনাহূত গর্হিত কথাগুলি লিখিলে কি আপনাদের অবনতির কারণ অনুসন্ধানে কোন বাধা জন্মিত?

নওশের আলি খান ইউসুফজী বেগম রোকেয়ার নারী-স্বাধীনতা দাবির প্রতিবাদে আরো বলেন :

আপনারা "যে পরিশ্রম স্বামী (বা স্বামী নামক ব্যক্তির) গৃহকার্য্যে ব্যয়" করেন, সেই পরিশ্রম দ্বারা স্বাধীন ব্যবসা করিতে পারেন বটে, কিন্তু স্বামী বেচারা আপনাদের দাসত্বের নিদর্শন অলংকার জোগাইতে, "জামায়েজাঁনা" পরাইতে, উদরান্নসংস্থান করিতে যে পরিশ্রম করেন তাহা না করিলে আপনাদের যে কি দশা ঘটিবে তাহা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? আপনারা স্বাধীন হউন ভাল কথা, কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যবহার না করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

অন্যদিকে তৎকালীন পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের বিরুদ্ধে বেগম রোকেয়ার সেদিনের যুক্তিসংগত ও নির্ভীকতর সমালোচনা সাদরে বরণ করে নিয়ে খয়র খাহ মুনশী তাঁর বক্তব্যে বেগম রোকেয়া সমাজকে যে কষাঘাত করেছেন তার এই কষাঘাতের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন :

অবশ্যই সমাজের পৃষ্ঠে কষাঘাত করিবার শক্তি তাঁহার আছে। এ জন্যই দেখিতেছি যে, তাঁহার কষাঘাতে কোন কোন স্থানে আর্তনাদ উত্থিত রহিয়াছে। ইহা সুলক্ষণ বলিতে হইবে। আশ্বিনের নবনূর-এর "অবনতি প্রসঙ্গ" এইরূপ একটি আর্তনাদ।

খয়র খাহ মুনশী এ কথাও মনে করেন যে, অধঃপতিত মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য বেগম রোকেয়ার ন্যায় সবল হস্তের কষাঘাতের প্রয়োজনীয়তা আছে।

মতিচূর, প্রথম খণ্ডের চতুর্থ প্রবন্ধের শিরোনাম হচ্ছে 'অর্দ্ধাঙ্গী'। প্রবন্ধটি ইতোপূর্বে ১৩১০ বঙ্গাব্দে মহিলা ও ১৩১১ বঙ্গাব্দে নবনূর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধেও বেগম রোকেয়া নারী সমাজের অধঃপতিত অবস্থার করুণ চিত্র সমাজের নিকট তুলে ধরেছেন।

নারীকে পুরুষের পাশাপাশি চলার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। নারীকে গৃহে বন্দিনী রেখে দেশবাসী উন্নয়নের জন্য যতই সচেষ্ট হউক না কেন তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য, কারণ সমাজে নারী ও পুরুষের অসম অবস্থান উন্নতির সকল প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করছে। এ প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়ার বক্তব্য হলো নিম্নরূপ :

যে শকটের এক চক্র বড় (পতি) এবং এক চক্র ছোট (পত্নী) হয়, সে শকট অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে না; সে কেবল একই স্থানে (গৃহকোণেই) ঘুরিতে থাকিবে। তাই ভারতবাসী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না।

নারী ও পুরুষের স্বার্থ এক ও অভিন্ন। সমাজে নারীরও কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। স্ত্রী স্বামীর সহচরী, কিন্তু নারী তার এ ভূমিকা পালনে সক্ষম নয়, কেননা পুরুষ-শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে পুরুষের তুলনায় সকল দিকে অযোগ্য করে রাখা হয়েছে। সমাজে নারী ও পুরুষের এই অসম অবস্থান লক্ষ্য করে বেগম রোকেয়া বলেন:

কন্যাকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় না, যাহাতে সে স্বামীর ছায়াতুল্যা সহচরী হইতে পারে। প্রভুদের বিদ্যার গতির সীমা নাই, স্ত্রীদের বিদ্যার দৌড় সচরাচর "বোধোদয়" পর্যন্ত! স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন একটা বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ সেলাই করিবার জন্য মাপেন!

মায়ের নিকট হতে লব্ধ শিক্ষা সন্তানের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা–মায়ের কাছ থেকে সন্তান যা শিখতে পারে, জগতে আর কারো কাছ থেকে তা অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। শিক্ষিত মাতার সন্তান হবে শিক্ষিত; কেননা শিশু অবস্থায় মাতার দোষগুণ শিশু গ্রহণ করে। সুতরাং স্ত্রীলোকদের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নাই, তৎকালীন প্রচলিত এই মতবাদটি যে ভ্রান্ত এই মতের সপক্ষে যুক্তি প্রয়োগ করে বেগম রোকেয়া বলেন :

অনেকে বলেন, স্ত্রীলোকদের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নাই। মেয়েরা চর্ব্য, চোষ্য রাঁধিতে পারে, বিবিধ প্রকার সেলাই করিতে পারে, দুই চারি খানা উপন্যাস পাঠ করিতে পারে, ইহাই যথেষ্ট। আর বেশি আবশ্যক নাই। কিন্তু ডাক্তার বলেন যে আবশ্যক আছে, যেহেতু মাতার দোষ গুণ লইয়া পুত্রগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়। এইজন্য দেখা যায় যে, আমাদের দেশে অনেক বালক শিক্ষকের বেত্রতাড়নায় কণ্ঠস্থ বিদ্যার জোরে এফ. এ. বি. এ. পাস হয় বটে; কিন্তু বালকের মনটা তাহার মাতার সহিত রান্নাঘরেই ঘুরিতে থাকে! তাহাদের বিদ্যাপরীক্ষায় এ কথার সত্যতার উপলব্ধি হইতে পারে।

ধর্মীয় অনুশাসন ভংগ করে মুসলিম সমাজ নারীকে পার্থিব সম্পত্তি এবং এমন কি অপার্থিব সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত করছে। তাই বেগম রোকেয়া দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন:

"মুহম্মদীয় আইনে" দেখিতে পাইবেন যে বিধান আছে, পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্ধেক ভাগ পাইবে। এ নিয়মটি কিন্তু পুস্তকেই সীমাবদ্ধ। যদি আপনারা একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কোন ধনবান মুসলমানের সম্পত্তি বিভাগ করা দেখেন, কিম্বা জমিদারী পরিদর্শন করিতে যান, তবে দেখিবেন কার্যত কন্যার ভাগে শূন্য (০) কিংবা যৎসামান্য পড়িতেছে।

আমি এখন অপার্থিব সম্পত্তির কথা বলিব। পিতার স্নেহ, যত্ন ইত্যাদি অপার্থিব সম্পত্তি। এখানেও পক্ষপাতিত্বের মাত্রা বেশি। ঐ যত্ন, স্নেহ, হিতৈষিতার অর্ধেকই আমরা পাই কই? যিনি পুত্রের সুশিক্ষার জন্য চারি জন শিক্ষক নিযুক্ত করেন, তিনি কন্যার জন্য দুই জন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন কি? যেখানে পুত্র তিনটা (বি,এ, পর্যন্ত)

পাস করে, সেখানে কন্যা দেড়টা পাস (এন্ট্রাসি পাস ও এফ, এ, ফেল্) করে কি? পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা করা যায় না, বালিকাদের বিদ্যালয় সংখ্যায় পাওয়াই যায় না। যে স্থলে ভ্রাতা "শমস্-উল্-ওলামা"[১] সে স্থলে ভগিনী "নজম্-উল্-ওলামা" হইয়াছেন কি? তাঁহাদের অন্তঃপুর গগনে অসংখ্য "নজমন্নেসা" "শম্সন্নেসা" শোভা পাইতেছেন বটে। কিন্তু আমরা সাহিত্য-গগনে "নজম্-উল্-ওলামা" দেখিতে চাই!

তৎকালীন মুসলমান নারী সমাজের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা বেগম রোকেয়াকে গভীরভাবে মর্মাহত করেছিল। তাই তিনি অতি দুঃখ করে বলেন :

আমাদের জন্য এ দেশে শিক্ষার বন্দোবস্ত সচরাচর এইরূপ– প্রথমে আরবীয় বর্ণমালা, অতঃপর কোরান শরীফ পাঠ। কিন্তু শব্দগুলির অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া হয় না, কেবল স্মরণশক্তির সাহায্যে টিয়াপাখির মত আবৃত্তি কর।...। বঙ্গদেশেও বালিকাদিগকে রীতিমত বঙ্গভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না। কেহ কেহ উর্দু পড়িতে শিখে, কিন্তু কলম ধরতে শিখে না। ইহাদের উন্নতির চরম সীমা সল্মা চুমকির কারুকার্য, উলের জুতা মোজা ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা পর্যন্ত।

ধর্মের অপব্যাখ্যার দ্বারা মুসলমান সমাজ যে প্রকৃতপক্ষে তাদের নারীদের ইসলাম প্রদত্ত সকল অধিকার থেকে যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত রেখেছে–এ অমোঘ সত্য বেগম রোকেয়া নির্ভীকচিত্তে প্রকাশ করে বাঙালি মুসলিম নারীদের ইসলামের বিধান অনুযায়ী নারীর ন্যায় অধিকার সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নারী মুক্তিদাতারূপে হযরত মুহাম্মদ (দ:)-এর বিশেষ ভূমিকার কথা পুরুষ সমাজকে স্মরণ করিয়ে দেন :

পয়গম্বরদের ইতিহাসে শুনা যায়, জগতে যখনই মানুষ বেশি অত্যাচার অনাচার করিয়াছে, তখনই এক-একজন পয়গম্বর আসিয়া দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করিয়াছেন। আরবে স্ত্রীজাতির প্রতি অধিক অত্যাচার হইতেছিল; আরববাসিগণ কন্যা হত্যা করিতেছিল তখন হযরত মোহাম্মদ (দ:) কন্যাকুলের রক্ষকস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তিনি কেবল বিবিধ ব্যবস্থা দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, স্বয়ং কন্যা পালন করিয়া আদর্শ দেখাইয়াছেন। তাঁহার জীবন ফাতেমাময় করিয়া দেখাইয়াছেন—কন্যা কিরূপ আদরণীয়া। সে আদর, সে স্নেহ জগতে অতুল। আহা! তিনি নাই বলিয়া আমাদের এ দুর্দশা।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার রেনেসাঁস যুগে হিন্দু সমাজের নারীদের হীনাবস্থা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মহান পুরুষ শাস্ত্রকারদের অনুশাসনকে হাতিয়ার করেই হিন্দু নারীদের ধর্মের দোহাই দিয়ে যে অধঃপতিত অবস্থায় রাখা হয়েছিল তা থেকে তাদের উন্নত করার সফল প্রয়াস করেছিলেন। সেরূপ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হতে আমৃত্যু মুক্তমনা মানবতাবাদী বেগম রোকেয়া ইসলামি অনুশাসন ঐতিহ্যকে ব্যাখ্যা করে মুসলিম সমাজ যে প্রকৃতপক্ষে তাদের নারীদের ইসলাম প্রদত্ত সকল অধিকার হতে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করে চলেছেন এ অমোঘ সত্য নির্ভীকতচিত্তে জনসম্মুখে উপস্থাপিত করে বাঙালি মুসলিম নারী ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা করেছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বেগম রোকেয়া পুরুষের সাথে নারীর সমাধিকার দাবি করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি এক অতি তাৎপর্যপূর্ণ উপমা উপস্থাপিত করে বলেন :

আমরা ঈশ্বর ও মাতার নিকট ভ্রাতাদের "অর্ধেক" নহি। তাহা হইলে এইরূপ স্বাভাবিক বন্দোবস্ত হইত–পুত্র যেখানে দশ মাস স্থান পাইবে, দুহিতা সেখানে পাঁচ মাস! পুত্রের জন্য যতখানি দুগ্ধ আমদানি হয়, কন্যার জন্য তাহার অর্ধেক! সেরূপ ত নিয়ম নাই! আমরা জননীর স্নেহ মমতা ভ্রাতার সমানই ভোগ করি। মাতৃহৃদয়ে পক্ষপাতিত্ব নাই। তবে কেমন করিয়া বলিব, ঈশ্বর পক্ষপাতী? তিনি কি মাতা অপেক্ষা অধিক করুণাময় নহেন?

নারীর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ কামনা করে বেগম রোকেয়া বলেন :

জীবনের প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু অন্নবস্ত্র; সুতরাং রন্ধন ও সেলাই অবশ্যই শিক্ষণীয়। কিন্তু তাই বলিয়া জীবনটাকে শুধু রান্নাঘরেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নহে।

এ পৃথিবীতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর নির্ভরশীল; কেহই অপরের সাহায্য ব্যতীত চলতে পারে না। তাই নিছক শারীরিক শক্তির দোহাই দিয়ে নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্বের বিপক্ষে যুক্তিবাদী বেগম রোকেয়া নিম্নরূপ প্রতিবাদমূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেন:

স্বীকার করি যে, শারীরিক দুর্বলতাবশত নারীজাতি অপর জাতির সাহায্যে নির্ভর করে। তাই বলিয়া পুরুষ "প্রভু" হইতে পারে না।

কারণ হিসেবে বেগম রোকেয়া বলেন :

অবলার হাতেও সমাজের জীবন-মরণের কাটি আছে, যেহেতু "না জাগিলে সব ভারত-ললনা" এ ভারত আর জাগিতে পারিবে না। প্রভুদের ভীরুতা কিম্বা তেজস্বিতা জননীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে কেবল শারীরিক বলের দোহাই দিয়া অদূরদর্শী ভ্রাতৃমহোদয়গণ যেন শ্রেষ্ঠত্বের দাবি না করেন।

উপযুক্ত শিক্ষা লাভের সুযোগের অভাবকে নারীজাতির অধঃপতনের অন্যতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত করে বেগম রোকেয়া বলেন :

আমরা পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষা ও অনুশীলনের সম্যক সুবিধা না পাওয়ায় পশ্চাতে পড়িয়া আছি। সমান সুবিধা পাইলে আমরাও কি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিতাম না? অশৈশব আত্মনিন্দা শুনিতেছি, তাই এখন আমরা অন্ধভাবে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করি, এবং নিজেকে অতি তুচ্ছ মনে করি।

তিনি অভিযোগের সুরে আরও বলেন :

পুরুষগণ আমাদিগকে সুশিক্ষা হতে পশ্চাৎপদ রাখিয়াছেন বলিয়া আমরা অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছি।

কোনো ধর্মকে আঘাত করা বেগম রোকেয়ার লক্ষ্য ছিল না। তাঁর লেখনী পরিচালনার উদ্দেশ্য নারী জাগরণ–যার প্রয়োজন নারীশিক্ষার ব্যাপক প্রসারতা। এ প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়ার বক্তব্য ছিল এরূপ :

আমি ভগিনীদের কল্যাণ কামনা করি, তাঁহাদের ধর্মবন্ধন বা সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে বাহির করিতে চাহি না। মানসিক উন্নতি

করিতে হইলে হিন্দুকে হিন্দুত্ব বা খ্রিস্টানকে খ্রিস্টানী ছাড়িতে হইবে এমন কোন কথা নাই। আপন আপন সম্প্রদায়ের পার্থক্য রক্ষা করিয়াও মনটাকে স্বাধীনতা দেওয়া যায়। আমরা যে কেবল উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে অবনত হইয়াছি, তাই বুঝিতে ও বুঝাইতে চাই।

নারীকূলকে পুরুষের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার বিদ্রোহ উত্তেজিত করাও বেগম রোকেয়ার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল না। তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে সমাজে নারীর অবহেলিত অবস্থায় তাঁর হৃদয়ের গভীর বেদনাবোধ। সেই সঙ্গে লক্ষণীয়, পুরুষ প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি তাঁর সরস আঘাত। অতুলনীয় শ্লেষের সাথে তিনি পুরুষ জাতিকে অভয় দিয়েছেন যে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার নারী-বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র পরিকল্পিত হচ্ছে না। তিনি বলেন :

অনেকে হয়ত ভয় পাইয়াছেন যে, বোধ হয় একটা পত্নীবিদ্রোহের আয়োজন করা হইতেছে। অথবা ললনাগণ দলে দলে উপস্থিত হইয়া বিপক্ষকে রাজকীয় কার্যক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিয়া সেই পদগুলি অধিকার করিবেন– শামলা, চোগা, আইন কানুনের পাঁজি পুঁথি লুঠিয়া লইবেন! অথবা সদলবলে কৃষিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কৃষকগুলিকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের শস্যক্ষেত্র দখল করিবেন, হাল গরু কাড়িয়া লইবেন, তবে তাঁহাদের অভয় দিয়া বলিতে হইবে–নিশ্চিন্ত থাকুন।

মতিচূর, প্রথম খণ্ডের পঞ্চম প্রবন্ধ 'সুগৃহিণী'। সংসারে একজন নারীর দায়িত্ব অপরিসীম। সংসার পরিচালনার জন্য প্রয়োজন একজন সুগৃহিণীর। আর সুগৃহিণী হবার নিমিত্তই সুশিক্ষা আবশ্যক–এ ছিল বেগম রোকেয়া রচিত 'সুগৃহিণী' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য। তিনি বলেন :

সমাজ আমাদের উচ্চশিক্ষা লাভ করা অনাবশ্যক মনে করেন। পুরুষ বিদ্যালাভ করেন অন্ন উপার্জনের আশায়, আমরা বিদ্যালাভ করিব কিসের আশায়? অনেকের মত আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার প্রয়োজন নাই। যেহেতু আমাদিগকে অন্নচিন্তা করিতে হয় না, সম্পত্তি রক্ষার্থে মোকদ্দমা করিতে হয় না, চাকরিলাভের জন্য সার্টিফিকেট ভিক্ষা করিতে হয় না, "নবাব" "রাজা" উপাধিলাভের জন্য শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের খোসামোদ করিতে হয় না, কিংবা কোন সময়ে দেশরক্ষার্থে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে না। তবে আমরা উচ্চশিক্ষা লাভ (অথবা Mental culture) করিব কিসের জন্য? আমি বলি, সুগৃহিণী হওয়ার নিমিত্তই সুশিক্ষা (Mental culture) আবশ্যক।

ঘরকন্নার দৈনন্দিন কার্যগুলি সুচারুরূপে সম্পাদনা করার জন্যও বিশেষ জ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োজন। কেবলমাত্র শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত নারীই পারে পরিমিত ব্যয়ে সংসারকে সুন্দর ও পরিপাটি করে রাখতে। এ প্রসঙ্গে রোকেয়ার বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ :

সুশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে আমরা টাকার সদ্ব্যবহার শিখিব কিরূপে?

শিশুপালন থেকে শুরু করে পরিবারভুক্ত সদস্যের সেবা-শুশ্রূষা করা ইত্যাদি মানবীয় বিষয়ে দৃষ্টি রাখা গৃহিণীর কর্তব্য–আর এজন্য চাই শিক্ষাপ্রাপ্ত নারী। শিশুর চরিত্র গঠনে মায়ের ভূমিকার উল্লেখ করে বেগম রোকেয়া বলেন :

বীরাঙ্গনাই বীর-জননী হয়! মাতা ইচ্ছা করিলে শিশু-হৃদয়ের বৃত্তিগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া তাহাকে তেজস্বী, সাহসী, বীর, ধীর সবই করিতে পারে। অনেক মাতা শিশুকে মিথ্যা বলিতে ও সত্য গোপন করিতে শিক্ষা দেয়, ভবিষ্যতে সেই পুত্রগণ ঠগ, জুয়াচোর হয়। অযোগ্য মাতা কারণে অকারণে প্রহার করিয়া শিশুর হৃদয় নিস্তেজ (spirit low) করে, ভবিষ্যতে তাহারা শ্বেতাঙ্গের অর্ধচন্দ্র ও সবুট পদাঘাত নীরবে-অক্লেশে সহ্য করে।...। অতএব, সন্তান পালনের নিমিত্ত বিদ্যা বুদ্ধি চাই, যেহেতু মাতাই আমাদের প্রথম, প্রধান ও প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী।

'স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল'-আর তাই স্বাস্থ্যসম্মত রন্ধনপ্রণালীর জন্য গৃহিণীর শিক্ষা অর্জন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বেগম রোকেয়া বলেন :

রন্ধনপ্রণালীর সঙ্গে সঙ্গেই গৃহিণীর ডাক্তারী ও (Chemistry) রসায়ন বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান আবশ্যক। কোন্ খাদ্যের কি গুণ, কোন্ বস্তু কত সময়ে পরিপাক হয়, কোন্ ব্যক্তির নিমিত্ত কিরূপ আহার্য প্রয়োজন, এসব বিষয়ে গৃহিণীর জ্ঞান চাই।

বেগম রোকেয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নারীদের জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এবং এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে তিনি একটি 'জেনানা মেডিকেল' কলেজেরও দাবি উপস্থাপন করেন।

বেগম রোকেয়া তাঁর সমসাময়িককালে নারীশিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে জনমত সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বলেন :

...দেখা যায় যে, রমণীর জন্য আজ পর্যন্ত যে সব কর্তব্য নির্ধারিত আছে, তাহা সাধন করিতেও বুদ্ধির প্রয়োজন। অর্থ উপার্জনের নিমিত্ত পুরুষদের যেমন মানসিক শিক্ষা (mental culture) আবশ্যক, গৃহস্থালীর জন্য গৃহিণীদেরও তদ্রূপ মানসিক শিক্ষা (mental culture) প্রয়োজনীয়।

মতিচূর, প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ প্রবন্ধ 'বোরকা'। প্রবন্ধটি ইতিপূর্বে নবনূর ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া পর্দা সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইহার মধ্যে একদিকে যেমন তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায় অন্যদিকে লক্ষণীয় সমকালীন বাঙালি মুসলিম সমাজে প্রচলিত কঠোর পর্দাপ্রথার সাথে তাঁর চিন্তাধারাকে মানিয়ে নেবার প্রবণতা। বেগম রোকেয়ার মতে, অবরোধের সাথে উন্নতির বেশি বিরোধ নেই। উন্নতির জন্য উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি এ প্রবন্ধে জোর দিয়ে বলেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি স্বতন্ত্র নারী-বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহিলা-পরীক্ষকদের কথা বলেছেন।

'বোরকা' প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া পর্দা অর্থে শালীনতা ও সুরুচি বুঝিয়েছেন। এবং নারীসমাজকে শালীনতা বজায় রেখে সমাজের সবকর্মে এগিয়ে যাবার দিকনির্দেশও দান করেছেন। পর্দা প্রসঙ্গে আপন মত ব্যক্ত করে বেগম রোকেয়া বলেন :

পর্দ্দা অর্থে ত আমরা বুঝি গোপন করা বা হওয়া, শরীর ঢাকা ইত্যাদি- কেবল অন্তঃপুরের চারি-প্রাচীরের ভিতর থাকা নহে। এবং ভালমতে শরীর আবৃত না করাকেই "বে-পর্দা" বলি। যাঁহারা ঘরের ভিতর চাকরদের সম্মুখে অর্ধ-নগ্ন অবস্থায় থাকেন, তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা ভালমতে পোশাক পরিয়া মাঠে বাজারে বাহির হন, তাঁহাদের পর্দা বেশি রক্ষা পায়।

এ প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়া ইউরোপীয় নারীকুলের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করে বলেন :

বর্তমান যুগে ইউরোপীয় ভগ্নীগণ সভ্যতার চরম সীমায় উঠিয়াছেন;

তাঁহাদের পর্দা নাই কে বলে? তাঁহাদের শয়নকক্ষে, এমনকি বসিবার ঘরেও কেহ বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেন না। এ প্রথা কি দোষণীয়? অবশ্য নহে।

তৎকালীন ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজে প্রচলিত অবরোধ প্রথার কঠোরতা বেগম রোকেয়াকে গভীরভাবে চিন্তাকুল করে তুলেছিল। তাই তিনি অতি ক্লেশের সাথে বলেন:

নিয়মেরই একটা সীমা আছে। এ দেশে আমাদের অবরোধ-প্রথাটা বেশি কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। যেমন অবিবাহিতা বালিকাগণ স্ত্রীলোকের সহিতও পর্দা করিতে বাধ্য থাকেন! কখন কোন প্রতিবেশিনী আসিয়া উপস্থিত হইবে, এই ভয়ে নবম বর্ষীয়া বালিকা প্রাঙ্গণে বাহির হয় না। এইভাবে সর্বদা গৃহকোণে বন্দিনী থাকায় তাহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের সুশিক্ষার ব্যাঘাত হয়। যেহেতু খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয়া আত্মীয়া ব্যতীত তাহারা অন্য কাহাকেও দেখিতে পায় না, তবে শিখিবে কাহার নিকট?

এই অন্যায় পর্দা প্রথার বাড়াবাড়ি বেগম রোকেয়ার কাছে গ্রহণীয় ছিল না। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন নারী সমাজের পশ্চাৎপদতার অন্যতম প্রধান কারণ পর্দাপ্রথার তীব্র কঠোরতা। তাই নারীকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেন :

...ঐ সকল কৃত্রিম পর্দা কম (moderate) করিতে হইবে। অনেক পরিবারে মহিলাগণ ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব ব্যতীত অপর কাহারও বাড়ি যাতায়াত করেন না।...ইহাতে পাঁচ রকমের স্ত্রীলোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইতে পারে না বলিয়া তাঁহারা একেবারে কূপমণ্ডুক হইয়া থাকেন। অন্তঃপুরিকাদের পরস্পর দেখাশুনা বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুরুষেরা যেমন সকল শ্রেণীর লোকের সহিত আলাপ করিয়া থাকেন, আমাদেরও তদ্রূপ করা উচিত।...। আমাদের ধর্ম ত ভঙ্গপ্রবণ নহে, তবে অন্য ধর্মাবলম্বিনী স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা হইলে ধর্ম নষ্ট হইবে, এরূপ আশঙ্কার কারণ কি?

আমরা অন্যায় পর্দা ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব। প্রয়োজন হইলে অবগুণ্ঠন (ওর্‌ফে বোরকা) সহ মাঠে বেড়াইতে আমাদের আপত্তি নাই।

বেগম রোকেয়ার দৃষ্টিতে নারী সমাজের পরাধীনতা, পরনির্ভরশীলতা ও হীনাবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ শিক্ষার অভাব। তিনি বলেন :

সম্প্রতি আমরা যে এমন নিস্তেজ, সঙ্কীর্ণমনা ও ভীরু হইয়া পড়িয়াছি, ইহা অবরোধে থাকার জন্য হয় নাই–শিক্ষার অভাবে হইয়াছে। সুশিক্ষার অভাবেই আমাদের হৃদয়বৃত্তিগুলি এমন সংকুচিত হইয়াছে।

শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত হইয়াছি। অযোগ্য হইয়াছি বলিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছি।

তাই বেগম রোকেয়া নারীশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে পুরুষ সমাজের নিকট আবেদন করে বলেন :

এখন ভ্রাতাদের সমীপে নিবেদন এই– তাঁহারা যে টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া কন্যাকে জড় স্বর্ণ মুক্তার অলঙ্কারে সজ্জিত করেন, ঐ টাকা দ্বারা তাহাদিগকে জ্ঞান-ভূষণে

অলঙ্কৃতা করিতে চেষ্টা করিবেন। একখানা জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠে যে অনির্বচনীয় সুখ লাভ হয়, দশখানা অলঙ্কার পরিলে তাহার শতাংশের একাংশ সুখও পাওয়া যায় না।

বেগম রোকেয়া আরও প্রস্তাব করেন যে :

...অলংকারের টাকা দ্বারা "জেনানা স্কুলের" আয়োজন করা হউক।

বেগম রোকেয়ার লেখনী ছিল পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এক জোরালো অস্ত্রস্বরূপ। মতিচূর, প্রথম খণ্ডের শেষ প্রবন্ধ 'গৃহ'। উক্ত প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া পুরুষ প্রধান সমাজে ব্যথা ও বেদনায় জর্জরিত নারীর গ্লানিময় ও অসহায় অবস্থার প্রতিচ্ছবি সমাজের নিকট তুলে ধরেন। উক্ত প্রবন্ধে টুকরো টুকরো কতগুলি বাস্তব ঘটনা আলোচনার মধ্য দিয়ে নারীর সামাজিক অবস্থানের চিত্রও তিনি আপন অনুভূতি দিয়ে অঙ্কিত করেছেন :

আমাদের সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখি, অধিকাংশ ভারত নারী গৃহসুখে বঞ্চিতা। যাহারা অপরের অধীনে থাকে, অভিভাবকের বাড়িকে আপন ভবন মনে করিতে যাহাদের অধিকার নাই, গৃহ তাহাদের নিকট কারাগার তুল্য বোধ হয়। পারিবারিক জীবন যে সুখী নহে, যে নিজেকে পরিবারের একজন গণ্য (member) বলিয়া মনে করিতে সাহসী নহে , তাহার নিকট গৃহ শান্তি-নিকেতন বোধ হইতে পারে না। কুমারী, সধবা, বিধবা–সকল শ্রেণীর অবলার অবস্থাই শোচনীয়।

বেগম রোকেয়া আরো বলেন :

সাধারণতঃ পরিবারের প্রধান পুরুষটি মনে করেন গৃহখানা কেবল "আমার বাটী"–পরিবারস্থ অন্যান্য লোকেরা তাঁহার আশ্রিতা।

এই প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া আরও দেখিয়েছেন বাড়ির সর্বময় কর্তা একজন পুরুষের আদেশ নির্দেশ ইত্যাদি ন্যায়সঙ্গত হউক বা না হউক তা নারীকে মেনে নিতে হয়। এছাড়া অধিকার বঞ্চিতা নারী নিজগৃহেও আশ্রিতা হিসেবে গণ্য। তাই পরম ক্ষোভের সাথে বেগম রোকেয়া বলেছেন :

অসহায়া অন্তঃপুরিকাদের ঈশ্বর ব্যতীত আর কে সাহায্য করিবে?

মুসলিম উত্তরাধিকার আইনকে কার্যত ফাঁকি দিয়ে পুরুষ সমাজ নারীকে তার ন্যায্য প্রাপ্য পিতৃ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করছে–এ সত্য কথাটিও বেগম রোকেয়া লেখনীর সাহায্যে সমাজের নিকট তুলে ধরতে দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি বলেন:

"মহম্মদীয় আইন" অনুসারে আমরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হই–"আমাদের বাড়ি"ও হয়। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়,–বাড়ির প্রকৃত কর্তা স্বামী, পুত্র, জামাতা, দেবর ইত্যাদি হ'ন।

হায় পিতা মোহাম্মদ (দ)! তুমি আমাদের উপকারের নিমিত্ত পিতৃসম্পত্তিতে অধিকারিণী করিয়াছ, কিন্তু তোমার সুচতুর শিষ্যগণ নানা উপায়ে কুলবালাদের সর্বনাশ করিতেছে!! আহা! "মহম্মদীয় আইন" পুস্তকের মসি-রেখারূপে পুস্তকেই আবদ্ধ থাকে। টাকা যার, ক্ষমতা যার আইন তাহারই আইন আমাদের ন্যায় নিরক্ষর অবলাদের নহে!

পুরুষ শাসিত সমাজে অধিকারবিহীন হীনাবস্থার বিরুদ্ধে ও নারীর ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে বেগম রোকেয়া তাঁর লেখনী পরিচালনা করেছিলেন। অধিকার বঞ্চিত

নারীসমাজের মুক্তিই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল–পুরুষের নিন্দা বা বিরুদ্ধাচরণ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তাই 'গৃহ' প্রবন্ধে তিনি পুরুষ সমাজকে আশ্বাসের অভয়বাণী দিয়ে বলেছেন :

আমার এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ভ্রাতা ভগ্নীগণ হয়ত মনে করিবেন যে আমি কেবল ভ্রাতৃবৃন্দকে নরাকারে পিশাচরূপে অঙ্কিত করিবার জন্যই কলম ধরিয়াছি। তাহা নয়। আমি ত কোথাও ভ্রাতাদের প্রতি কটু শব্দ ব্যবহার করি নাই–কাহাকেও পাপিষ্ঠ, পিশাচ, নিষ্ঠুর বলিয়াছি কি? কেবল রমণীহৃদয়ের ক্ষত দেখাইয়াছি। ঐ যে কথায় বলে, "বলিতে আপন দুঃখ পরনিন্দা হয়", এক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে–ভগ্নীর দুঃখ বর্ণনা করিতে ভ্রাতৃনিন্দা হইয়া পড়িয়াছে।

জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে নারীকে থাকতে হচ্ছে পুরুষ অভিভাবকত্বের আশ্রিতারূপে। এ প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়া অতি দুঃখ করে বলেন :

আমরা যে কোন অবস্থায় থাকি না কেন, অভিভাবকের বাটীতে থাকি।... ।

যখন আমরা রাজকন্যা, রাজবধূরূপে প্রাসাদে থাকি, তখনও প্রভু-গৃহে থাকি।

অথবা গৃহস্থের বৌ-ঝি রূপে প্রকাণ্ড আটচালায় বাস করিলেও প্রভুর আলয়ে থাকি,...!!! (জানি না কবরের ভিতরেও অভিভাবকের বাটীতে থাকা হয় কি না!!

গৃহসুখে বঞ্চিতা নারীর দুঃখ-দুর্দশার কথা বর্ণনা করে বেগম রোকেয়া পরিশেষে অতি ক্ষোভে বলেছেন :

...গৃহ বলিতে আমাদের একটিও পর্ণকুটীর নাই। প্রাণ-জগতে কোন জন্তুই আমাদের মত নিরাশ্রয়া নহে। সকলেরই গৃহ আছে–নাই কেবল আমাদের।

মতিচূর, প্রথম খণ্ডে বেগম রোকেয়া তৎকালীন বাঙ্গালি মুসলিম নারীর সামাজিক অবস্থান তুলে ধরেন এবং নারীর ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে নিজ বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। ইতোপূর্বে মতিচূর, প্রথম খণ্ডের প্রবন্ধগুলি যখন সমকালীন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তখন বাঙালি মুসলিম সমাজ আবেগের বশে উত্তেজিত হয়ে উঠেন; কিন্তু পরবর্তীতে এই উত্তেজনা, আলোড়ন ও ক্রোধ কিছুটা প্রশমিত হতে দেখা যায়। এবং তার পরিবর্তে দুইটি পরস্পর-বিরোধী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ১৩১২ বঙ্গাব্দে নবনূর ভাদ্র সংখ্যায় গ্রন্থ সমালোচনায় বলা হয় যে :

মতিচূরের প্রবন্ধগুলি যখন প্রথম নবনূরে প্রকাশিত হয়, তখন তাহা পাঠে আমাদের সহিষ্ণুতার বাঁধ টুটিয়া গিয়াছিল। সে অবস্থায় তাহাতে যে কিছু ভাল আছে আমরা এমন একটি কল্পনাই মনে স্থান দিতে পারি নাই। এই উত্তেজনার ভাব কথঞ্চিত প্রশমিত হইলে পর গ্রন্থখানি পুনরায় পাঠ করি এবং সেই সময় মতিচূর সম্বন্ধে হৃদয়ে একটু অনুকূল ধারণা জন্মে। তৎপর সংযতভাবে আর একবার বিষয়গুলির আলোচনা করিতে যাইয়া দেখি, লেখিকার সকল কথা না হইলেও অনেক কথাই নিরেট সত্য– লেখিকা তাঁহার বক্তব্য ভাল করিয়াই বলিতে পারিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে কোন মুসলমান লেখকও এতগুলি সামাজিক বিষয়ের আলোচনা করেন নাই।... ।

মতিচূর রচয়িত্রীর একটি দোষের কথা এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার গ্রন্থ মাদ্রাজের Christian Tract Society-র প্রকাশিত Indian Reform সম্বন্ধে

পুস্তিকাসমূহ দ্বারা অনুপ্রাণিত বলিয়াই আমাদের ধারণা। খ্রিস্টধর্ম প্রচার করিতে আসিয়া আমাদের সম্বন্ধে পাদরী সাহেবগণ যাহা বলেন বা বলিয়াছেন, লেখিকার নিকট তাহা অভ্রান্ত সত্যরূপেই পরিগণিত হইয়াছে। তাঁহার মতে, আমাদের সবই কু, আর ইউরোপ-আমেরিকার সবই সু।...।

সমাজ সংস্কার করা এক কথা, আর সমাজকে বেদম চাবুক মারা আর এক কথা। চাবুকের চোটে সমাজ-দেহে ক্ষত হইতে পারে, কিন্তু তদ্বারা সমাজের কোনো ক্ষতি বা অভাব পূরণ হয় না। মতিচূর, রচয়িত্রী কেবল ক্রমাগত সমাজকে চাবকাইতেছেন, ইহাতে যে কোন সুফল ফলিবে আমরা এমত আশা করিতে পারি না। তিনি যদি সংযতভাবে বিদ্বেষহীন ভাষায় নারী জাতির দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিতে পারেন তাহা হইলে সমাজে রক্ষণশীলত্বের বন্ধন আপনা-আপনি শিথিল হইয়া আসিবে, নতুবা যদৃচ্ছা right and left চাবকাইয়া তিনি কিছুই করিতে পারিবেন না। ইহা নিঃসংশয়ে ও নিরুদ্দেগে বলা যায়।

মতিচূর, প্রথম খণ্ডে মাদ্রাজের Christian Tract Society-র প্রকাশিত Indian Reform-সম্বন্ধীয় পুস্তিকাসমূহ হতে নারী স্বাধীনতার ধ্যানধারণা বেগম রোকেয়া গ্রহণ করেছেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ নবনূর-এর গ্রন্থসমালোচনায় উল্লেখ করা হয় তার প্রতিউত্তরে বেগম রোকেয়া বলেন :

আমি আজি পর্যন্ত উক্ত পুস্তিকার একখানিও পাঠ করি নাই। খ্রীষ্টানদের নিকট কিছু শিখিতে যাইব কেন? ঈশ্বর কি আমাকে বুদ্ধি দেন নাই? আর আমি ত এই কারশিয়ঙ্গশেলে আছি, এই সময় তুমি আমার বাড়ী অনুসন্দান কর গিয়া, যদি আমার বাড়ীতে "Christian Tract Society-র প্রকাশিত পুস্তিকা" একখানিও দেখিতে পাও, তবে আমি তোমাকে হাজার (১০০০) টাকা দিব।

কোহিনূরে ১৩১৩ বঙ্গাব্দে মতিচূর, প্রথম খণ্ড সম্পর্কে যে সমালোচনা করা হয় তা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। কোহিনূরে মতিচূর-এর সমালোচনা করতে গিয়ে শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার বলেন :

...। 'মতীচূর' শুধু হিন্দু মোসলেম সমাজকে নহে, সর্বশ্রেণীর পাঠকে– ভারতবঙ্গে আলোড়িত করিয়াছে। মুসলমান মহিলা লিখিত সর্বপ্রথম বাঙ্গালা গ্রন্থের এ ক্ষমতা কতদূর বিস্ময়কর, তাহা ভাষায় বুঝান সুকঠিন।

...গ্রন্থকত্রী বর্তমান মৃত সমাজ সম্বন্ধেই অনেকগুলি কথা কহিয়াছেন।...এ গ্রন্থে তাঁহার যে ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহার কথা সাধারণ বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি না। সত্য, তিনি 'স্বকীয় মত মাত্র' ব্যক্ত করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ন্যায় লেখিকার মতের মূল্য নিতান্ত সামান্য নহে। বিশেষতঃ তাঁহার এই "স্বকীয় মতে" সমাজে যে আন্দোলনের সম্ভাবনা, তাহা কখনই উপেক্ষনীয় নহে।...।

বর্তমান সমাজের ক্ষত সম্বন্ধে তিনি অনেক চিত্র দেখাইয়াছেন। চিত্রের দৃশ্য বস্তুতঃই ভীষণ মর্মপীড়ক। এ সকলের সংস্কার যে অত্যাবশ্যক তাহা কে অস্বীকার করিবেন? শুধু এ সমাজের নহে, সমগ্র সমাজেরই সংস্কার আবশ্যক।...। সংস্কার আবশ্যক; কিন্তু সংস্কার এক কথা আর সমাজের প্রাকৃতিক বিধি আর এক বিষয়।

উপযুক্ত সংস্কার কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না,–কিন্তু মূল সমাজবিধির পরিবর্তন কি সম্ভবপর, না স্বভাব-সম্মত? যাহা একান্ত কৃত্রিম, তাহার পরিবর্তন চলে; পরন্তু প্রকৃতির সহিত যাহার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, তাহার পরিবর্তন অস্বাভাবিক এবং অমঙ্গলকর হয়।

আবার বাসনা পত্রিকায় মতিচূর-এর ভূয়সী প্রশংসা করে বলা হয়েছে :

মতীচূর প্রকৃতই মতীচূর। গুটিকতক সমাজ সংস্কার সম্বন্ধনীয় প্রয়োজনীয় প্রবন্ধগুচ্ছে এক মধুর মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা হইয়াছে। নিবন্ধগুলি চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। গ্রন্থকর্ত্রী ভারতের...অন্তঃপুরাবদ্ধ চিরবন্দিনী মহিলাকুলের উন্নতি, শিক্ষা ও স্বাধীনতার ভিখারিণী।

বেগম রোকেয়া প্রণীত মতিচূর সম্বন্ধে আবুল হুসেনের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ:

আমাদের দুর্গতির আরম্ভ যে কোথায়, তাহাই লেখিকা তাঁহার প্রাঞ্জল, সুরুচি-সম্ভাবনাপূর্ণ, দৃষ্টান্তবহুল সরল অকপট মাধুর্যময় রচনা দ্বারা দেখাইতে যাইয়া স্বকীয় বেদনার অনুভূতিকে প্রতি ছত্রে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। লেখিকা বঙ্গীয় মোসলেম নারী সমাজের আদর্শ। তাঁহার অবরুদ্ধা অবলা ভগিনীগণের দুরবস্থা দেখিয়া তাহাদিগকে জ্ঞান, শিক্ষা, নীতি, কর্ম ও স্বাধীনতায় প্রলুব্ধ করিবার জন্য তিনি এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। পুরুষের নিদারুণ স্বার্থপরতা, শাসন-নীতি ও কঠোর পশুশক্তির ফলে নারীকে যে কিরূপ জঘন্য জীবন যাপন করিতে হইতেছে, আর তাহাতে যে সমাজ দেশের কত অকল্যাণ ও অনর্থ ঘটিতেছে, তাহাই প্রতি সংযত ভাষা ও কোমল শ্রদ্ধার সহিত লেখিকা দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। পুরুষ প্রকৃত সৌভাগ্য-সম্পদ ও সুখ চাহিলে, তাহার মন-মস্তিষ্ক ও জ্ঞানকে মঙ্গলের পথে চালিত করিতে হইলে, নারীকেও সমভাবে জ্ঞান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অর্জন করিতে হইবে। লেখিকা নারী-সুলভ সঙ্কোচের সহিত পুরুষের দোষ দেখাইয়াছেন।

...পুস্তকখানি নারীকে তাহার ক্ষতস্থান চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাইয়া দিবে, তাহার আত্মশক্তিকে জাগ্রত করিবে, শৃঙ্খলা ও জ্ঞানের মর্যাদা বুঝাইয়া দিবে, স্বামীকে প্রভু বলিতে ভুলাইবে, স্বাধীনতা দ্বারা দাম্পত্য জীবনের মাধুরী ও আনন্দ যে কতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা অজ্ঞ নারীকে বুঝাইয়া দিবে,....। মিসেস্ হোসেন 'সুগৃহিণী', 'গৃহ', 'অর্ধাঙ্গী' ও 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে নারীর সুজ্ঞান কিরূপে জন্মিতে পারে, তাহা দেখাইতে গিয়া চমৎকার সফলতা লাভ করিয়াছেন।

মতিচূর, দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'সৌরজগত', অবরোধ প্রথা ও স্ত্রীশিক্ষা বিরোধী মনোভাবের কঠোর সমালোচনাই বেগম রোকেয়া রচিত উক্ত গল্পের মূল বক্তব্য। গওহর, তার স্ত্রী নূরজাঁহা (নূরী) ও গওহরের শ্যালক জাফর এ তিনজন উক্ত গল্পের মুখ্য চরিত্র। উক্ত গল্পে বেগম রোকেয়া নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও গোঁড়ামির প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেন জাফরের বক্তব্যের মাধ্যমে। সেই সাথে বেগম রোকেয়া নারী-প্রগতির সপক্ষে আপন মত ব্যক্ত করেছেন গওহর ও নূরজাহানের কথোপকথনের মধ্যদিয়ে।

স্ত্রীশিক্ষার পরিপন্থীরূপে জাফরের বক্তব্য ছিল এরূপ :

পিপীলিকার পক্ষ হইলে শূন্যে উড়ে। স্ত্রীলোকে শিক্ষা পাইলে পুরুষদের কথার প্রতিবাদ করে,–সমালোচনা করে।

অথচ এ প্রসঙ্গে গওহরের বক্তব্য ছিল ভিন্নতর। তিনি বলেন :

স্ত্রীলোকেরা আমাদের অনুপযুক্ত কথার প্রতিবাদ করেন, আমাদের গল্পে অংশগ্রহণ করেন, ইহা ত অতি সুখের বিষয়।

শিক্ষার বিরুদ্ধে বিশেষত নারীশিক্ষার প্রতি তৎকালে সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারসমূহ জাফরে মনে বদ্ধভাবে শিকড় বেঁধে ছিল। তাঁর মতে:

জ্ঞান বুদ্ধি হইলে লোক নাস্তিক হয়, এইজন্য কুললনা-বৃন্দকে জ্ঞান হইতে দূরে রাখা আবশ্যক।

অন্যদিকে যুগের চেয়ে অনেক অগ্রগামী ছিল গওহরের চিন্তাধারা। তিনি বলেন :

যত অভিশাপ কুলবালার উপর! ইহা তোমার বিষম ভ্রম, জ্ঞানের সহিত ধর্মের বিরোধ নাই। বরং জ্ঞান ধর্মের এক প্রকার অঙ্গ।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়েও স্কুলে গিয়ে মুসলিম বালিকাদের শিক্ষালাভের ব্যাপারে অহেতুক এক আতঙ্ক বিরাজমান ছিল–তা জাফরের বক্তব্যের মাধ্যমে পেশ করে বেগম রোকেয়া তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করেন:

স্কুল শব্দ শুনিবামাত্র জাফর বিস্ময়ে চমকাইয়া উঠিলেন, "কি বলিলে? স্কুলে মেয়ে ভর্তি করবে? এখনও ভারত হইতে মুসলমানের নাম বিলুপ্ত হয় নাই–এখনও মুসলমান সমাজ ধ্বংস হয় নাই। এখনই মেয়েরা স্কুলে পড়িবে? প্রথম অভিশাপ আমারই ভাগিনেয়ীদের উপর? প্রথম অধঃপতন আমাদেরই?"

উত্তরে গওহরের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ :

তুমি ভালরূপে কথাটা না শুনিয়াই বিলাপ আরম্ভ করিলে? ডাউহিল স্কুলে কেবল বালিকারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। সেখানে সাতজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত আছেন। তথায় পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। তাদৃশ বিদ্যালয়ে কন্যা পাঠাইলে দোষ কি?

উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে নারীর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটতে পারে না এবং নারী তার আত্মবিশ্বাসে অটল থাকতে পারে না। শিক্ষার অভাবে নিজ ধর্মের মূল তত্ত্বই থাকে নারীর কাছে অজ্ঞাত। কাজেই পথভ্রষ্ট হবার আশংকা থাকে পুরোমাত্রায়। এ প্রসঙ্গে গওহরের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ :

যেহেতু তিনি আপন ধর্মের কোন তত্ত্বই অবগত নহেন। কেবল টিয়া পাখীর মত নামাজ পড়েন, কোন শব্দের অর্থ বুঝেন না। তাঁহাকে যদি তুমি স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ না রাখ তবে একবার কোন মিশনারী মেমের সহিত দেখা হইলেই তিনিমনে কিরবেন, "বাঃ! যিশুর কি মহিমা!" সুতরাং সাবধান, যদি পার ত লৌহসিন্দুকে বন্ধ রাখিও।

স্ত্রীজাতিকে মূর্খ ও অজ্ঞ রেখে কর্তৃত্ব করা পুরুষজাতি বিরাট অহংকারের কাজ বলে মনে করে–তা জাফরের উক্তিতে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। জাফর অতি গর্বের সাথে নিজ পতিভক্ত স্ত্রী সম্পর্কে বলেন :

...তিনি (জাঃ স্ত্রী) আমার মতের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেন না। আমি যদি দিনকে রাত্রি বলি, তিনি বলেন,–"হ্যাঁ, দিব্য জ্যোৎস্না!" আবার যদি আমি অমাবশ্যা রাত্রিকে দিন বলি, তিনিও বলিবেন,–"হ্যাঁ, রৌদ্র বড় প্রখর"।

বেগম রোকেয়া স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে গওহরের উক্তির মাধ্যমে নিজ অভিমত পেশ করেন:

যাহা আমাদের জন্য আবশ্যক, তাহা আমাদের মহিলাদের জন্যও প্রয়োজন।...। স্কুল কলেজের শিক্ষা যেমন আমাদের আবশ্যক, তদ্রূপ তাহাদেরও প্রয়োজন।

স্রষ্টার সৃষ্ট এ বিশ্বের সবকিছুর উপর নারী ও পুরুষের সম-অধিকার আছে। কিন্তু কার্যত সমাজে নারীকে তার ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। তাই অতি ক্ষোভের সাথে গওহর বলেন :

আমরা যে সামাজিক নিয়মের বশবর্তী হইয়া স্ত্রীলোকদের এমন উপাসনা–অর্থাৎ স্রষ্টার সৃষ্টি-বৈচিত্র্য দর্শন হইতে বঞ্চিত রাখি, ইহার জন্য ঈশ্বরের নিকট কি উত্তর দিব? যে চক্ষুর কার্য্য দর্শন করা, তাহাকে চিরঅন্ধ করিয়া রাখি–ধিক্ আমাদের সভ্যতার!

...প্রত্যেক গ্রহই নিয়মিত সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা যেমন গ্রহগণের কর্তব্য, তদ্রূপ তাহাদিগকে আলোক প্রদান ও তাহাদের প্রত্যেকটিকে যথাবিধি আকর্ষণ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘোরা সূর্যের কর্তব্য। এই সৃষ্টিজগতের প্রত্যেকে আপন আপন কর্তব্য পালন করিতেছে। কাহারও কর্তব্য সাধনে ত্রুটি হইলে সমষ্টির বিশৃঙ্খলা ঘটে।

মিস মেরী করেলী রচিত Murder of Delicia উপন্যাসের অংশ বিশেষ বঙ্গানুবাদ করেন বেগম রোকেয়া 'ডেলিশিয়া-হত্যা' শিরোনামে। ইহা মতিচূর, দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ রচনা। Murder of Delicia-তে মিস করেলী ডেলিশিয়ার মর্মবেদনা অতি নিপুণতার সাথে অংকন করেছেন। বেগম রোকেয়া ডেলিশিয়ার ন্যায় ভারতবর্ষের প্রপীড়িত নারীদের একটি নমুনা চরিত্র হিসাবে 'মজলুমা'র উল্লেখ করেছেন। নারীজাতি পৃথিবীর সর্বত্রই নিপীড়িত–এমনকি সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে উন্নত দেশ ইংল্যান্ডে নারী প্রপীড়িত। তাই বেগম রোকেয়া ব্যথিত হৃদয়ে বলেন :

ইংরেজ রমণীর জীবন কিরূপ? আমরা মনে করি, তাহারা স্বাধীন, বিদূষী, পুরুষের সমকক্ষা, সমাজে আদৃতা,–তাঁহাদের আরও কত সুখ সৌভাগ্যের চাকচিক্যময় মূর্তি মানস-নয়নে দেখি। কিন্তু একবার তাহাদের গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মারিয়া দেখিতে পাইলে বুঝি সব ধোঁকা। দূরের ঢোল শুনিতে শ্রুতিমধুর। সভ্যতা ও স্বাধীনতার লালনভূমি লন্ডন নগরীতে শত শত "ডেলিশিয়া বধকাব্য" নিত্য অভিনীত হয়! হায়! রমণী পৃথিবীর সর্বত্রই অবলা!"

তবে ডেলিশিয়া অপেক্ষা মজলুমার উপর বর্ষিত নির্যাতনের মাত্রা অধিকতর-এর কারণ শিক্ষার অভাব। ডেলিশিয়া স্বাধীন ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারী, যেহেতু তিনি শিক্ষিতা। কিন্তু মজলুমা পরাধীন ও কঠোর অবরোধে বন্দিনী, এমন কি তার আত্মা পর্যন্ত মানসিক দাসত্বে অভ্যস্ত। বেগম রোকেয়া বিদূষী ও নিরক্ষর নারীর পার্থক্য করেছেন এভাবে–

ডেলিশিয়া স্বাধীনা, রাজার জাতি এবং অন্তঃপুর-বন্দিনী নহেন; আর মজলুমা পরাধীনা, প্রজার জাতি এবং কঠোর অপরাধে বন্দিনী, কিন্তু উভয়ের অবস্থাগত পার্থক্য কতটুকু? অধিক নয়,–উভয়ে অবলা! উভয়ই সমাজের অত্যাচারে মর্মপীড়িতা! কিন্তু ডেলিশিয়া বিদুষী এবং মজলুমা নিরক্ষর–এই একটা ভারি পার্থক্য আছে।...।

ডেলিশিয়ার আত্মমর্যাদা জ্ঞান আছে, মজলুমার তাহা নাই। নির্যাতিত প্রপীড়িত হইলেও ডেলিশিয়ায় কেমন একপ্রকার মহীয়ান গরীয়ান ভাব আছে অত্যাচারী কর্তৃক তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইতেছে কিন্তু অবনত হইতেছে না। তিনি গর্বোন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া মরিবেন, কিন্তু নতশিরে যুক্ত করে প্রাণ ভিক্ষা চাহিবেন না। এই মহান ভাবটা যেন মজলুমার নাই। ইহার কারণ এ দেশের স্ত্রীশিক্ষার অভাব। মজলুমা ভূমিষ্ঠা হইয়াই শুনিতে পায়, "তুই জন্মেছিস গোলাম; চিরকাল থাকবি গোলাম।" সুতরাং তাহার আত্মা পর্যন্ত গোলাম হইয়া গিয়াছে। সে আর নিজের মূল্য জানে না–পুরুষ আত্মীয়দের কর্তৃক বারম্বার পদদলিত হইলেও সে তাহাদের পদ-লেহনে বিরত হয় না। স্বাধীনা ডেলিশিয়ায় ও পরাধীনা মজলুমায় এই প্রভেদ।

নিজ অধিকার ও অসহায় পরিণতি সম্বন্ধে অশিক্ষিতা ভারতীয় উপমহাদেশের নারীগণ এতই উদাসীন যে, সে তার জন্মগত অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। তাই বেগম রোকেয়া পরম ক্ষোভের সাথে বলেন :

কবে মজলুমা ডেলিশিয়ার মত বীরনারী হইতে পারিবেন?

মতিচূর, দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট পঞ্চম রচনা 'জ্ঞানফল' একটি রূপক কাহিনী। বেগম রেকেয়ার চিন্তা ও অনুভূতি জগতে বিরাট স্থান জুড়ে ছিল নারীসমাজ। কিন্তু তাই বলে স্বদেশের স্বাধীনতা প্রশ্নে তিনি নীরব ছিলেন না। ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে ধীরে ধীরে সমৃদ্ধশালী ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্য গ্রাস করে ভারতবর্ষে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছে তা 'জ্ঞানফল' শীর্ষক রূপকথার মধ্যদিয়ে বেগম রোকেয়া পাঠক-সম্মুখে উপস্থাপিত করেন অতি নিপুণতার সাথে। ইংল্যান্ডের চাকচিক্যে মোহিত হয়ে ভারতবাসী নিজেদেরকে পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ রেখে নিজেদের জীবনে দুঃখ দুর্দশা ডেকে আনছে–এ সব সম্বন্ধে জনগণকে সজাগ করে তোলার উদ্দেশ্যেই তিনি উক্ত রূপকথা রচনা করেন। উক্ত কাহিনীতে বেগম রোকেয়া 'কনক দ্বীপ'–ভারতবর্ষ, 'পরীস্থান'–ইংল্যান্ড, ও 'জিন বণিক'–ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। বেগম রোকেয়া বলেন:

...জিনগণ মনস্থ করিল, তাহারা নানা দেশে গিয়া বাণিজ্য ব্যবসা করিবে। অতঃপর তাহারা মাকাল ফলে জাহাজ বোঝাই করিয়া বাণিজ্য-ব্যপদেশে যাত্রা করিল। জিনদের জাহাজখানি নানাস্থান ঘুরিয়া বিরাট সাগরের উপকূলে কনক দ্বীপের এক বন্দরে উপনীত হইল!

উক্ত কাহিনীতে বেগম রোকেয়া আরো বলেন, কনক দ্বীপের সমৃদ্ধশালী গ্রাম ও নগর দেখে পরীস্থানের জিন-বণিকদের চক্ষুস্থির হলো। কনক দ্বীপের ভূমি রত্নগর্ভা। ফল ও ফসলে সমৃদ্ধ এই দেশ। সর্বোপরি পরীস্থানের ন্যায় এই দেশে কোনো খাদ্যাভাব নেই। জিন বণিকদের কৌশলে কনকদ্বীপ থেকে সে দেশের সম্পদ আম ও ধান প্রচুর পরিমাণে পরীস্থানে রপ্তানি হতে লাগল, পরিণতিতে কনক দ্বীপে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী এসে বাসা বাঁধল।

সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হবার পর পরাধীনতার নাগপাশথেকে মুক্ত হবার চেতনা ভারতবাসীর মধ্যে পরিলক্ষিত হলেও নারীর প্রতি পুরুষের অবিচার, উদাসীনতা এবং

সর্বোপরি বৈষম্যমূলক আচরণ ভারতবাসীর স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশ ও জাতির সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে পুরুষের ন্যায় সমাজে নারীরও কিছু ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু নারীকে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন থেকে বঞ্চিত রেখে পুরুষসমাজ স্বদেশের স্বাধীনতার গতিকে করছে মন্থর। তাই 'জ্ঞানফল' শীর্ষক রূপকথায় বেগম রোকেয়া বলেন :

দুইশত বৎসর হইল এই দেশের অদূরদর্শী স্বার্থপর পণ্ডিত–মূর্খেরা ললনাদিগকে জ্ঞানফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করে; কালক্রমে ঐ নিষেধ সামাজিক বিধানরূপে পরিগণিত হইল এবং পুরুষেরা এ ফল নিজেদের জন্য একচেটিয়া করিয়া লইল। রমণীবৃন্দ এ ফলের চয়ন ও ভক্ষণে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় এ গাছের সেবা শুশ্রূষায় বিমুখ হইল। ফলে নারীর কোমল হস্তের সেবা-যত্নে বঞ্চিত হওয়ায় জ্ঞানবৃক্ষ মরিয়া গিয়াছে!

একটি স্বাধীন সুখী দেশের কামনায় বেগম রোকেয়া আশা করেন পুরুষ সমাজের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় :

'আইস ভগিনি! তোমরাও যোগদান কর, আমরা কোদালি দ্বারা ভূমি প্রস্তুত করি, তোমরা স্বহস্তে বীজ বপন কর। আজি কি শুভদিন, এখন হইতে আমাদের নিজের গাছ হইবে।'

নারী ও পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টায় গড়ে উঠবে স্বাধীন ভারতবর্ষ–একটি শান্তিময় দেশ। এ প্রসঙ্গে 'জ্ঞানফল' রূপকথার উপসংহারে বেগম রোকেয়া বলেন :

অতঃপর কনকদ্বীপ পুনরায় দ্বিগুণ ত্রিগুণ ধনধান্যে পূর্ণ হইল; অধিবাসীগণ পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। তাহারা আর কোন প্রকার ইন্দ্রজালে ভুলিবার পাত্র নহে। কারণ এখন ললনাগণ জ্ঞান কাননের অধিষ্ঠাত্রী হইয়াছেন।

তিনি তাঁর স্বদেশ-এর প্রতীকরূপে ব্যবহৃত কনকদ্বীপ সম্বন্ধে গর্ব করে আরো বলেন।

'কনকের রূপকথা' অমৃত সমান,
মৃত ব্যক্তি যদি শুনে পায় প্রাণদান!

ইংরেজ শাসনামলে ইংরেজদের পরাধীনতা থেকে মুক্তির চেতনা সঞ্চালনের উদ্দেশ্যে রচিত 'জ্ঞানফল' নিঃসন্দেহে তার নির্ভীকতার পরিচয় বহন করে।

মতিচূর, দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টম রচনা 'শিশু-পালন'। সর্বসাধারণের বোধগম্য হবার জন্য প্রবন্ধটি অতি সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ৬ এপ্রিল কলিকাতা টাউন হলে স্বাস্থ্য ও শিশু প্রদর্শনীতে বেগম রোকেয়া উক্ত প্রবন্ধ পাঠন করেন।

শিশু দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক। কিন্তু তৎকালে বংশরক্ষার জন্য দুইটি বিষয় দরকারী হয়ে পড়েছে দেখছি। প্রথম স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার, দ্বিতীয় বাল্যবিবাহ রহিত করা। অর্থাৎ মেয়েদের বেশ করে পড়া লেখা শিখতে হবে, যাতে তারা নিজের শরীরের যত্ন করতে শিখে, আর অল্প বয়সের ছেলেমেয়ের বিয়ে বন্ধ হবে।...শিশু রক্ষা করতে হলে আগে শিশুর মা'দের রক্ষা করা দরকার।... মেয়েদেরও খাওয়া দাওয়ার একটু যত্ন করবেন। মেয়ের বিয়েতে অনেক টাকা খরচ হয় বলে বেচারীদের শুকিয়ে মারবেন না। তারাই হচ্ছে ভবিষ্যৎ গৃহের গৃহিণী, তারাই হচ্ছে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জননী।

মতিচূর, দ্বিতীয় খণ্ডের নবম রচনা 'মুক্তিফল'। পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিকায় উক্ত রূপক কাহিনী রচিত। এই রচনায় বেগম রোকেয়া 'মুক্তিফল'–স্বাধীনতা, 'কাঙ্গালিনী'–দেশজননী, 'কাঙ্গালিনীর রোগ'–পরাধীনতা এবং 'কাঙ্গালিনীর আরোগ্যলাভ'–স্বাধীনতালাভ ইত্যাদি প্রতীকরূপে ব্যবহার করেছেন।

মতিচূর, দ্বিতীয় খণ্ডের বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত আছে যে, 'মুক্তিফল' বিগত ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের কংগ্রেস ভঙ্গের পর রচিত হয়েছিল। বেগম রোকেয়া তৎকালীন রাজনৈতিক দল নরমপন্থীদের চিত্র তুলে ধরেন 'প্রবীণ' ও 'দর্পানন্দ'–দুটি চরিত্রের মধ্যদিয়ে। অন্যদিকে 'নবীন' ও 'ধীমান' চরিত্র দুটিকে তিনি চরমপন্থীদের প্রতীকরূপে ব্যবহার করেছেন। 'মুক্তিফল-এর' রচনায় বর্ণিত কাহিনী আলোচনা করলে দেখা যায়, বৃদ্ধা মাতা কাঙ্গালিনী বহুদিন হতে পীড়িত ও শয্যাগতা। বৃদ্ধা মাতাকে বাঁচানোর জন্য মুক্তিফল প্রয়োজন–কিন্তু সে ফল মায়াপুরের রাজার হাতে। কাঙ্গালিনীর পুত্র প্রবীণ আবেদন নিবেদনে পরম বিশ্বাসী। তাই সে প্রতিদিন মায়াপুরের নৃপতিকে মুক্তিফল লাভের জন্য আবেদন লিখে :

প্রবীণ কৈলাস ভূধরের পাদমূলে বসিয়া প্রতিদিন মায়াপুরের রাজাকে সম্বোধন করিয়া আবেদনের পাণ্ডুলিপি লিখেন। আবেদন লিখিতে ইতোমধ্যে ঝাড়া সাত মণ মসী ব্যয় হইয়াছে; লেখনীর জন্য দেশের সমুদয় খাক্‌ড়া বনের খাক্‌ড়া প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে; কাজগে আর কুলায় না, এখন মানকচুর পাতায় আবেদন লিখা হয়। এদিকে আবার মানকচু পত্রের বিনাশ দেখিয়া মানকচুর দুর্ভিক্ষ হওয়ার আশঙ্কায় বরাহকুল অন্নদাতা দেবতার নিকট অভিযোগলিপি প্রেরণ করিয়াছে।

না মহাশয় আমি কি পাগল! যাহাতে পুণ্যপাদ মায়াপুররাজ অসন্তুষ্ট হইতে পারেন অমন কাজ আমার দ্বারা হওয়া অসম্ভব,...।

ধীমান ও নবীন সকল বাধা তুচ্ছ করে প্রয়োজনবোধে স্বশস্ত্র সংগ্রাম করেও মাতার জন্য মায়াপুরী হতে জ্ঞানফল নিয়ে আসতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ :

ধীমান। কাঁটার ভয়ে পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। কেবল কাঁটা কেন, পার্বত্য অরণ্যশঙ্কুল পথে সর্প বৃশ্চিকও আছে; আরও উর্ধ্বে শিলাবৃষ্টি বজ্রপাতও আছে, সে সব উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

নবীন। না, ওসব কিছু মানিব না,–বাইকাটা অস্ত্র সঙ্গে থাকিলে ভয় কিসের?...।

ভীরু প্রবীণ তখন মনে মনে চিন্তা করেন,

আমার সাহসে কুলায় না।...।

বাইকাটা অস্ত্রখানি লুকাইয়া সঙ্গে রাখিতে হইবে, নচেৎ প্রহরী দৈত্যগণ তাহা দেখিলে ক্ষেপিবে। আর আমার আবেদন লিপিগুলিও অবশ্য সঙ্গে থাকিবে।

নবীন।...। না দাদা, আবেদন নিবেদনে কাজ নাই–

প্রবীণ। না নবীন, ঐ শোন মেঘার্জ্জন। অর্দ্ধপথে ভিজিতে হইবে।

নবীন। ভিজিলেই ক্ষতি কি?

রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান না করলেও পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বেগম রোকেয়া চেয়েছিলেন মনেপ্রাণে। স্বাধীনতা অর্জনের জন্যই নারী-পুরুষ

নির্বিশেষে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছিলেন। 'মুক্তিফল' কাহিনীতে দেখা যায় যে, পুত্রগণ মুক্তিফল আনতে ব্যর্থ হলে কাঙ্গালিনীর কন্যা শ্রীমতি ও সুমতি পুত্রগণ সমবেতভাবে অগ্রসর হয় মুক্তিফল লাভের আশায়। আর তাই দেখে কাঙ্গালিনী আশাবাদী।

বেগম রোকেয়া বিশ্বাস করতেন যে নারী ও পুরুষের সমবেত প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব–যা পুরুষের একক প্রচেষ্টায় বাস্তবায়িত হচ্ছে না। মুক্তিফল রচনার উপসংহারে প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সেই চিন্তাধারার :

কাঙ্গালিনী! এ কি দেখি, আমার কোমলাঙ্গী ননির পুতুল দুহিতা ক্ষুদ্র স্বার্থে,–সাংসারিক ভোগবিলাস জলাঞ্জলি দিয়া আমার সেবায় নিযুক্তা হইল! শ্রীমতী ও সুমতি যখন তাহাদের ভ্রাতাদের কার্যে যোগদান করিতে বদ্ধপরিকর হইল, তখন আমার ভরসা হয় সম্ভবত আমার সুদীর্ঘ নিরাশযামিনী প্রভাত হইবে!–এত দিনে হয়ত আমার সন্তান সন্ততি মুক্তিফল আনিতে পারিবে। –আশা মায়াবিনী।

বেগম রোকেয়ার লিখিত 'জ্ঞানফল' ও 'মুক্তিফল' সম্পর্কে ১৩২৮ অগ্রহায়ণের মোসলেম ভারত-এ বলা হয় :

'জ্ঞানফল' ও 'মুক্তিফল' দুইটি রূপকথা।... । ইহাতে সাময়িক ও রাজনৈতিক নানা বিষয়ের প্রতিবিম্ব আছে। উভয় প্রবন্ধেরই মুখ্য উদ্দেশ্য : নারীজাতিকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া সমাজের কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহাই পাঠক-পাঠিকার স্মরণ করাইয়া দেওয়া। গৌণ উদ্দেশ্যে; নারী-পুরুষ উভয়কে দেশের কল্যাণের জন্য আত্মপ্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করা।

আবার ১৩২৯ বৈশাখের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা-য় বলা হয় যে :

'মুক্তিফল' রূপকথাটি political carricature হিসাবে বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে।

বেগম রোকেয়া রচিত মতিচূর, দ্বিতীয় খণ্ডের সর্বশেষ নিবন্ধ 'সৃষ্টিতত্ত্ব'। এটিও মূলত সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কিত প্রবন্ধ। উক্ত প্রবন্ধে ব্রিটিশ গোয়েন্দা ও পুলিশের তৎপরতাকে বেগম রোকেয়া ব্যঙ্গ করে বলেন :

... তোমাদের নরলোকে যা হোক, শান্তিনেশে যুবকদের শাস্তি দিবার জন্য সি. আই. ডি. আছে, কিন্তু সুরলোকে তাহাদের জব্দ করিবার জন্য কোন ব্যবস্থাই নাই।

১৩২৮ অগ্রহায়ণের মোসলেম ভারত-এ মতিচূর, দ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধে বলা হয়:

"পুস্তকখানি পড়িলেই বোঝা যায় গ্রন্থকর্ত্রী আত্মযশঃলিপ্সায় প্রণোদিত হইয়া লেখনী ধারণ করেন নাই। পক্ষান্তরে ভুয়োদর্শনের ফলে তাঁহার হৃদয়ে যে বেদনার সুরবাজিয়ে উঠিয়াছে, তাহাকেই তিনি নানা কথায় নানা ছলে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।... ।

...মুসলমান নারী সমাজ এ গ্রন্থের জন্য যে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিবেন তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।

মতিচূর, দ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধে ১৩২৯ বৈশাখের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা-য় বলা হয় :

...লেখিকা সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও কাল্পনিক সাহিত্যের নানা বিভাগেই লেখনী চালনা করিয়াছেন।... নারী জাতির দুঃখ দৈন্যে ব্যথিত হইয়া লেখিকা যে সরস মধুর ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহা বড়ই মর্মস্পর্শী হইয়াছে।

১৩২৯ বৈশাখের সহচরেও মতিচূর, দ্বিতীয় খণ্ডের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়। উক্ত পত্রিকায় গ্রন্থখানি সম্বন্ধে ইহাও বলা হয় :

...নারীর ব্যথা বেদনার প্রতিচ্ছবি। অন্ধ নারী সমাজের জাগরণ দানের বজ্রবীণা।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বেগম রোকেয়া রচিত Sultana's Dream নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। ইতেপূর্বে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে উক্ত রচনাটি Indian Ladies Magazine পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে Sultana's Dream-এর বঙ্গানুবাদ করেন লেখিকা সুলতানার স্বপ্ন নামে এবং এটি মতিচূর, দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় রচনা হিসাবে স্থান লাভ করে।

যুগ যুগ ধরে সমাজে প্রচলিত অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নারীমনে আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তি জাগ্রত করাই ছিল বেগম রোকেয়ার সর্বক্ষণের ধ্যান ও চিন্তা। আর তাঁর রচিত সুলতানার স্বপ্ন ছিল নারীর উপর পুরুষের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে প্রতিকারমূলক এমনি একটি চিন্তাশীল ও মৌলিক পরিকল্পনা। সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন Sultana's Dream পাঠ করে বলেন, "A Terrible Revenge." ভাগলপুরের তদানীন্তন কমিশনার মি. ম্যাক্‌ফারসন উক্ত রচনা পাঠ করে নিম্নরূপ মন্তব্য করেন :

"The ideas expressed in it are quite delightful and full of originality and they are written in perfect English. ... I wonder if she has foretold here the manner in which we may be able to move about in the air at some future time. Her suggestions on this point are most ingenious."

সুলতানার স্বপ্ন-তে বেগম রোকেয়া এক অপূর্ব নারীজগতের কল্পনা করেছেন–যেখানে পুরুষ পর্দার আড়ালে গৃহে আবদ্ধ, নারী মস্তিষ্ক বলে অতি সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। সুযোগ পেলে নারীর সুপ্ত প্রতিভা যে ফুলে ফলে বিকশিত হতে পারে এটাই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর চিন্তাশীল কল্পজগতের চিত্রে।

রমণী দুর্বলা, কাজেই অন্তঃপুরের বাইরে থাকা তাদের জন্য মঙ্গলকর ও নিরাপদ নহে–এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দৃঢ় সাহসিকতা, নির্ভীকতা ও কঠোরতার সাথে কটাক্ষ করে বেগম রোকেয়া সুলতানার স্বপ্ন-তে বলেন :

হাঁ, নিরাপদ নহে ততদিন,–যতদিন পুরুষ জাতি বাহিরে থাকে; তা কোন বন্য জন্তু কোন একটা গ্রামে আসিয়া পড়িলেও ত সে গ্রামখানি নিরাপদ থাকে না।...। হিংস্র জন্তুটা ধরা না পড়া পর্যন্ত গ্রামখানি নিরাপদ হইতে পারে না।

যুগ যুগ ঘরে পুরুষ কর্তৃক নারী হচ্ছে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত। আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধী হয়েও পুরুষ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে। সমাজে প্রচলিত এ সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে বেগম রোকেয়াই সর্বপ্রথম শ্লোগান তোলেন :

পুরুষেরা–যাহারা নানা প্রকার দুষ্টামী করে, বা অন্তত করিতে সক্ষম, তাহারা দিবা স্বাধীনতা ভোগ করে, আর নিরীহ কোমলাঙ্গী অবলারা বন্দিনী থাকে।

বেগম রোকেয়া আরও মন্তব্য করেন :

অমার্জিতরুচির পুরুষেরা বিনা শৃঙ্খলে থাকিবার উপযুক্ত নহে।

তৎকালীন ভারতবর্ষে প্রচলিত সামাজিক বিধিব্যবস্থা যে পুরুষেরা নিজেদের সুবিধামতো তৈরি করেছে–এ মৌলিক সত্যটিও বেগম রোকেয়ার দৃষ্টি হতে এড়িয়ে যেতে পারেনি। তাই এ প্রসঙ্গে আপন বক্তব্য ব্যক্ত করে তিনি বলেন :

সামাজিক বিধিব্যবস্থার উপর আমাদের কোন হাত নাই। ভারতে পুরুষজাতি প্রভু,–তাহারা সমুদয় সুখ সুবিধা ও প্রভুত্ব আপনাদের জন্য হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে, আর সরলা অবলাকে অন্তঃপুর পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়াছে! উড়িতে শিখিবার পূর্বেই আমাদের ডানা কাটিয়া দেওয়া হয়–তদ্ব্যতীত সামাজিক রীতিনীতির কত শত কঠিন শৃঙ্খল পদে পদে জড়াইয়া আছে।

শারীরিক দিক দিয়ে অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠবান পুরুষ কর্তৃক দুর্বল নারীর প্রতি অন্যায় প্রভুত্ব বেগম রোকেয়া সহজে মেনে নিতে পারেননি। এ সম্পর্কে তিনি এক তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র "সারা"র বক্তব্যের মধ্যদিয়ে :

কেবল শারীরিক বল বেশি হইলেই কেহ প্রভুত্ব করিবে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। সিংহ কি বলে বিক্রমে মানবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। তাই বলিয়া কি কেশরী মানবজাতির উপর প্রভুত্ব করিবে? আপনাদের কর্তব্যের ত্রুটি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আপনারা সমাজের উপর কর্তৃত্ব ছাড়িয়া একাধারে নিজের প্রতি অত্যাচার এবং স্বদেশের অনিষ্ট দুই-ই করিয়াছেন। আপনাদের কল্যাণে সমাজ আরও উন্নত হইত—আপনাদের সাহায্যের অভাবে সমাজ অর্ধেক শক্তি হারাইয়া দুর্বল ও অবনত হইয়া পড়িয়াছে।

নিজ কর্তব্যকর্মে তৎকালীন রাজকর্মচারীদের অবহেলার দিকটি বেগম রোকেয়া তুলে ধরেন সুলতানার স্বপ্ন-তে "সুলতানা" ও "সারা" দুইটি মূল চরিত্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে।

...আমি সমস্ত দিন রসায়নাগারে আবদ্ধ থাকি না। আমি দুই ঘণ্টায় দৈনিক কর্তব্য শেষ করি। "দুই ঘণ্টায়! আপনি একি বলেন?–দুই ঘণ্টায় আপনার কার্য শেষ হয়! আমাদের দেশে রাজকর্মচারীগণ– যেমন ম্যাজিস্ট্রেট, মুন্সেফ, জজ প্রভৃতি প্রতিদিন ৭ ঘণ্টা কাজ করিয়া থাকেন।"

"আমি ভারতের রাজপুরুষদের কার্যপ্রণালী দেখিয়াছি। আপনি কি মনে করেন, যে তাঁহারা সাত-আট ঘণ্টাকাল অনবরত কাজ করেন?" "নিশ্চয়! বরং এতদপেক্ষা অধিক পরিশ্রমই করেন।"

"না প্রিয় সুলতানা! ইহা আপনার ভ্রম! তাঁহারা অলসভাবে বেত্রাসনে বসিয়া ধূমপানে সময় অতিবাহিত করেন!...।

তাই ত! অথচ ভ্রাতৃমহোদয়গণ জীবিকা অর্জন করেন, এই অহঙ্কারেই বাঁচেন না!

ভারতীয়দের প্রতি তীব্র বঙ্গ করে বেগম রোকেয়া সুলতানার স্বপ্ন-তে মন্তব্য করেন।

ভারতবাসীর বুদ্ধি সুপথে চালিত হয় না–জ্ঞান বিজ্ঞানের সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই। আমাদের সব কার্য্যের সমাপ্তি বক্তৃতায়–সিদ্ধি করতালি লাভে!

কোন দেশ আপনা হইতে উন্নত হয় না, তাহাকে উন্নত করিতে হয়।

যেহেতু পুরুষেরা কেবল শারীরিক শক্তির অহংকার করে থাকে এবং নারীদের দুর্বল ভেবে উপেক্ষা করে থাকে, তাই বেগম রোকেয়া এমন এক রাজ্য কল্পনা করেন, যেখানে শারীরিকভাবে বলিষ্ঠ পুরুষ যাবতীয় পরিশ্রমের কাজ করে আর নারী মস্তিষ্কবলে রাজ্যের অন্যান্য কাজ করে :

"ভাল কথা, আপনারাই ত সব কাজ করেন, তবে পুরুষেরা কি করেন?"

"বড় বড় কলকারখানায় যন্ত্রাদি পরিচালিত করেন; খাতা-পত্র রাখেন,–এক কথায় বলি, তাঁহারা যাবতীয় কঠিন পরিশ্রম অর্থাৎ যে কার্যে কায়িক বলের প্রয়োজন, সেই সব কার্য করেন।"....। আমরা শ্রম বন্টন করিয়া লইয়াছি।...।

বেগম রোকেয়ার নায়িকা সুলতানা আরো বলেন :

তাঁহারা শারীরিক পরিশ্রম করেন, আমরা মস্তিষ্কাচালনা করি। আমরা যে সকল যন্ত্রের উদ্ভাবনা বা সৃষ্টি কল্পনা করি, তাঁহারা তাহা নির্মাণ করেন। নরনারী উভয়ে একই সমাজ-দেহের বিভিন্ন অঙ্গ,–পুরুষ শরীর, রমণী মন!"

সমকালের তুলনায় বেগম রোকেয়ার চিন্তাশক্তি ছিল অতি অগ্রসর। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে বাংলাদেশে পণপ্রথা ও বাল্যবিবাহ রহিতকরণ প্রশ্নে আলোড়ন চলছে। কিন্তু তৎকালীন ভারতবর্ষে প্রচলিত বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা ইত্যাদি কুপ্রথার অবসানকল্পে বেগম রোকেয়া তাঁর লেখনী পরিচালনা করেছেন। সুলতানার স্বপ্ন পুস্তিকায় বাল্যবিবাহ রহিতকরণ দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, একুশ বৎসর বয়ক্রমের পূর্বে কোন কন্যার বিবাহ হইতে পারিবে না। এটা আইন হওয়া উচিত।

সুলতানার স্বপ্ন-তে বেগম রোকেয়ার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে বেগম রোকেয়া নারী বৈজ্ঞানিক কল্পনা করেছেন, বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদের কথা বলেছেন, সৌরচুল্লির কল্পনা করেছেন, এমন কি কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত ঘটানোর কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

সুলতানার স্বপ্ন-তে পাঠ করে আবুল হোসেন বলেন,

তাঁহার মতো চিন্তাশীল নারী প্রকৃতই, নারীজাতি কেন, সমগ্র মানবজাতির গৌরবের পাত্রী।

...। Sultana's Dream-এর মধ্যে পুরুষকে অবরুদ্ধ করিবার একমাত্র হেতু। আমাদের নারীজাতির দাসত্ব, অর্থাৎ পুরুষের উপর একান্ত নির্ভরতা। পুরুষ না হলে আমাদের নারী একেবারে অকর্মণ্য ও অসহায়, মূর্খ ও অজ্ঞ বলিয়া সে পুরুষের উপর তাহার জীবনের মত অস্তিত্বটুকুর জন্য নির্ভরশীলা, এ-কথা কেবল পুরুষের দ্বারাই নিখিল বিশ্বে ঘোষিত হইয়াছে, এবং সেই ঘোষণা দ্বারা নারীও তাহার শক্তি আছে এ-কথা বিশ্বাসই করিতে পারে না। পক্ষান্তরে নারী যে ক্ষমতাসম্পন্ন, সে যে পুরুষের মতো, এমন কি পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর প্রতিভাবতী হইতে পারে–তাহার শক্তিকে জাগ্রত করিলে যে প্রকৃতিকে নিজের আয়ত্ত্বাধীন করিয়া পুরুষের বিন্দুমাত্র সাহায্য

ব্যতিরেকে সে দুনিয়ার বুকে নির্মল সৌন্দর্য, সম্পদ ও কল্যাণের বিরাট ক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা ঐ Lady land-এর নারীদের ক্ষমতার দৃষ্টান্ত দ্বারা মিসেস আর. এস. হোসেন অতি অসহায়া বঙ্গীয় নারী হৃদয়ে আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তির বীজ বপন করিবার উদ্দেশ্যে বোধকরি এই Sultana's Dream রচনা করিয়াছেন।

নির্যাতিত, নিগৃহীত, লাঞ্ছিত, উপেক্ষিত ও পুরুষের সুপরিকল্পিত দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ বাঙালি মুসলিম নারীজাতির সর্বাঙ্গিক মঙ্গলসাধনই ছিল বেগম রোকেয়ার জীবনের ব্রত। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তিনি লেখনীর সাহায্যে তাঁর চিন্তাধারা সমাজের নিকট পেশ করেন এবং বাস্তবজীবনে তাঁর চিন্তাধারণার কার্যকরী করারও প্রচেষ্টা করেন। পদ্মরাগ ছিল তাঁর জীবনস্বপ্ন সম্পর্কিত এমনি একটি উপন্যাস। পদ্মরাগ-এ বর্ণিত তারিণী ভবনের প্রতিষ্ঠাতা দীনতারিণীর যে বর্ণনা বেগম রোকেয়া দিয়েছেন তা থেকে অনুমান করা হয় যে, লেখিকা 'দীন তারিণী' চরিত্রটির বর্ণনা ছিল নিম্নরূপ :

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার তারিণীচরণ সেন অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র কন্যা কেহই ছিল না; ছিলেন তাঁহার দ্বিতীয়পক্ষের সপ্তদশবর্ষীয়া তরুণী বিধবা দীন-তারিণী।...।

দেবর-ভাশুর প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দীন-তারিণী একটি বিধবা-আশ্রম স্থাপন করিলেন। আশ্রমের নাম রাখিলেন-'তারিণী-ভবন'। তারিণী-ভবনের শ্রীবৃদ্ধিতে উৎসাহিতা হইয়া তিনি একটা বিদ্যালয় খুলিলেন এবং 'নারী-ক্লেশ-নিবারণী সমিতি' নামে একটি সভা গঠন করিলেন। তারিণী-ভবনের বিরাট অট্টালিকার এক প্রান্তে বালিকা-বিদ্যালয়, অপর প্রান্তে বিধবা-আশ্রম। কিন্তু ক্রমে তাঁহাকে তৎসংলগ্ন একটা আঁতুর-আশ্রমও স্থাপন করিতে হইল।

...। তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁহার এই কর্ম্মজীবনে সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা বিরক্তই রহিলেন, এবং তারিণী লক্ষাধিক টাকার অযথা শ্রাদ্ধ করিতেছেন বলিয়া আক্ষেপ করিতেন আর তারিণীর কার্য্যকলাপকে বিদ্রুপ করিতেন।...।

দীন-তারিণী স্বীয় আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক একরূপ 'সমাজচ্যুতা' হইয়া নির্জ্জনে বাস করিতেন।

বেগম রোকেয়া নারীদের জন্য এমন একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যেখানে সকল পরিত্যক্ত, কাঙ্গালি, উপেক্ষিত, অসহায়, লাঞ্ছিত নারী তাদের সুন্দর জীবন খুঁজে পাবে এবং সমাজের সবরকম অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নেবে। তাই তিনি তাঁর পদ্মরাগ উপন্যাসে বলেন :

যে বিধবার তিন কুলে কেহ নাই, সে কোথায় আশ্রয় পাইবে?-তারিণী-ভবনে। যে বালিকার কেহ নাই, সে কোথায় শিক্ষা লাভ করিবে?-তারিণী বিদ্যালয়ে। যে সধবা স্বামীর পাশবিক অত্যাচারে চূর্ণ-বিচূর্ণ জরাজীর্ণ হইয়া গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, সে কোথায় গমন করিবে?-ঐ তারিণী-কর্ম্মালয়ে। যে দরিদ্র দুরারোগ্য রোগে ভুগিতেছে তাহারও আশ্রয়-স্থল ঐ তারিণী আঁতুরাশ্রম।

তাঁর কল্পিত এই তারিণী ভবনের কার্যকলাপের সাথে আমরা বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলামে'র কর্মকাণ্ডের মিল খুঁজে পাই।

তারিণী বিদ্যালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

ছাত্রীদিগকে দুই পাতা পড়িতে শিখাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে ঢালিয়া বিলাসিতার পুত্তলিকা গঠিত করা হয় না। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভূগোল, খগোল, ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র—সবই শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু শিক্ষার প্রণালী ভিন্ন। মিথ্যা ইতিহাস কণ্ঠস্থ করাইয়া তাহাদিগকে নিজের দেশ এবং দেশবাসীকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না। বালিকাদিগকে অতি উচ্চ আদর্শের সুকন্যা, সুগৃহিণী ও সুমাতা হইতে এবং দেশ ও ধর্ম্মকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশেষতঃ তাহারা আত্ম-নির্ভরশীলা হয় এবং ভবিষ্যৎ-জীবনে যেন কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ পিতা বা স্বামী-পুত্রের গলগ্রহ না হয়, এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়।

তারিণী বিদ্যালয়ের এই শিক্ষাপদ্ধতির সাথে আমরা বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'-এর শিক্ষা ব্যবস্থার সাদৃশ্য লক্ষ্য করি।

নারীমুক্তির পূর্বশর্ত হচ্ছে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা–একথা বেগম রোকেয়া বিশ্বাস করতেন। তাঁর রচিত উপন্যাস পদ্মরাগ-এর মূল বক্তব্যই হচ্ছে নারীর অর্থনৈতিকমুক্তি। পদ্মরাগে-এ তারিণী-কর্মালয়ের যে চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন, তাতে দেখা যায় নারীরা–

কেহ শিক্ষয়িত্রী-পদলাভের উপযোগী শিক্ষালাভ করেন; কেহ টাইপিং শিক্ষা করেন; কেহ রোগী-সেবা শিখেন। ফল কথা, এ বিভাগে রমণীগণ আপন আপন জীবিকা স্বয়ং উপার্জন করিয়া থাকেন।

মুসলিম নারী-স্বাধীনতার জন্য যদিও তিনি আজীবন সংগ্রাম চালনা করেছেন তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল নারীর মুক্তিই ছিল তাঁর কাম্য। তাই তো দেখতে পাই 'তারিণী ভবনে' হিন্দু মুসলমান, খ্রিস্টান সকল ধর্মের অত্যাচারিতা নারী স্থান লাভ করেছে।

তারিণী-ভবনে যেমন নানা জাতি, নানা ধর্ম এবং নানা শ্রেণীর লোক আছে, সেইরূপ নানা দেশেরও পরিচারিকা–ভূটিয়া, নেপালী, বেহারী, সাওতাল, কোল মাদ্রাজী ইত্যাদি আছে।

...। কি সুন্দর সাম্য!–মুসলমান, হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান সকলে যেন এক মাতৃগর্ভজাতা সহোদরার ন্যায় মিলিয়া কার্য করিতেছেন।

শুধুমাত্র বাঙালি মুসলিম নারী নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই নারী পুরুষের সুকৌশল আইনের শিকার। পদ্মরাগ উপন্যাসের মধ্যদিয়ে বেগম রোকেয়া সুসভ্য ইংল্যান্ডের বিচার ও আইন ব্যবস্থার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন। উক্ত উপন্যাসে দেখা যায় যে, ইংরেজ রমণী হেলেনের স্বামী মিঃ জোসেফ নানাবিধ কুচরিত্রের অধিকারী ও বদ্ধ পাগল। সে সুরাসক্ত হয়ে বিনা কারণে স্ত্রী হেলেনের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। স্বামীর নিপীড়নে অতিষ্ট হয়ে হেলেন মি. জোসেফের নিকট হতে মুক্তি জানিয়ে আদালতে 'ডিক্রি নিসি' দাবি করে। কিন্তু চারজন বিচারক তাঁদের রায়ে

একবাক্যে ঘোষণা করেন–মিসেস হেলেন তাঁর স্বামী জোসেফের কাছ থেকে কখনও মুক্তি পেতে পারেন না। নারীর প্রতি পুরুষ সমাজের অমানবিক অত্যাচারের সমালোচনা করে বেগম রোকেয়া বলেন :

ইংল্যান্ডের আইন হেলেনদিগকে বাতুলের বন্ধন হইতে মুক্তিদান করিতে পারিল না। হরেসের বাতুলতার বিষময় ফল হেলেনকে ভোগ করিতে হইবে! ইহা অপেক্ষা অবিচার অত্যাচার আর কি হইতে পারে? এই ইংল্যান্ড–এই পূর্তিগন্ধময় পচা ইংল্যান্ড আবার সভ্যতার দাবী করে!

বৈবাহিক জীবনে নারীর প্রতি পুরুষের অনাদর, লাঞ্ছনা ও অবমাননার বিরুদ্ধেই বেগম রোকেয়ার প্রতিবাদ পদ্মরাগ উপন্যাসে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। পদ্মরাগ-এ বর্ণিত সিদ্দিকা, সৌদামণি, হেলেন, সকিনা ও রাফিয়ার কথোপকথনের মধ্যে আমরা নারীর নিপীড়িত ও নির্যাতিত অবস্থার এবং নারীর অধিকার সম্পর্কিত বেগম রোকেয়ার বৈপ্লবিক চিন্তাধারার পরিচয় পাই :

সি। সমাজের এই সব নালীঘায়ের কি ঔষধ নাই? বাতুলের সহিত চিরজীবন আবদ্ধা থাকিতে হইবে, বিনাকারণে পরিত্যক্তা হইতে হইবে, অপমানিতা হইয়া মাতালের সহিত সপত্নী সমভিব্যাহারে ঘর করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে সহোদর ভাই হাত পা বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে পাঠাইতে চাহিবেন, স্বামী বাতায়ন উল্লঙ্ঘনে পলায়ন করিলেন বলিয়া স্ত্রীকে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে,– ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?

সৌ। আছে! সে প্রতিকার এই তারিণী-ভবনের 'নারী-ক্লেশ- নিবারণী-সমিতি'। এস, যত পরিত্যক্তা, কাঙ্গালিনী, উপেক্ষতা, অসহায়া, লাঞ্ছিতা,– সকলে এস তারপর সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা। আর তারিণী-ভবন আমাদের 'কেল্লা'।

হে। রাফিয়াবুর অকারণ 'তালাকের' বিরুদ্ধে কোন আইন নাই কি?

রা। থাকিলেও আমি তাহার শরণ লইতে ঘৃণা বোধ করি! যে নিষ্ঠীবনের মত পরিত্যাগ করিয়াছে, আবার তাহার দিকে ফিরিয়া দেখা কেন?

স। আমিও ঐ জন্যই তারিণী-ভবনে আসিয়াছি, আমিও দেখাইতে চাহি যে দেখ, তোমাদের 'ঘর-করা' ছাড়া আমাদের আরও পথ আছে! স্বামীর 'ঘর করাই' নারী-জীবনের সার নহে। মানব-জীবন খোদাতালার অতি মূল্যবান দান,–তাহা শুধু "রাঁধা-উননে ফুঁ-পাড়া আর কাঁদার" জন্য অপব্যয় করিবার জিনিস নহে! সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে!

নারীদের মধ্যে সচেতনতাবোধ, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ এবং স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত করার লক্ষ্যে বেগম রোকেয়া বারংবার নারীসমাজকে আহ্বান জানান। পদ্মরাগ উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র সিদ্দিকার চরিত্রকে তিনি এক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারীরূপে সৃষ্টি করেছেন। সিদ্দিকার প্রকৃত নাম জয়নব তাঁর জন্ম হয় চুয়াডাঙ্গার এক জমিদার পরিবারে। পিতা-মাতাহারা জয়নবের একমাত্র ভ্রাতা সোলাইমান।

আরেক জমিদার পরিবারে জন্ম হয় পদ্মরাগ উপন্যাসের নায়ক লতীফের। পিতামহের জীবিতকালে লতীফের পিতার মৃত্যু ঘটে। কাজেই লতীফের পিতৃব্য হাজী

হবীব আলম জমিদারির উত্তরাধিকারী হন। লতীফ তার পিতৃব্যের অনুগ্রহে এম. এ. পাস করে। এ সময় লতীফের মাতা জয়নবের সাথে লতীফের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেন। কিন্তু তিন বৎসর পর বিবাহ হওয়ার শর্তে লতীফ ও জয়নবের কেবল "আক্‌দবস্ত" হয়ে রইল। অতঃপর লতীফ পিতৃব্যের অনুগ্রহে ইংল্যান্ড যান। এবং তিন বছর পর ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে আসেন।

লতীফের পিতৃব্য হাজী সাহেব অত্যন্ত অর্থলোভী ব্যক্তি ছিলেন। তার জনৈকা আত্মীয় একমাত্র কন্যা নিয়ে বিধবা হয়েছেন, এই কন্যাটির সাথে লতীফের বিয়ে দিলে বিধবার সম্পত্তি করায়ত্ত করা যাবে। তাই তিনি জয়নবের ভ্রাতা সোলাইমানের সাথে এক চাল চাললেন।

জমিদার সোলাইমান ন্যায়, সাধু ও ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। হাজী সাহেব সোলাইমানকে পত্রের মাধ্যমে জানান যে, বিয়ের পূর্বে জয়নবকে তার ভাগের সম্পত্তি লিখে দিতে হবে। কিন্তু জমিদার সোলাইমান এতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, আঠার বছর বয়োপ্রাপ্ত হলে জয়নব নিজের সম্পত্তির ভাগ বুঝে নিবে।

সোলাইমান এ বিষয়ে লতীফের বক্তব্য জানার জন্য তাঁকে একটি পত্র লিখেন। কিন্তু হাজী সাহেব সেই পত্র হস্তগত করেন।

এদিকে হাজী সাহেব লতীফের দ্বিতীয় বিয়ের আয়োজন করে। লতীফ দ্বিতীয় বিয়েতে ঘোরতর আপত্তি জানান। কিন্তু পরবর্তীতে মাতামহ অন্যান্য গুরুজনের অনুরোধে তিনি দ্বিতীয় বিয়েতে বাধ্য হন।

জয়নবের জীবনে আরেক বিপর্যয় নেমে আসে। চুয়াডাঙ্গার এক নীলকর-সাহেব রবিনসনকে সোলাইমান নীলচাষ করার জন্য ৫০ বিঘা জমি দিতে অস্বীকৃতি জানালে রবিনসনের চক্রান্তে সোলাইমান ও তাঁর উনিশ বছরের পুত্র খুন হয়।

রবিনসন জানত যে জয়নব অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তাঁকে ফাঁকি দিয়ে জমিতে নীল চাষ করা সম্ভব নয়। তাই রবিনসন জয়নবের নামে মিথ্যা মামলা করে এই বলে যে, উক্ত জমিদার তার ভগ্নীকে সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করে রাখার জন্য নামমাত্র বিয়ে দিয়ে চিরকাল অবিবাহিত রেখেছেন। এই কারণে ভ্রাতা-ভগ্নীর সর্বদা বিবাদ থাকত এবং সম্পত্তি লাভের আশায় ভগ্নী ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করেছে।

কাজেই জয়নব গৃহ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরবর্তীতে তিনি 'তারিণী ভবনে' আশ্রয় গ্রহণ করেন সিদ্দিকা নামে। ঘটনাচক্রে লতীফও অসুস্থ হয়ে উক্ত আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরবর্তীতে লতীফ ও সিদ্দিকা উভয়ে উভয়কে চিনতে সক্ষম হয় এবং লতীফ সিদ্দিকাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব জানান। 'তারিণী ভবন'-এর প্রতিষ্ঠাতা দীন-তারিণী লতীফের সাথে সিদ্দিকার সন্ধি স্থাপনের প্রচেষ্টা করেন এবং সিদ্দিকাকে লতীফের সাথে সংসার করার প্রস্তাব জানালে সিদ্দিকা অতি কঠোরতার সাথে বলেন :

...'সংসারধর্ম্ম' আমার জন্য নহে। সেই যে সম্পত্তি লিখিয়া না পাওয়ার জন্য 'পদাঘাতে বিতাড়িত' হইয়াছিলাম, সে অবমাননা কি করিয়া ভুলিব? তাঁহারা আমার সম্পত্তি চাহিয়াছিলেন,–আমাকে চাহেন নাই! আমরা কি মাটীর পুতুল যে, পুরুষ যখন

ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিবেন, আবার যখন ইচ্ছা গ্রহণ করিবেন?...। আমি আজীবন তারিণী-ভবনের সেবা করিয়া নারী-জাতির কল্যাণ-সাধনের চেষ্টা করিব এবং অবরোধ প্রথার মূলোচ্ছেদ করিব।

...। আমি সমাজকে দেখাইতে চাই, একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারীজন্মের চরম লক্ষ্য নহে; সংসারধর্ম্মই জীবনের সারধর্ম্ম নহে। পক্ষান্তরে আমার এই আত্মত্যাগ ভবিষ্যতে নারীজাতির কল্যাণের কারণ হইবে বলিয়া আশা করি।...।

বেগম রোকেয়ার পদ্মরাগ সম্পর্কে সওগাত পত্রিকায় বলা হয় :

আলোচ্য গ্রন্থকর্ত্রী তারিণী-ভবনের পরিকল্পনায় যে সমস্ত সামাজিক সমস্যার ও সমাধানের স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি সমাজের ক্ষতস্থান সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ এবং তাহার সুস্থতা লাভের জন্য তিনি অন্তরে যথেস্ট বেদনা অনুভব করিয়া থাকেন।

পদ্মরাগ সম্পর্কে মোহাম্মদী পত্রিকায় বলা হয় :

লেখিকা নিজের ব্যক্তিগত জীবনে যে জিনিসটাকে সবচেয়ে বড় করিয়া দেখিয়াছেন পদ্মরাগের ভিতর দিয়া তাহাই তিনি সুন্দর করিয়া ফুটাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, নারী-সমাজের দুঃখ-দুর্দশার মর্মস্পর্শী কাহিনী হচ্ছে অবরোধবাসিনী। উক্ত গ্রন্থের নিবেদনে বেগম রোকেয়া বলেছেন :

কতকগুলি ঐতিহাসিক ও চাক্ষুষ সত্য ঘটনার হাসি-কান্না লইয়া "অবরোধ-বাসিনী" রচিত হইল। পাঠক-পাঠিকাগণ অধিকাংশস্থলে হাসিবেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন কোন স্থলে তাঁহাদের মনে সমবেদনার উদ্রেক হইবে এবং আমার বিশ্বাস তাঁহারা 'তাহেরা' মরহুমার অকালমৃত্যুতে দুই বিন্দু অশ্রু বিসর্জন না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

অবরোধবাসিনী গ্রন্থের প্রারম্ভে বেগম রোকেয়া বলেন :

আমরা বহু কাল হইতে অবরোধে থাকিয়া থাকিয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি সুতরাং অবরোধের বিরুদ্ধে বলিবার আমাদের–বিশেষত আমার কিছুই নাই। মেছোণীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, "পচা মাছের দুর্গন্ধ ভাল না মন্দ?"– সে কি উত্তর দিবে?

বেগম রোকেয়া আরো বলেছেন :

..., গোটা ভারতবর্ষে কুলবালাদের অবরোধ কেবল পুরুষের বিরুদ্ধে নহে, মেয়েমানুষদের বিরুদ্ধেও। অবিবাহিতা বালিকাদিগকে অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া এবং বাড়ির চাকরাণী ব্যতীত অপর কোন স্ত্রীলোকে দেখিতে পায় না।

বিবাহিতা নারীগণও বাজীকর-ভানুমতী ইত্যাদি তামাসাওয়ালী স্ত্রীলোকদের বিরুদ্ধে পর্দা করিয়া থাকেন। যিনি যত বেশি পর্দা করিয়া গৃহকোণে যত বেশি পেঁচকের মত লুকাইয়া থাকিতে পারেন, তিনিই তত বেশি শরীফ। শহরবাসিনী বিবিরাও মিশনারী মেমদের দেখিলে ছুটাছুটি করিয়া পলায়ন করেন। মেম ত মেম-শাড়ি পরিহিতা খ্রিস্টান বা বাঙ্গালি স্ত্রীলোক দেখিলেও তাঁহারা কামরায় গিয়া অর্গল বন্ধ করেন।

বহুকাল হতে অবরোধ-বাসিনী জীবন-যাপন করার ফলে অবরোধে বসবাস করা নারীজীবনের একটি স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল এবং তারা অবরোধপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। এ প্রসেঙ্গ বেগম রোকেয়া রচিত অবরোধবাসিনী থেকে দুইটি কাহিনী নিম্নে তুলে ধরা হলো :

এক বাড়িতে আগুন লাগিয়াছিল। গৃহিণী বুদ্ধি করিয়া তাড়াতাড়ি সমস্ত অলঙ্কার একটা হাত বাক্সে পুরিয়া লইয়া ঘরের বাহির হইলেন। দ্বারে আসিয়া দেখিলেন সমাগত পুরুষেরা আগুন নিবাইতেছে। তিনি তাহাদের সম্মুখে বাহির না হইয়া অলঙ্কারের বাক্সটি হাতে করিয়া ঘরের ভিতর খাটের নিচে গিয়া বসিলেন। তদবস্থায় পুড়িয়া মরিলেন, কিন্তু পুরুষের সম্মুখে বাহির হইলেন না। ধন্য! কুল-কামিনীর অবরোধ!

প্রায় ২১/২২ বৎসর পূর্বেকার ঘটনা। আমার দূর-সম্পর্কীয় এক মামীশাশুড়ি ভাগলপুর হইতে পাটনা যাইতেছিলেন; সঙ্গে মাত্র একজন পরিচালিকা ছিল। কিউল স্টেশনে ট্রেন বদল করিতে হয়। মামানী সাহেবা অপর ট্রেনে উঠিবার সময় তাঁহার প্রকাণ্ড বোরকায় জড়াইয়া ট্রেন ও প্লাটফরমের মাঝখানে পড়িয়া গেলেন। স্টেশনে সে সময় মামানীর চাকরাণী ছাড়া অপর কোন স্ত্রীলোক ছিল না। কুলিরা তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হওয়ায় চাকরাণী দোহাই দিয়া নিষেধ করিল–"খবরদার! কেহ বিবি সাহেবার গায়ে হাত দিও না।" সে একা অনেক টানাটানি করিয়া কিছুতেই তাঁহাকে তুলিতে পারিল না। প্রায় আধ ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

ট্রেনের সংঘর্ষে মামানী সাহেবা পিষিয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া গেলেন,–কোথায় তাঁহার "বোরকা"–আর কোথায় তিনি! স্টেশন ভরা লোক সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া এই লোমহর্ষক ব্যাপার দেখিল,–কেহ তাঁহার সাহায্য করিতে অনুমতি পাইল না। পরে তাঁহার চূর্ণপ্রায় দেহ একটা গুদামে রাখা হইল; তাঁহার চাকরাণী প্রাণপণে বিনাইয়া কাঁদিল, আর তাঁহাকে বাতাস করিতে থাকিল। এই অবস্থায় ১১ (এগার) ঘণ্টা অতিবাহিত হইবার পর তিনি দেহত্যাগ করিলেন! কি ভীষণ মৃত্যু!

তৎকালে প্রচলিত অবরোধ প্রথা ছোট শিশুর উপরও বলবৎ ছিল অতি সুকঠোরভাবে। বেগম রোকেয়া এই নিষ্ঠুর অবরোধ প্রথার বিভীষিকার এক কাহিনী তুলে ধরে বলেছেন :

সমাজ আমাদিগকে কেবল অবরোধ-কারাগারে বন্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। হযরতা আয়শা সিদ্দিকা নাকি ৯ বৎসর বয়সে বয়োপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইজন্য সম্ভ্রান্ত মুসলমানের ঘরের বালিকার বয়স আট বৎসর পার হইলেই তাহাদের উচ্চহাস্য করা নিষেধ, উচ্চৈস্বরে কথা বলা নিষেধ, দৌড়ান লাফান ইত্যাদি সবই নিষেধ। এক কথায়, তাহার নড়াচড়াও নিষেধ। সে গৃহকোণে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া কেবল সূচি-কর্ম করিতে থাকিবে,–নড়িবে না। এমনকি দ্রুতগতিতে হাঁটিবেও না।

কোন এক সম্ভ্রান্ত ঘরের একটি আট বৎসরের বালিকা একদিন উঠানে আসিয়া দেখিল, রান্নাঘরের চালে ঠেকান একটা ছোট মই আছে। তাহেরা (সেই বালিকা)র মনে কি হইল, সে অন্যমনস্কভাবে ঐ মইয়ের দুই ধাপ উঠিল। ঠিক সেই সময় তাহার পিতা

সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কন্যাকে মইয়ের উপর দেখিয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহার হাত ধরিয়া হেঁচকা টানে নামাইয়া দিলেন।

...অত্যধিক ভয়ে বিহ্বল হইয়াছিল বলিয়া সে রাত্রে তাহার জ্বর হইল।

...তৃতীয় দিনেও তাবেরার জ্বর ত্যাগ হইল না।...। পিতার রূঢ় ব্যবহারের নিষ্ঠুর প্রত্যুত্তর দিয়া তাহেরা চিরমুক্তি লাভ করিল।

কাজী হায়দার জান অবরোধবাসিনী গ্রন্থের সমালোচনা করে বলেন, অবরোধবাসিনীর চিত্রগুলি অবিশ্বাস্য ও অস্বাভাবিক এবং এগুলি 'আষাঢ়ে গল্প' কিংবা 'ঠাকুরমার উপকথার সমগোত্রীয়' বলে মনে হয়। তিনি আরো বলেন, যদি লেখিকা প্রকাশের পূর্বে ঘটনাগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করতেন তাহলে তিনি নিজেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হতেন যে, অবরোধবাসিনী গ্রন্থে বর্ণিত 'সত্য ঘটনাসমূহ' উপকথায় পর্যবসিত হয়েছে।

বেগম রোকেয়া এর প্রতিবাদ করে বলেন :

শুনিলাম কেহ কেহ বলিতেছেন, অবরোধবাসিনীর ঘটনাগুলি অনেক জায়গায় অতই আজগুবি যে, সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস হয় না। আমি নিজে জানি যে, ইহার একটি অক্ষরও সত্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যায় নাই।

নারীশিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত 'Bengal Women's Education Conference'-এর এক অধিবেশনে বেগম রোকেয়া কর্তৃক পঠিত অভিভাষণ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'বঙ্গীয় নারীশিক্ষা সমিতি' শিরোনামে। এই অভিভাষণে বেগম রোকেয়া মূলত স্ত্রীশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

মুসলিম ধর্মীয় আইনে নারীর শিক্ষা অর্জনে পূর্ণ অধিকার স্বীকৃত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও মুসলিম সমাজের নারীশিক্ষার প্রতি উদাসীনতা ও অবহেলা প্রদর্শন বেগম রোকেয়াকে গভীরভাবে পীড়িত করেছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

যদিও ইসলাম ধর্ম কন্যাদের শারীরিক হত্যা নিবারণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলিমগণ অম্লান বদনে কন্যাদের মন, মস্তিষ্ক এবং বুদ্ধিবৃত্তি অদ্যাপি অবাধে বধ করিতেছেন। কন্যাকে মূর্খ রাখা এবং চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখিয়া জ্ঞান ও বিবেক হইতে বঞ্চিত রাখা অনেকে কৌলিন্যের লক্ষণ মনে করেন।

তাই সমাজের নিকট বেগম রোকেয়ার জিজ্ঞাসা :

মুসলমান–যাঁহারা স্বীয় পয়গাম্বরের নামে (কিংবা ভগ্ন মসজিদের এক খণ্ড ইষ্টকের অবমাননায়) প্রাণ দানে প্রস্তুত হন, তাঁহারা পয়গম্বরের সত্য আদেশ পালনে বিমুখ কেন? গত অন্ধকার যুগে যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা যে ভ্রম করিয়াছেন, তাহাও ক্ষমা করা যাইতে পারে; কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে যখন বারংবার স্ত্রী-শিক্ষার দিকে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে যে, কন্যাকে শিক্ষা দেওয়া আমাদের প্রিয় নবী "ফরয" (অবশ্য পালনীয় কর্তব্য) বলিয়াছেন, তবু কেন তাঁহারা কন্যার শিক্ষায় উদাসীন?

বেগম রোকেয়া স্ত্রীশিক্ষার করুণ দূরবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

আমাদের দেশের গড়পড়তা প্রতি ২০০ (দুইশত) বালিকার একজনও অক্ষর চিনে না; প্রকৃত শিক্ষিতা মহিলা বোধ হয় দশ হাজারের মধ্যেও একজন পাওয়া যাইবে না। কেবল এই বঙ্গদেশে প্রায় তিন কোটি মুসলমানের বাস। গত জানুয়ারি মাসে শিক্ষা বিভাগ হইতে আমাকে একখানি পত্রে অনুরোধ করা হইয়াছিল যে, বঙ্গদেশে যতগুলি মুসলিম মহিলা গ্রাজুয়েট আছেন, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া যেন আমি অবিলম্বে পাঠাই।...। তিন কোটি মুসলমানের মধ্যে মাত্র একটি মহিলা গ্রাজুয়েট পাওয়া গেল,...!!

নারীমুক্তিকে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বশর্ত হিসাবে গণ্য করে বেগম রোকেয়া বলেন :

যে পর্যন্ত পুরুষগণ শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য অধিকার দিতে স্বীকৃত না হয়, সে পর্যন্ত তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষাও দিবে না। যাহারা নিজের সমাজকে উদ্ধার করিতে পারিতেছে না, তাহারা আর দেশোদ্ধার কিরূপে করিবে? অর্ধাঙ্গীকে বন্দিনী রাখিয়া নিজে স্বাধীনতা চাহে, এরূপ আকাঙ্ক্ষা পাগলের শোভা পায়! সদাশয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যেমন ভারতবাসীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা চাহে, এরূপ আকাঙ্ক্ষা পাগলেরই শোভা পায়! সদাশয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যেমন ভারতবাসীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা সহ্য করিতে চাহেন না–আমার মনে পড়ে প্রায় ২১ বৎসর পূর্বে মিস্টার মর্লি বলিয়াছিলেন, "যদি তাঁহারা চাঁদের জন্য আবদার করে (If they cry for the Moon), তাহা আমরা দিতে পারি না" ইত্যাদি এবং আমাদের অমুসলমান প্রতিবেশীগণ এখন সাধারণত যেরূপ মুসলমানদের দাবি দাওয়া সহ্য করিতে পারেন না, সেইরূপ মুসলমান পুরুষগণও নারীজাতির কোন প্রকার উন্নতির অভিলাষ স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু আল্লাহ কুদরত বা প্রকৃতির নিয়ম অতি চমৎকার! তিনি এ বিশ্ব জগৎকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন–আমরা পরস্পরের সহিত এরূপভাবে জড়িত আছি যে, একে অপরকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারি না। মুসলিম ভ্রাতৃগণ যতদিন আমাদের দুঃখ-সুখের প্রতি মনোযোগ না করিবেন, ততদিন তাঁহাদের কথাও ভারতের অপর ২২ কোটি লোকে শুনিবে না, আর যত দিন ঐ ২২ কোটি লোকে ৮ কোটি মুসলমানকে উপেক্ষা করিবে ততদিন পর্যন্ত তাঁহাদের রোদনও ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে না!!

মাসিক মোহাম্মদী, পৌষ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় বেগম রোকেয়ার রচিত 'উন্নতির পথে'। উক্ত প্রবন্ধে তিনি শালীনতা ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে নারীদের প্রগতির পথে এগিয়ে যাবার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রগতির নামে নগ্নতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও শালীনতা বিসর্জন তিনি ঘৃণার চোখেই দেখেছেন এবং নগ্নতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশালীনতা যে প্রগতির নয় এই কথাটিই তাঁর 'উন্নতির পথে' শীর্ষক রচনার মূল বক্তব্য।

...অতি প্রগতিশীলতা যে মানব সভ্যতাকে আরও পিছনের দিকে নিয়ে যাবে এর কথাই ধ্বনিত হয়েছে তার উক্ত রচনায়। প্রগতির যাত্রাপথে তরুণ সমাজ যখন দিগম্বর হয়ে গেল তখন তিনি মন্তব্য করেন :

তোমরা এখন আদি-মাতা হজরত হাওয়ার যুগে এসে পড়বে। আদি-পিতা অভিশপ্ত হয়ে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে গাছের তিনটা পাতা চেয়ে নিয়ে–একটায় তহবন্দ, একটা দিয়ে জামা আর একটা দিয়ে মাথা ঢাকবার টুপী করেছিলেন। আর আদি মাতা তাঁর লম্বা চুল খুলে দিয়ে সমস্ত গা ঢেকেছিলেন। কিন্তু এখনকার তরুণীদের মাথায় ত চুলও নেই–এরা কি দিয়ে গা ঢাকবে?"

জগতের অন্যান্য দেশের নারীদের মধ্যে জাগরণের লক্ষণ দর্শনে বেগম রোকেয়া আকুল হয়েছিলেন স্বসমাজের মুসলিম নারী জাগরণের স্পৃহার অভাব লক্ষ্য করে। তার শত চেষ্টা সত্ত্বেও মুসলিম নারী সুপ্তির ঘোরেই ছিল। তবুও আশাবাদী বেগম রোকেয়া নিরাশ না হয়ে তাদের মধ্যে মুক্তির চেতনা সঞ্চারণের উদ্দেশ্যে বলেন :

জাগো মাতা, ভগিনী, কন্যা–উঠ, শয্যা ত্যাগ করিয়া আইস; অগ্রসর হও। ঐ শুন, "মোয়াজ্জিন" আজান দিতেছেন। তোমরা কি ঐ আজান-ধ্বনি, আল্লাহর ধ্বনি শুনিতে পাও না? আর ঘুমাইও না; উঠ, এখন আর রাত্রি নাই, এখন সুবেহ্ সাদেক–মোয়াজ্জিন আজান দিতেছেন। যৎকালে সমগ্র জগতের নারীজাতি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহারা নানাবিধ সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে–তাহারা শিক্ষামন্ত্রী হইয়াছে, তাহারা ডাক্তার, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, যুদ্ধমন্ত্রী, প্রধানা সেনাধ্যক্ষা, লেখিকা, কবি ইত্যাদি ইত্যাদি হইতেছে–আমরা বঙ্গনারী গৃহ কারাগারে অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে পড়িয়া অঘোরে ঘুমাইতেছি আর যক্ষ্মা রোগে ভুগিয়া হাজারে হাজারে মরিতেছি।... । মাতা, ভাগনী, কন্যে! আর ঘুমাইও না,–উঠ কর্তব্য পথে অগ্রসর হও।

পুরুষের কাছে ভিক্ষা নয়, ক্রন্দন নয়–সুকঠোর প্রতিবাদ ও সংগ্রামের মাধ্যমেই নারীকে তার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাই নারী সমাজের প্রতি তাঁর আহ্বান ছিল আত্মসচেতন ও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার :

ভগিনীগণ! চক্ষু রগড়াইয়া জাগিয়া উঠুন–অগ্রসর হউন! বুক ঠুকিয়া বল মা! আমরা পশু নই; বল ভগিনী! আমরা আসবাব নই; বল কন্যে! আমরা জড়োয়া অলঙ্কার রূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বল, আমরা মানুষ! আর কার্যত দেখাও যে, আমরা সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ অংশের অর্ধেক। বাস্তবিক পক্ষে আমরাই সৃষ্টি জগতের মাতা। তোমরা নিজের দাবি-দাওয়া রক্ষা করিবার জন্য নিজেরাই বিবিধ সমিতি গঠন কর।

বেগম রোকেয়া যে শুধুমাত্র নারীদের অধঃপতিত ও অনুন্নত অবস্থার কথা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছিলেন তা নয়। সমাজের নিম্নশ্রেণীর দারিদ্র্য তাঁর দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে যেতে পারেনি–এর প্রমাণ পাই, যখন তিনি বলেন :

কেবল কলিকাতাটুকু আমাদের গোটা ভারতবর্ষ নহে এবং মুষ্টিমেয়, সৌভাগ্যশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি সমস্ত ভারতের অধিবাসী নহে।

চাষার দারিদ্র্য থেকে মুক্তির পথ হিসাবে তিনি দেশী শিল্প-বিশেষত কুটির শিল্পসমূহের পুনরুদ্ধারের জন্য আপন মত ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে তার মতামত ছিল নিম্নরূপ :

জেলায় জেলায় পাটের চাষ কম করিয়া তৎপরিবর্তে কার্পাষের চাষ প্রচুর পরিমাণে হওয়া চাই এবং চরকা ও এণ্ডি সুতার প্রচলন বহুল পরিমাণে হওয়া বাঞ্ছনীয়। আসাম এবং রংপুরবাসিনী ললনাগণ এণ্ডি পোকা প্রতিপালনে তৎপর হইলে সমগ্র বঙ্গদেশের বস্ত্র-ক্লেশ লাঘব হইবে। পল্লীগ্রামে সুশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হওয়া চাই। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা আর ঘরে চরকা ও টেকো হইলে চাষার দারিদ্র্য ঘুচিবে।

স্বদেশ শিল্পের পুনরুজ্জীবন কামনা করে বেগম রোকেয়া বলেন :

বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে খদ্দর কাপড়ের কি মূল্য ছিল? তাহা কেবল পশ্চিম অঞ্চলের কোল, সাঁওতাল, জোলা, ধুনিয়া প্রভৃতি লোকেরা ব্যবহার করিত। এখন ত খদ্দর আমাদের মাথায় উঠিয়াছে। এই সুবর্ণ সুযোগে খদ্দর, এন্ড্রি ও অপরাপর রেশমী বস্ত্রের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

বেগম রোকেয়ার সমকালীন বাঙালি মুসলিম সমাজে "আশরাফ ও আতরাফ" শ্রেণীর মধ্যে বিরাট ব্যবধান ছিল। সমাজে প্রচলিত এই শ্রেণীভেদ বেগম রোকেয়া দূর করতে চেয়েছিলেন। এবং এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি রচনা করেন "পয়ত্রিশ মণ খানা" শীর্ষক প্রবন্ধ। তিনি বলেন :

কিছুদিন হইল মাসিক "সওগাত"-এর কোন সংখ্যায় "আশরাফ ও আতরাফ" শীর্ষক একটি ছবি দেখিয়াছিলাম। ছবির বিষয় এই যে, আশরাফ ঘৃণায় নাক সিটকাইয়া আতরাফকে বলিতেছেন,–"তুমি দূরে থাক, আমার নিকট আসিও না।" আশরাফের এই ব্যবহারে বড্ড রাগ হইল–এত বড় অস্পর্ধা মানুষকে ঘৃণা! ইচ্ছা হইল, তখনই আশরাফদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া দেই। কিন্তু তাহাতে একটু অসুবিধা ছিল। অসুবিধা এই যে, আমি নিজে আশরাফ-এর তালিকায় নাম লিখিয়া ফেলিয়াছি। সুতরাং জেহাদ ঘোষণা করিলে যদি প্রথম তরবারি আমারই গলায় পড়ে তবে সে সমাজ-সংস্কারের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা সবই সাফ হইয়া যাইবে।

মতিচূর, দ্বিতীয় খণ্ডের 'মুক্তিফল' শীর্ষক রূপক কাহিনীতে আমরা বেগম রোকেয়ার দেশাত্মবোধের পরিচয় পাই। ভারতবর্ষের পরাদীনাবস্থার অবমাননা সম্পর্কে তিনি যে সচেতন ছিলেন এবং তিনি যে দেশের স্বাধীনতাকামী ছিলেন মতিচূর, দ্বিতীয় খণ্ডের 'জ্ঞানফল' ও 'মুক্তিফল' শীর্ষক রচনাতে এই চিন্তা-চেতনাই পরিস্ফুট হয়েছে। বেগম রোকেয়ার দেশাত্মবোধ তাঁর রচিত 'আপীল' শীর্ষক কবিতাতেও প্রতীয়মান। এটি একটি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা। বেগম রোকেয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে সুবিধাবাদী নরমপন্থী তথা উদারপন্থীদের সমালোচনা করে ১৩২৮ বঙ্গাব্দে উক্ত কবিতা রচনা করেন। সেই সময় ভারতীয় রাজনীতিতে উদারপন্থীদের সর্বদা নিজ স্বার্থের প্রতি বেশি সচেতন ছিল। বেগম রোকেয়া এই উদারপন্থী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সুবিধাবাদী ভূমিকার চরিত্র উদঘাটন করার প্রয়াসে লিখেন :

কারো কাছে জমিদারী,
কেহ বা উপাধিধারী,–
বাঙ্গালা বিহারে মোরা যত কিছু ধারী,–
সকলে মিলিয়া এই আবেদন করি।–

প্রাণে মরি সেও ভাল,
শতবার মৃত্যু ভাল,
লাঙ্গুল-বিরহ কিন্তু সহিতে না পারি!

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সক্রিয়কর্মী বিপ্লবী কানাইলালের ফাঁসীর আদেশকে উপলক্ষ করে বেগম রোকেয়া রচনা করেন 'নিরূপম বীর' নামক একটি কবিতা–যা দেশপ্রেমিক কানাইলালের প্রতি বেগম রোকেয়ার অসীম শ্রদ্ধার পরিচয় বহন করে। নিম্নে কবিতাটির অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো :

বিচারক বলে, "কানাই তোমার
গলায় পড়িবে ফাঁসি!"
শুনি' শ্যামলাল বেপরোয়া ভাবে
হাসিল ঘৃণার হাসি।
রাখিতে পরের পরান যে জন
দেয় নিজে বলিদান,
সে কি বিচলিত ফাঁসির আদেশে?
মৃত্যু তুচ্ছজ্ঞান।
* * *
যত কৃতঘ্ন হোক সংসার
তবু এ কানাই-স্মৃতি
ভারত-হৃদয় স্বর্ণাক্ষরে
জাগরূক র'বে নিতি!

আমরণ বেগম রোকেয়া সংগ্রাম করেন তাঁর সমাজের নারীমুক্তির লক্ষ্যে। বর্তমানকালে পুরুষের একাধিক বিবাহ পুরুষের তালাক প্রদানের যথেচ্ছ অধিকার ইত্যাদি ব্যাপারে সমাজ সচেতনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে মুসলিম নারী যে নিপীড়ন ও অন্যায়ের শিকার সে সম্পর্কেও বেগম রোকেয়া ছিল সচেতন। 'নারীর অধিকার' শীর্ষক প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমাধিকার দাবি জানান। মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা আগে তিনি উক্ত প্রবন্ধ লেখার কাজ শুরু করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেই অসমাপ্ত লেখা পেপার ওয়েটের নিচে দেখা গিয়েছিল। তাঁর চাচাতো বোন মরিয়াম রশীদ সেগুলি নিয়ে পরম যত্ন ও সতর্কতার সাথে রক্ষা করেছিলেন। এই অসমাপ্ত রচনায় স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর শেষ চিন্তাধারার দিশা–যে লেখা শুরু করে শেষ করবার সময় আর তিনি পেলেন না মহাকালের ডাকে। উক্ত অসমাপ্ত প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

আমাদের ধর্ম্মমতে বিবাহ সম্পূর্ণ হয় পাত্র-পাত্রীর সম্মতি দ্বারা। তাই খোদা না করুন, বিচ্ছেদ যদি আসে, তবে সেটা আসবে উভয়ের সম্মতিক্রমে। কিন্তু এটা কেন হয় এক-তরফা, অর্থাৎ শুধু স্বামী দ্বারা? অন্তত এইটে তো প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে দেখা যায়। আমাদের উত্তর-বঙ্গে দেখেছি, গৃহস্থ শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বদা তালাক হয়, অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে সামান্য অপরাধে পরিত্যাগ করে।

মেয়েটির কোন ত্রুটি হ'লেই স্বামী দম্ভ ভরে প্রচার করে, "আমি ওকে তালাক দেব, আজই দেব।"–স্বামী লোকটি তিনবার উচ্চারণ করে উচ্চস্বরে :

"আয়েন তালাক, বায়েন তালাক,
তালাক তালাক, তিন তালাক,
আজ জরুরে দিলাম তালাক।"

এই সময়ে পুরুষটিকে খুব প্রফুল্ল দেখা যায়। বোধ হয়, নূতন পত্নী লাভ হবে এই আনন্দে। কিন্তু মেয়েটি ভয়ানক কাঁদে।

বেগম রোকেয়ার সমসাময়িককালে আরও কয়েকজন মুসলিম মহিলা সাহিত্যিক সাহিত্যচর্চা করেছেন। কিন্তু নারীশিক্ষা, নারী-অধিকার ও সামাজিক সমস্যাবলী সম্পর্কে তাঁরা কেহই বেগম রোকেয়ার মতো নির্ভীক ও সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখতে সমর্থ হননি। এদের মধ্যে নূরন্নেসা ও খায়রুন্নেসার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

সাহিত্যিক নূরন্নেসা কয়েকটি উপন্যাস, প্রবন্ধ ও ছোটগল্প রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে স্বসমাজের নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সচেতনতাবোধ এবং সামাজিক কুপ্রথা, নারীর প্রতি সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কোনো প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় না। তিনি সমকালের ও পরিবেশের প্রভাব ও চিন্তাধারার বেশি ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হননি। স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মতবাদ আমাদের কাছে প্রাচীনপন্থী বলে মনে হয়। নারীর শিক্ষা গ্রহণ করা অপরিহার্য বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং এর অভাবকে তিনি সমাজের অনুন্নত অবস্থার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন বটে, তবে তিনি নারীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। সংসারের কাজকর্ম ও পর্দার অন্তরালে থেকে যতটুকু শিক্ষা লাভ করা সম্ভবপর ততটুকু শিক্ষা গ্রহণ করা নারীদের জন্য যথেষ্ট বলে তিনি মনে করেন। নারী-অধিকার অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও তাঁর বক্তব্য আমাদের কাছে প্রগতিশীল বলে মনে হয় না। বঙ্গীয় মোসলেম মহিলা সংঘের এক অধিবেশনে সভানেত্রী হিসাবে ভাষণদানকালে নূরন্নেসা বলেন :

অনেকে হয়ত মনে করবেন–তবে কি আমরা লেখাপড়া শিখে এখন থেকে সমাজের উন্নতির জন্য রাস্তায় হৈ হৈ করে বেড়াব, না অধুনাতন নারী Franchise এর আলো পেয়ে, অর্থ উপার্জনের উপায় উদ্ভাবনে পুরুষ সেজে অফিসের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ঢুঁ মারব? না। এই উদ্ভাবনীয় উপদেশ দিবার জন্য আমি আপনাদের নিকট আসি নাই। বরং আমার মনে হয়, শিক্ষা সে অর্থের জন্য নয়, এই কথাই আমাদের মনে দৃঢ়বিশ্বাস করে নিয়ে আমাদের কাজে নামতে হবে, আর সেই নামাটাই সফল হবে।

অথচ নারীশিক্ষা ও নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির সম্পর্কে মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন বেগম রোকেয়ার চিন্তাধারা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। নারীমুক্তির পূর্বশর্ত হিসাবে বেগম রোকেয়া নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি নারীর এই অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলেছেন 'ডেলিশিয়া হত্যা'য়। এছাড়া তাঁর রচিত উপন্যাস পদ্মরাগ-এর মূল বক্তব্য হচ্ছে নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি।

বেগম রোকেয়ার সমসাময়িককালের অন্যতম মহিলা সাহিত্যিক খায়রুন্নেসার লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ নবনূর পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এছাড়া স্বামী মৌলভী আসিরুদ্দীন সাহেবের নির্দেশে তিনি সতির পতিভক্তি নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে খায়রুন্নেসা সমাজের অনুন্নত অবস্থার জন্য চিরাচরিত ভূমিকার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে স্বামীকে মহৎ কাজে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার মধ্যে নিহিত রয়েছে নারীর গৌরব।

বেগম রোকেয়ার মধ্যে আমরা রাজা রামমোহন রায়ের যুক্তিবাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাবপ্রবণতা ও গভীর অনুভূতি লক্ষ্য করি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে বেগম রোকেয়া লেখনীর মাধ্যমে নারীমুক্তির সপক্ষে নির্ভীক ও প্রগতিশীল ভাবধারা প্রচার করেন। বাঙালি মুসলিম সমাজে তিনি সর্বপ্রথম সমাজে পুরুষের সাথে নারীর সমাধিকার দাবি উত্থাপন করেন। নারী স্বাধীনতার সপক্ষেও তিনি তাঁর শক্তিশালী লেখনী পরিচালনা করেন। নারীর উপর পুরুষের অন্যায় প্রভুত্বের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানান এবং সমাজে এক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। বেগম রোকেয়ার রচনাবলীতে বিবৃত তাঁর চিন্তাচেতনার ধারা পযালোচনা করে আমরা আরো অনুধাবন করি লেখিকারূপে তাঁর ভূমিকা প্রধানত নারী মুক্তিকামীরূপে চিহ্নিত হলেও স্বদেশের স্বাধীনতা, জাতীয়তাবাদ, সামাজিক শ্রেণীভেদ প্রভৃতি বিষয়েও তিনি সচেতন ছিলেন। তাঁর চিন্তাচেতনায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গভীর অনুভূতি, নির্ভীকতা, প্রগতিশীলতা, যুক্তিবাদ, মুক্তবুদ্ধি ও সমাজকে সংস্কার করার মানসিকতা। বেগম রোকেয়া ছিলেন তার সময়কালের একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ এবং তাঁর চিন্তাচেতনার ধারা বাঙালি মুসলিম সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে সমাজকে প্রগতিশীলতার পথে এগিয়ে নিয়েছিল এবং সূচনা করেছিল নারীর অধঃপতিত অবস্থা উন্নয়নের জন্য নারীমুক্তি আন্দোলন। তাঁর জীবনকালেই যে তাঁর চিন্তা-চেতনার ধারা বাঙালি মুসলিম সমাজকে প্রভাবিত করেছিল তাঁর স্বাক্ষর রয়েছে বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাসে। বেগম রোকেয়ার চিন্তা-চেতনার ধারা বিশ্লেষণে একথা আরো প্রতীয়মান হয় যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে যে রেনেসাঁস সূচিত হয়েছিল বাংলার মুসলিম সমাজে বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের প্রবর্তক বেগম রোকেয়া ছিলেন সেই রেনেসাঁসের একজন উত্তরাধিকারী।

বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন-চিন্তা-চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম, তহমিনা আলম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, অগ্রহায়ণ-১৪০৩/নভেম্বর-১৯৯৬ সংখ্যা অবলম্বনে সংকলিত।

স্ত্রীজাতির অবনতি

পাঠিকাগণ! আপনারা কি কোন দিন আপনাদের দুর্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যজগতে আমরা কি? দাসী! পৃথিবী হইতে দাস ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু আমাদের দাসত্ব গিয়াছে কি? না। আমরা দাসী কেন?— কারণ আছে।

আদিমকালের ইতিহাস কেহই জানে না বটে; তবু মনে হয় যে পুরাকালে যখন সভ্যতা ছিল না, সমাজবন্ধন ছিল না, তখন আমাদের অবস্থা এরূপ ছিল না। কোন অজ্ঞাত কারণবশত মানবজাতির এক অংশ (নর) যেমন ক্রমে নানাবিষয়ে উন্নতি করিতে লাগিল, অপর অংশ (নারী) তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেরূপ উন্নতি করিতে পারিল না বলিয়া পুরুষের সহচরী বা সহধর্মিণী না হইয়া দাসী হইয়া পড়িল।

আমাদের এ বিশ্বব্যাপী অধঃপতনের কারণ কেহ বলিতে পারেন কি? সম্ভবত সুযোগের অভাব ইহার প্রধান কারণ। স্ত্রীজাতি সুবিধা না পাইয়া সংসারের সকল প্রকার কার্য হইতে অবসর লইয়াছে। এবং ইহাদিগকে অক্ষম ও অকর্মণ্য দেখিয়া পুরুষজাতি ইহাদের সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল! ক্রমে পুরুষ পক্ষ হইতে যতই বেশি সাহায্য পাওয়া যাইতে লাগিল, স্ত্রী-পক্ষ ততই অধিকতর অকর্মণ্য হইতে লাগিল। এ দেশের ভিক্ষুদের সহিত আমাদের বেশ তুলনা হইতে পারে। একদিকে ধনাঢ্য দানবীরগণ ধর্মোদ্দেশ্যে যতই দান করিতেছেন, অন্যদিকে ততই অধম ভিক্ষুসংখ্যা বাড়িতেছে! ক্রমে ভিক্ষাবৃত্তি অলসদের একটা উপজীবিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আর তাহারা ভিক্ষা গ্রহণ করাটা লজ্জাজনক বোধ করে না।

ঐরূপ আমাদের আত্মাদর লোপ পাওয়ায় আমরাও অনুগ্রহ গ্রহণে আর সঙ্কোচ বোধ করি না। সুতরাং আমরা আলস্যের,—প্রকারান্তরে পুরুষের—দাসী হইয়াছি। ক্রমশ আমাদের মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হইয়া গিয়াছে। এবং আমরা বহুকাল হইতে দাসীপনা করিতে করিতে দাসত্বে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। এইরূপে আমাদের স্বাবলম্বন, সাহস প্রভৃতি মানসিক উচ্চবৃত্তিগুলি অনুশীলন অভাবে বারবার অঙ্কুরে বিনাশ হওয়ায় এখন আর বোধ হয় অঙ্কুরিতও হয় না। কাজেই পুরুষজাতি বলিতে সুবিধা পাইয়াছেন :

``The five worst maladies that afflict the female mind are : indocility, discontent, slander, jealousy and silliness...such is the stupidity of her character, that it is incumbent on her, in every particular, to distrust herself and to obey her husband." (Japan, the Land of the Rising Sun)

(ভাবার্থ—স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণের পাঁচটি দুরারোগ্য ব্যাধি এই—[কোন বিষয় শিক্ষার] অযোগ্যতা, অসন্তোষ, পরনিন্দা, হিংসা এবং মূর্খতা।...নির্বোধ স্ত্রীলোকের কর্তব্য যে প্রত্যেক বিষয়ে নিজেকে অবিশ্বাস করিয়া স্বামীর আদেশ পালন করে)।

তারপর কেহ বলেন "অতিরঞ্জন ও মিথ্যা বচন রমণী-জিহ্বার অলঙ্কার!" আমাদিগকে কেহ "নাকেস-উল্-আকেল্" এবং কেহ "যুক্তিজ্ঞানহীন" (unreasonable) বলিয়া থাকেন। আমাদের ঐ সকল দোষ আছে বলিয়া তাঁহারা আমাদিগকে হেয় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এরূপ হওয়া স্বাভাবিক। একটা উদাহরণ দেখুন। এ দেশে জামাতা খুব আদরণীয়—এমনকি ডাইনীও জামাই ভালবাসে। তবু "ঘরজামাইয়ের" সেরূপ আদর হয় না। তাই দেখা যায়, আমাদের যখন স্বাধীনতা ও অধীনতাজ্ঞান বা উন্নতি ও অবনতির যে প্রভেদ তাহা বুঝিবার সামর্থ্যটুকুও থাকিল না, তখন কাজেই তাঁহারা ভূস্বামী, গৃহস্বামী প্রভৃতি হইতে ক্রমে আমাদের "স্বামী" হইয়া উঠিলেন![১] আর আমরা ক্রমশ তাঁহাদের গৃহপালিত পশু-পক্ষীর অন্তর্গত অথবা মূল্যবান্ সম্পত্তি বিশেষ হইয়া পড়িয়াছে!

সভ্যতা ও সমাজবন্ধনের সৃষ্টি হইলে পর সামাজিক নিয়মগুলি অবশ্য সমাজপতিদের মনোমত হইল! ইহাও স্বাভাবিক। "জোর যার মুলুক তার"। এখন জিজ্ঞাসা করি, আমাদের অবনতির জন্য কে দোষী?

আর এই যে আমাদের অতিপ্রিয় অলঙ্কারগুলি—এগুলি দাসত্বের নিদর্শন বিশেষ! এখন ইহা সৌন্দর্যবর্দ্ধনের আশায় ব্যবহার করা হয় বটে; কিন্তু অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তির মতে অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন (originally badges of slavery) ছিল। তাই দেখা যায় কারাগারে বন্দীগণ পায় লৌহনির্মিত বেড়ি পরে, আমরা (আদরের জিনিস বলিয়া) স্বর্ণরৌপ্যের বেড়ি অর্থাৎ "মল" পরি। উহাদের হাতকড়ি লৌহ-নির্মিত, আমাদের হাতকড়ি স্বর্ণ বা রৌপ্য-নির্মিত চুড়ি! বলা বাহুল্য, লোহার বালাও বাদ দেওয়া হয় না! কুকুরের গলে যে গলাবন্ধ (dog-collar) দেশি, উহারই অনুকরণে বোধ হয় আমাদের জড়োয়া চিক নির্মিত হইয়াছে! অশ্ব হস্তী প্রভৃতি পশু লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ আমরা স্বর্ণ-শৃঙ্খলে কণ্ঠ শোভিত করিয়া মনে করি "হার পরিয়াছি"। গো-স্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া "নাকাদড়ি" পরায়, এ দেশে আমাদের স্বামী আমাদের নাকে "নোলক" পরাইয়াছেন!! ঐ নোলক হইতেছে "স্বামী"র অস্তিত্বের (সধবার) নিদর্শন! অতএব দেখিলেন ভগিনি! আপনাদের ঐ বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি দাসত্বের নিদর্শন ব্যতীত আর কি হইতে পারে? আবার মজা দেখুন, যাঁহার শরীরে দাসত্বের নিদর্শন যত অধিক, তিনি সমাজে ততোধিক মান্যা গণ্যা!

এই অলঙ্কারের জন্য ললনাকুলের কত আগ্রহ! যেন জীবনের সুখ সমৃদ্ধি উহারই উপর নির্ভর করে! তাই দরিদ্রা কামিনীগণ স্বর্ণরৌপ্যের হাতকড়ী না পাইয়া কাঁচের চুড়ি পরিয়া দাসী-জীবন সর্থক করে। যে (বিধবা) চুড়ি পরিতে অধিকারিণী নহে, তাহার মত হতভাগিনী যেন এ জগতে আর নাই! অভ্যাসের কি অপার মাহিমা! দাসত্বে অভ্যাস হইয়াছে বলিয়া দাসত্বসূচক গহনাও ভাল লাগে। অহিফেন তিক্ত হইলেও আফিংচির অতি প্রিয় সামগ্রী। মাদক দ্রব্যের যতই সর্বনাশ হউক না কেন, মাতাল তাহা ছাড়িতে চাহে না সেইরূপ আমরা অঙ্গে দাসত্বের নিদর্শন ধারণ করিয়াও আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করি— গর্বে স্ফীতা হই!

অলঙ্কার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহাতে কোন কোন ভগ্নী আমাকে পুরুষপক্ষেরই গুপ্তচর মনে করিতে পারেন। অর্থাৎ ভাবিবেন যে, আমি পুরুষদের টাকা স্বর্ণকারের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য হয়ত এরূপ কৌশলে ভগ্নীদিগকে অলঙ্কারে বীতশ্রদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তাহা নয়, আমি আপনাদের জন্যই দু'কথা বলিতে চাই। যদি অলঙ্কারের উদ্দেশ্য পুরুষদের টাকার শ্রাদ্ধ করাই হয়, তবে টাকার শ্রাদ্ধ করিবার অনেক উপায় আছে দুই একটি উপায় বলিয়া দিতেছি।

আপনার ঐ জড়োয়া চিকটা বাড়ির আদুরে কুকুরটির কণ্ঠে পরাইবেন। আপনি যখন শকটারোহণে বেড়াইতে যান, তখন সেই শকটবাহী অশ্বের গলে আপনার বহুমূল্য হার পরাইতে পারেন! বালা ও চুড়িগুলি বসিবার ঘরের পর্দার কড়া (drawing room Fr curtain fing) রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবেই "স্বামী" নামধারী নরবরের টাকার বেশ শ্রাদ্ধ হইবে!! অলঙ্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য ঐশ্বর্য দেখান বই ত নয়। ঐরূপে ঐশ্বর্য দেখাইবেন। নিজের শরীরের দাসত্বের নিদর্শন ধারণ করিবেন কেন? উক্ত প্রকারে গহনার সদ্ব্যবহার করিলে প্রথম প্রথম লোকে আপনাকে পাগল বলিবে, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য না করিলেই চলিবে। এ পোড়া সংসারে কোন্ ভাল কাজটা বিনা ক্লেশে সম্পাদিত হইয়াছে? "পৃথিবীর গতি আছে" এই কথা বলাতে মহাত্মা গ্যালিলিও (Galileo) কে বাতুলাগারে যাইতে হইয়াছিল। কোন্ সাধুলোকটি অনায়াসে নিজ বক্তব্য বলিতে পারিয়াছেন? তাই বলি, সমাজের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। এ জগতে ভাল কথা বা ভাল কাজের বর্তমানে আদর হয় না।

বাস্তবিক অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি অলঙ্কারকে দাসত্বের নিদর্শন না ভাবিয়া সৌন্দর্যবর্ধনের উপায় মনে করা যায়, তাহাই কি কম নিন্দনীয়? সৌন্দর্যবর্ধনের চেষ্টাও কি মানসিক দুর্বলতা নহে? পুরুষেরা ইহা পরাজয়ের নিদর্শন ভাবেন। তাঁহারা কোন বিষয় তর্ক করিতে গেলে বলেন, "আমার কথা প্রমাণিত করিতে না পারিলে আমি চুড়ি পরিব"! কবিবর সা'দী পুরুষদের উৎসাহিত করিবার জন্য বলিয়াছেন, "আয় মরদাঁ বকুশিদ্, জামা-এ-জানাঁ ন পুষিদ্"! অর্থাৎ "হে বীরগণ! (জয়ী হইতে) চেষ্টা কর, রমণীর পোশাক পরিও না।" আমাদের পোশাক পরিলে তাহাদের অপমান হয়! দেখা যাউক সে পোশাকটা কি,— কাপড় ত তাঁহাদের ও আমাদের প্রায় একই প্রকার। একখণ্ড ধুতি ও একখণ্ড শাড়ির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে কিছুমাত্র তারতম্য আছে কি? যে দেশে পুরুষ পা-জামা পরে, সে দেশে নারীও পা-জামা পরে। "Ladies's jacket" -না যায়, "Tentlemen's jacket" ও শুনিতে পাই! তবে "জামা-এ-জানাঁ" বলিলে কাপড় না বুঝাইয়া সম্ভবত রমণীসুলভ দুর্বলতা বুঝায়।

পুরুষজাতি বলেন, যে তাঁহারা আমাদিগকে "বুকের ভিতর বুক পাতিয়া বুক দিয়া ঢাকিয়া" রাখিয়াছেন, এবং এরূপ সোহাগ আমরা সংসারে পাইব না বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমরা তাই সোহাগে গলিয়া-ঢলিয়া বহিয়া যাইতেছি! ফলত তাঁহারা যে অনুগ্রহ করিতেছেন, তাহাতেই আমাদের সর্বনাশ হইতেছে। আমাদিগকে তাঁহারা হৃদয়-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া জ্ঞান-সূর্যালোক ও বিশুদ্ধ বায়ু হইতে বঞ্চিতা রাখিয়াছেন, তাহাতেই আমরা ক্রমশ মরিতেছি। তাঁহারা আরও বলেন, "তাহাদের সুখের সামগ্রী, আমরা মাথায় বহিয়া আনিয়া দিব— আমরা থাকিতে তাহারা দুঃখ সহ্য করিবে কেন?"

আমরা ঐ শ্রেণীর বক্তাকে তাঁহাদের অনুগ্রহপূর্ণ উক্তির জন্য ধন্যবাদ দিই; কিন্তু ভ্রাতঃ! পোড়া সংসারটা কেবল কবির সুখময়ী কল্পনা নহে– ইহা জটিল কুটিল কঠোর সংসার! সত্য বস্তু– কবিতা নহে :

"কব্য উপন্যাস নহে– এ মম জীবন,
নাট্যশালা নহে– ইহা প্রকৃত ভবন"–

তাই যা কিছু মুস্কিল!! নতুবা আপনাদের কৃপায় আমাদের কোন অভাব হইত না। বঙ্গবালা আপনাদের কল্পিত বর্ণনা অনুসারে "ক্ষীণাঙ্গী, কোমলাঙ্গী, অবলা, ভয়-বিহ্বলা–" ইত্যাদি হইতে হইতে ক্রমে সূক্ষ্ম শরীর (Aerial body) প্রাপ্ত হইয়া বাষ্পরূপে অনায়াসে আকাশে বিলীন হইতে পারিতেন!! কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তদ্রূপ সুখের নহে; তাই এখন মিনতি করিয়া বলিতে চাই :

"অনুগ্রহ করে এই কর, অনুগ্রহ কর না মোদের।"

বাস্তবিক অত্যাধিক যত্নে অনেক বস্তু নষ্ট হয়। যে কাপড় বহু যত্নে বন্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা উইএর ভোগ্য হয়। কবি বেশ বলিয়াছেন :

"কেন নিবে গেল বাতি?
আমি অধিক যতনে ঢেকেছিনু তারে,
জাগিয়া বাসর রাতি,
তাই নিবে গেল বাতি।"

সুতরাং দেখা যায়, তাঁহাদের অধিক যত্নই আমাদের সর্বনাশের কারণ।

বিপদসঙ্কুল সংসার হইতে সর্বদা সুরক্ষিতা আছি বলিয়া আমরা সাহস, ভরসা, বল একেবারে হারাইয়াছি। আত্মনির্ভর ছাড়িয়া স্বামীদের নিতান্ত মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি। সামান্য হইতে সামান্যতর বিপদে পড়িলে আমরা গৃহকোণে লুকাইয়া গগনভেদী আর্তনাদে রোদন করিয়া থাকি!! ভ্রাতৃমহোদয়গণ আবার আমাদের "নাকি কান্নার" কথা তুলিয়া কেমন বিদ্রূপ করেন, তাহা কে না জানে? আর সে বিদ্রূপ আমরা নীরবে সহ্য করি। আমরা কেমন শোচনীয়রূপে ভীরু হইয়া পড়িয়াছি, তাহা ভাবিলে ঘৃণায় লজ্জায় মৃতপ্রায় হই।

উপরোক্ত সংবাদ সত্য কি না, সেজন্য সেই পত্রিকাখানি দায়ী। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, তুরস্ক-রমণীদের ওরূপ আকাঙ্ক্ষা হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে। ইতিহাসে শুনা যায়, পূর্বে তাঁহারা যুদ্ধ করিতেন। একটা যেমন তেমন "মুসলমানী পুঁথি"র পাতা উল্টাইলেও আমরা দেখিতে পাই–(যুদ্ধ করিতে যাইয়া)–

"জয়গুণ নামে বাদশাহ্‌জাদী কয়েদ হইল যদি,
আর যত আরব্য সওয়ার" ইত্যাদি।

বলি, এ দেশের যে সমাজপতিগণ "লেডীকেরাণী" হওয়ার প্রস্তাব শুনিলে চমকাইয়া উঠেন (shocked হন)–যাঁহারা অবলার হস্তে পুতুল সাজান ও ফুলের মালা গাঁথা ব্যতীত আর কোন শ্রমসাধ্য কার্যের ভার দেওয়ার কল্পনাই করিতে পারেন না, তাঁহারা ঐ লেডীযোদ্ধা হওয়ার প্রস্তাব শুনিলে কি করিবেন? মূর্ছা যাইবেন না ত?

ব্যাঘ্র ভল্লুক ত দূরে থাকুক, আরসুলা জলৌকা প্রভৃতি কীট পতঙ্গ দেখিয়া আমরা ভীতিবিহ্বলা হই! এমনকি অনেকে মূর্ছিতা হন! একটি ৯/১০ বৎসরের বালক বোতলে আবদ্ধ একটি জলৌকা লইয়া বাড়িশুদ্ধ স্ত্রীলোকদের ভীতি উৎপাদন করিয়া আমোদ ভোগ করে। অবলাগণ চিৎকার করিয়া দৌড়াইতে থাকেন, আর বালকটি সহাস্যে বোতল হস্তে তাঁহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হয়। এমন তামাসা আপনারা দেখেন নাই কি? আমি দেখিয়াছি—আর সে কথা ভাবিয়া ঘৃণায় লজ্জায় মরমে মরিতেছি। সত্য কথা বলিতে কি, সে সময় বরং আমোদ বোধ করিয়াছিলাম; কিন্তু এখন সে কথা ভাবিলে শোণিত উত্তপ্ত হয়। হায়! আমরা শারীরিক বল, মানসিক সাহস, সব কাহার চরণে উৎসর্গ করিয়াছি? আর এই দারুণ শোচনীয় অবস্থা চিন্তা করিবার শক্তিও আমাদের নাই।

ভীরুতার চিত্র ত দেখাইলাম, এখন শারীরিক দুর্বলতার চিত্র দেখাইব। আমরা এমন জড় "অচেতন পদার্থ" হইয়া গিয়াছি যে, তাঁহাদের গৃহসজ্জা (drawing room এর ornament) বই আর কিছুই নহি। পাঠিকা! আপনি কখন বেহারের কোন ধনী মুসলমান ঘরের বউ-ঝী নামধেয় জড়পদার্থ দেখিয়াছেন কি? একটি বধূবেগম সাহেবার প্রতিকৃতি দেখাই। ইহাকে কোন প্রসিদ্ধ যাদুঘরে (museum এ) বসাইয়া রাখিলে রমণীজাতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হইত। একটা অন্ধকার কক্ষে দুইটি মাত্র দ্বার আছে, তাহার একটি রুদ্ধ এবং একটি মুক্ত থাকে। সুতরাং সেখানে (পর্দা র অনুরোধে?) বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্যরশ্মির প্রবেশ নিষেধ। ঐ কুঠরিতে পর্যঙ্কের পার্শ্বে যে রক্তবর্ণ বানাত মণ্ডিত তক্তপোষ আছে, তাহার উপর বহুবিধ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা, তাম্বুলরাগে রঞ্জিতাধরা, প্রসন্নাননা যে জড় পুত্তলিকা দেখিতেছেন, উহাই দুল্হিনবেগম (অর্থাৎ বেগমের পুত্রবধূ)"। ইঁহার সর্বাঙ্গে ১০২৪০ টাকার অলঙ্কার! শরীরের কোন্ অংশে কত ভরি সোনা বিরাজমান, তাহা সুস্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

১. মাথায় (সিঁথির অলঙ্কার) অর্ধ সের (৪০ ভরি)।

২. কর্ণে কিঞ্চিৎ অধিক এক পোয়া (২৫ ভরি)।

৩. কণ্ঠে দেড় সের (১২০ তোলা)।

৪. সুকোমল বাহুলতায় প্রায় দুই সের (১৫০ ভরি)।

৫. কটিদেশে প্রায় তিন পোয়া (৬৫ ভরি)।

৬. চরণযুগলে ঠিক তিন সের (২৪০ ভরি) স্বর্ণের বোঝা!!

বেগমের নাকে যে নথ দুলিতেছে, উহার ব্যাস সার্দ্ধ চারি ইঞ্চি! পরিহিত পা-জামা বেচারা সল্মা চুম্কির কারুকার্য ও বিবিধ প্রকারের জরির (গোটা পাট্টার) ভারে অবনত! আর পা-জামা ও দোপাট্টার (চাদরের) ভারে বেচারি বধূ ক্লান্ত!

ঐরূপ আট সের স্বর্ণের বোঝা লইয়া নড়াচড়া অসম্ভব, সুতরাং হতভাগী বধূবেগম জড়পদার্থ না হইয়া কি করিবেন? সর্বদাই তাঁহার মাথা ধরে; ইহার কারণ ত্রিবিধ— (১) সুচিক্কণ পাটি বসাইয়া কষিয়া কেশবিন্যাস, (২) বেণী ও সিঁথির উপর অলঙ্কারের বোঝা, (৩) অর্ধেক মাথায় আটা সংযোগে আফ্শাঁ (রৌপ্যচূর্ণ) ও চুম্কি বসান

হইয়াছে; ভ্রূযুগ চুম্‌কি দ্বারা আচ্ছাদিত। এবং কপালে রাঙ্গের বিচিত্র বর্ণের চাঁদ ও তারা আটা সংযোগে বসান হইয়াছে। শরীর যেমন জড়পিণ্ড, মন ততোধিক জড়।

এই প্রকার জড়পিণ্ড হইয়া জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম না করায় বেগমের স্বাস্থ্য একেবারে মাটি হয়। কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতে তাঁহার চরণদ্বয় শ্রান্ত ক্লান্ত ও ব্যথিত হয়। বাহুদ্বয় সম্পূর্ণ অকর্মণ্য। অজীর্ণ ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগ তাঁহার চিরসহচর। শরীরে স্ফূর্তি না থাকিলে মনেও স্ফূর্তি থাকে না। সুতরাং ইঁহাদের মন এবং মস্তিষ্ক উভয়ই চিররোগী। এমন স্বাস্থ্য লইয়া চিররোগী জীবন বহন করা কেমন কষ্টকর তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

ঐ চিত্র দেখিলে কি মনে হয়? আমরা নিজের ও অপরের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া চিন্তা করিলে যে শিক্ষালাভ করি, ইহাই প্রকৃত ধর্মোপদেশ। সময় সময় আমরা পাখি পাখি হইতে যে সদুপদেশ ও জ্ঞানলাভ করি, তাহা পুঁথিগত বিদ্যার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। একটি আতার পতন দর্শনে মহাত্মা নিউটন যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, সে জ্ঞান তৎকালিন কোন পুস্তকে ছিল না। ঐ বধূবেগমের অবস্থা চিন্তা করিতে গিয়া আমি আমাদের সামাজিক অবস্থার এই চিত্র আঁকিতে সক্ষম হইলাম! যাহা হউক, আমি উক্ত বধূবেগমের জন্য বড় দুঃখিত হইলাম, ভাবিলাম, "অভাগীর ইহলোক পরলোক—উভয়ই নষ্ট।" যদি ঈশ্বর হিসাব নিকাশ লয়েন যে, "তোমার মন, মস্তিষ্ক, চক্ষু প্রভৃতির কি সদ্ব্যবহার করিয়াছ?" তাহার উত্তরে বেগম কি বলিবেন? আমি তখন সেই বাড়ির একটি মেয়েকে বলিলাম, "তুমি যে হস্তপদ দ্বারা কোন পরিশ্রম কর না, এজন্য খোদার নিকট কি জওবাবদিহি (explanation) দিবে?" সে বলিল, "আপ্‌কা কহ্‌না ঠিক হ্যায়"—এবং সে যে সময় নষ্ট করে না, সতত চলা-ফেরা করে, আমাকে ইহাও জানাইল। আমি পুনরায় বলিলাম, "শুধু ঘুরাফেরা করিলেই ব্যায়াম হয় না। তুমি প্রতিদিন অন্তত আধঘণ্টা দৌড়াদৌড়ি করিও।" দৌড়াদৌড়ি কথাটার উত্তরে হাসির একটা গর্‌রা উঠিল। আমি কিন্তু ব্যথিত হইলাম, ভাবিলাম, "উল্টা বুঝ্‌লি রাম!" কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার শক্তিটুকুও ইহাদের নাই। আমাদের উন্নতির আশা বহুদূরে—ভরসা কেবল পতিতপাবন।

আমাদের শয়নকক্ষে যেমন সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রূপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না। যেহেতু আমাদের উপযুক্ত স্কুল কলেজ একপ্রকার নাই। পুরুষ যত ইচ্ছা অধ্যয়ন করিতে পারেন—কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞানরূপ সুধাভাণ্ডারের দ্বার কখনও সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইবে কি? যদি কোন উদারচেতা মহাত্মা দয়া করিয়া আমাদের হাত ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সহস্র জনে বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত করেন।

সহস্র জনের বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া একজনের কার্য নহে। তাই একটু আশার আলোক দীপ্তি পাইতে না পাইতে চির নিরাশার অন্ধকারে বিলীন হয়। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে অধিকাংশ লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে যে তাঁহারা "স্ত্রীশিক্ষা" শব্দ শুনিলেই "শিক্ষার কুফলের" একটা ভাবী বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্তা

মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোন কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারির ঐ "শিক্ষার" ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শত কণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে "স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার!"

আজি কালি অধিকাংশ লোকে শিক্ষাকে কেবল চাকরি লাভের পথ মনে করে। মহিলাগণের চাকরি গ্রহণ অসম্ভব সুতরাং এই সকল লোকের চক্ষে স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

ফাঁকা তর্কের অনুরোধে আবার কোন নেটিভ খ্রিস্টিয়ান হয়ত মনে করিবেন যে রমণীর জ্ঞান-পিপাসাই মানবজাতির অধঃপাতের কারণ! যেহেতু শাস্ত্রে (Genesis এ) দেখা যায়, আদিমাতা হাভা (Eve) জ্ঞানবৃক্ষের ফলভক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি এবং আদম উভয়েই স্বর্গচ্যুত হইয়াছেন।

যাহা হউক "শিক্ষা"র অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষে "অন্ধ-অনুকরণ" নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা (faculty) দিয়াছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি (develop) করাই শিক্ষা। ঐ গুণের সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ। ঈশ্বর আমাদিগকে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মনঃ এবং চিন্তাশক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা হস্তপদ সবল করি, হস্ত দ্বারা সৎকার্য করি, চক্ষু দ্বারা মনোযোগ সহকারে দর্শন (বা observe) করি, কর্ণ দ্বারা মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করি, এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে শিখি—তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আমরা কেবল "পাস করা বিদ্যা"কে প্রকৃত শিক্ষা বলি না। দর্শনশক্তির বৃদ্ধি বা বিকাশ সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দিতেছি :

যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু ধূলি, কর্দম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না, সেখানে (বিজ্ঞানের) শিক্ষিত চক্ষু অনেক মনোরম চমৎকার বস্তু দেখিতে পায়। আমাদের পদদলিত যে কাদাকে আমরা কেবল মাটি, বালি, কয়লার কালি ও জলমিশ্রিত পদার্থ বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করি, বিজ্ঞানবিদ্ তাহা বিশ্লিষ্ট করিলে নিম্নলিখিত বস্তু চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইবেন। যথা—বালুকা বিশ্লেষণ করিলে সাদা পাথর বিশেষ (opal); কর্দম পৃথক করিলে চিনে বাসন প্রস্তুত করণোপযোগী মৃত্তিকা, অথবা নীলকান্তমণি; পাথর-কয়লার কালি দ্বারা হীরক! এবং জল দ্বারা একবিন্দু নীহার! দেখিলেন, ভগিনী! যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু কর্দম দেখে, সেখানে শিক্ষিত চক্ষু হীরা মাণিক দেখে! আমরা যে এহেন চক্ষুকে চির-অন্ধ করিয়া রাখি, এজন্য খোদার নিকট কি উত্তর দিব?

মনে করুন আপনার দাসীকে আপনি একটা সম্মার্জনী দিয়া বলিলেন, "যা, আমার অমুক বাড়ি পরিষ্কার রাখিস্।" দাসী সম্মার্জনীটা আপনার দান মনে করিয়া অতি যত্নে জরির ওয়াড়ে ঢাকিয়া উচ্চস্থানে তুলিয়া রাখিল—কোন কালে ব্যবহার করিল না। এদিকে আপনার বাড়ি ক্রমে আবর্জনাপূর্ণ হইয়া বাসের অযোগ্য হইল! অতঃপর আপনি যখন দাসীর কার্যের হিসাব লইবেন, তখন বাড়ির দুরবস্থা দেখিয়া আপনার মনে কি হইবে? শতমুখী ব্যবহার করিয়া বাড়ি পরিষ্কার রাখিলে আপনি খুশি হইবেন, না তাহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিলে সন্তুষ্ট হইবেন?

বিবেক আমাদিগকে আমাদের প্রকৃত অবনতি দেখাইয়া দিতেছে—এখন উন্নতির চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য।

আমাদের উচিত যে স্বহস্তে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করি। এক স্থলে আমি বলিয়াছি "ভরসা কেবল প্রতিতপাবন" কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, ঊর্ধে হস্ত উত্তোলন না করিলে পতিতপাবনও হাত ধরিয়া তুলিবেন না। ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন যে নিজে নিজের সাহায্য করে, ("God helps those that help themselves")। তাই বলি আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোল আনা উপকার হইবে না।

অনেকে মনে করেন যে পুরুষের উপার্জিত ধন ভোগ করে বলিয়া নারী তাহার প্রভুত্ব সহ্য করে। কথাটা অনেক পরিমাণে ঠিক। বোধ হয় স্ত্রীজাতি প্রথমে শারীরিক শ্রমে অক্ষম হইয়া পরের উপার্জিত ধনভোগে বাধ্য হয়। এবং সেইজন্য তাহাকে মস্তক নত করিতে হয়। কিন্তু এখন স্ত্রীজাতির মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হওয়ায় দেখা যায়, যে স্থলে দরিদ্রা স্ত্রীলোকেরা সূচিকর্ম বা দাসীবৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া পতি পুত্র প্রতিপালন করে, সেখানেও ঐ অকর্মণ্য পুরুষেরাই "স্বামী" থাকে। আবার যিনি স্বয়ং উপার্জন না করিয়া প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করেন, তিনিও ত স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব করেন! এবং স্ত্রী তাঁহার প্রভুত্বে আপত্তি করেন না। ইহার কারণ এই যে বহুকাল হইতে নারীহৃদয়ের উচ্চবৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায় নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই "দাসী" হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর আমাদের হৃদয়ে স্বাধীনতা, ওজস্বিতা বলিয়া কোন বস্তু নাই— এবং তাহা লাভ করিবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত লক্ষিত হয় না! তাই বলিতে চাইঃ

"অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনি!"

প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, জানি; সমাজ মহা গোলযোগ বাধাইবে জানি; ভারতবাসী মুসলমান আমাদের জন্য "কৎল" এর (অর্থা প্রাণদণ্ডের) বিধান দিবেন এবং হিন্দু চিতানল বা তুষানলের ব্যবস্থা দিবেন, জানি! (এবং ভগ্নিদিগেরও জাগিবার ইচ্ছা নাই, জানি! কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতে হইবেই। বলিয়াছি ত কোন ভাল কাজ অনায়াসে করা যায় না। কারামুক্ত হইয়াও গ্যালিলিও বলিয়াছিলেন, কিন্তু যাহাই হউক পৃথিবী ঘুরিতেছে ("but nevertheless it (Earth) does move")!! আমাদিগকেও ঐরূপ বিবিধ নির্যাতন সহ্য করিয়া জাগিতে হইবে। এস্থলে পার্সী নারীদের একটি উদাহরণ দিতেছি। নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তি এক খণ্ড উর্দু সংবাদপত্র হইতে অনূদিত হইল :

এই পঞ্চাশ বর্ষের মধ্যে পার্সী মহিলাদের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বিলাতী সভ্যতা, যাহা তাঁহারা এখন লাভ করিয়াছেন, পূর্বে ইহার নাম মাত্র জানিতেন না। মুসলমানদের ন্যায় তাঁহারাও পর্দায় (অর্থাৎ অন্তঃপুরে) থাকিতেন। রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাঁহারা ছত্র ব্যবহারে অধিকারিণী ছিলেন না। প্রখর রবির উত্তাপ সহিতে না পারিলে জুতাই ছত্ররূপে ব্যবহার করিতেন!! গাড়ির ভিতর বসিলেও তাহাতে পর্দা থাকিত। অন্যের সম্মুখে স্বামীর সহিত আলাপ করিতে পাইতেন না। কিন্তু আজিকালি পার্সী মহিলাগণ পর্দা ছাড়িয়াছেন! খোলা গাড়িতে বেড়াইয়া থাকেন। অন্যান্য পুরুষের সহিত আলাপ করেন। নিজেরা ব্যবসায় (দোকানদারী) করেন।

প্রথমে যখন কতিপয় ভদ্রলোক তাঁহাদের স্ত্রীকে (পর্দা র) বাহির করিয়াছিলেন, তখন চারিদিকে ভীষণ কলরব উঠিয়াছিল। ধবলকেশ বুদ্ধিমানগণ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর ধ্বংসকাল উপস্থিত হইল"!

কই পৃথিবী ত ধ্বংস হয় নাই। তাই বলি, একবার একই সঙ্গে সকলে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হও,—সময়ে সবই সহিয়া যাইবে। স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা বুঝিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কি করিলে লুপ্ত রত্ন উদ্ধার হইবে? কি করিলে আমরা দেশের উপযুক্ত কন্যা হইব? প্রথমতঃ সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সংকল্প আবশ্যক। এবং আমরা গোলামজাতি নই, এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডীকেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডীম্যাজিস্ট্রেট, লেডীব্যারিস্টার, লেডীজজ—সবই হইব! পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী Viceroy হইয়া এ দেশের সমস্ত নারীকে "রাণী" করিয়া ফেলিব!! উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা "স্বামী"র গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?

আবার ইহাও বলি, লেডীকেরাণী হওয়ার কথা কেবল বঙ্গদেশে যেমন shocking বোধ হয়, সেরূপ অন্যত্র বোধ হয় না। আমেরিকায় লেডীকেরাণী বা লেডীব্যারিস্টার প্রভৃতি বিরল নহে। এবং এমন একদিনও ছিল, যখন অন্যান্য দেশের মুসলমানসমাজে "স্ত্রীদার্শনিক, স্ত্রী ঐতিহাসিক, স্ত্রীবৈজ্ঞানিক, স্ত্রীবক্তা, স্ত্রীচিকিৎসক, স্ত্রীরাজনীতিবিদ্" প্রভৃতি কিছুরই অভাব ছিল না। কেবল বঙ্গীয় মোসলেমসমাজে ওরূপ রমণীরত্ন নাই।

আমরা যদি রাজকীয় কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব। ভারতে বর দুর্লভ হইয়াছে বলিয়া কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন? কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক। কার্য্যক্ষেত্রেও পুরুষের পরিশ্রমের মূল্য বেশি, নারীর কাজ সস্তায় বিক্রয় হয়। নিম্নশ্রেণীর পুরুষ যে কাজ করিলে মাসে ২ বেতন পায়, ঠিক সেই কাজে স্ত্রীলোকে ১ পায়। চাকরের খোরাকি মাসিক ৩ আর চাকরাণীর খোরাকী ২। অবশ্য কখন কখন স্ত্রীলোককে পারিশ্রমিক বেশি পাইতেও দেখা যায়।

যদি বল, আমরা দুর্বলভুজা, মূর্খ, হীনবুদ্দি নারী। সে দোষ কাহার? আমাদের। আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহুলতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয় না? এখন একবার জ্ঞানচর্চা করিয়া দেখি ত এ অনুর্বর মস্তিষ্ক (dull head) সুতীক্ষ্ণ হয় কি না!

পরিশেষে বলি, আমরা সমাজেরই অর্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর

চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে—একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা—উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে—সর্বত্র আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক। প্রথমতঃ উন্নতির পথে তাঁহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন—আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। এখন তাঁহারা উন্নতিরাজ্যে গিয়া দেখিতেছেন সেখানে তাঁহাদের সঙ্গিনী নাই বলিয়া তাঁহারা একাকী হইয়া আছেন! তাই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেছেন! এবং জগতের যে সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন। আমাদের উচিত যে তাঁহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী সহকর্মিণী সহধর্মিণী ইত্যাদি হইয়া তাঁহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্মণ্য পুতুল জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, একথা নিশ্চিত।

ভরসা করি আমাদের সুযোগ্য ভগ্নীগণ এ বিষয়ে আলোচনা করিবেন। আন্দোলন না করিলেও একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

নিরীহ বাঙ্গালি

আমরা দুর্বল নিরীহ বাঙ্গালি। বাঙ্গালি শব্দে কেমন সুমধুর তরল কোমল ভাব প্রকাশ হয়। আহা! এই অমিয়াসিক্ত বাঙ্গালি কোন্ বিধাতা গড়িয়াছিলেন? কুসুমের সৌকুমার্য, চন্দ্রের চন্দ্রিকা, মধুর মাধুরী, যূথিকার সৌরভ, সুপ্তির নীরবতা, ভূধরের অচলতা, নবনীর কোমলতা, সলিলে তরলতা—এক কথায় বিশ্বজগতের সমুদয় সৌন্দর্য এবং স্নিগ্ধতা লইয়া বাঙ্গালি গঠিত হইয়াছে! আমাদের নামটি যেমন শ্রুতিমধুর তদ্রূপ আমাদের সমুদয় ক্রিয়াকলাপও সহজ ও সরল।

আমরা মূর্তিমতী কবিতা—যদি ভারতবর্ষকে ইংরাজি ধরণের একটি অট্টালিকা মনে করেন, তবে বঙ্গদেশ তাহার বৈঠকখানা (drawing room) এবং বাঙ্গালি তাহাতে সাজসজ্জা (drawing room suit)! যদি ভারতবর্ষকে একটি সরোবর মনে করেন, তবে বাঙ্গালি তাহাতে পদ্মিনী! যদি ভারতবর্ষকে একখানা উপন্যাস মনে করেন, তবে বাঙ্গালি তাহাতে পদ্মিনী! যদি ভারতবর্ষকে একখানা উপন্যাস মনে করেন, তবে বাঙ্গালি তাহার নায়িকা! ভারতের পুরুষসমাজে বাঙ্গালি পুরুষিকা!! অতএব আমরা মূর্তিমান কাব্য।

আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলি,—পুঁইশাকের ডাঁটা, সজিনা ও পুঁটি মৎস্যের ঝোল—অতিশয় সরস। আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলি,—ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, ছানা, নবনীত, ক্ষীর, সর, সন্দেশ ও রসগোল্লা—অতিশয় সুস্বাদু। আমাদের দেশের প্রধান ফল, আম্র ও কাঁঠাল—রসাল এবং মধুর। অতএব আমাদের খাদ্যসামগ্রী ত্রিগুণাত্মক—সরস, সুস্বাদু, মধুর।

খাদ্যের গুণ অনুসারে শরীরের পুষ্টি হয়। তাই সজিনা যেমন বীজবহুল, আমাদের দেহে তেমনই ভুঁড়িটি স্থূল। নবনীতে কোমলতা অধিক, তাই আমাদের স্বভাবের ভীরুতা অধিক। শারীরিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন; এখন পোশাক পরিচ্ছদের কথা বলি।

আমাদের বর অঙ্গ যেমন তৈলসিক্ত নবনিগঠিত সুকোমল, পরিধেয়ও তদ্রূপ অতি সূক্ষ্ম শিমলার ধুতি ও চাদর। ইহাতে বায়ু সঞ্চলনের (Ventilation এর) কোন বাধা বিঘ্ন হয় না! আমরা সময় সময় সভ্যতার অনুরোধে কোট শার্ট ব্যবহার করি বটে, কারণ পুরুষমানুষের সবই সহ্য হয়। কিন্তু আমাদের অর্ধাঙ্গী—হেমাঙ্গী, কৃষ্ণাঙ্গিগণ তদনুকরণে ইংরাজললনাদের নিলজ্জ পরিচ্ছদ (শেমিজ জ্যাকেট) ব্যবহার করেন না। তাঁহারা অতিশয় সুকুমারী ললিতা লজ্জাবতী লতিকা, তাই অতি মসৃণ ও সূক্ষ্ম "হাওয়ার শাড়ি" পরেন! বাঙ্গালির সকল বস্তুই সুন্দর, স্বচ্ছ ও সহজলব্ধ।

বাঙ্গালির গুণের কথা লিখিতে হইলে অনন্ত মসী, কাগজ ও অক্লান্ত লেখকের আবশ্যক। তবে সংক্ষেপে দুই চারিটা গুণের বর্ণনা করি।

ধনবৃদ্ধির দুই উপায়, বাণিজ্য ও কৃষি। বাণিজ্য আমাদের প্রধান ব্যবসায়। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা (আরব্যোপন্যাসের) সিন্দবাদের ন্যায় বাণিজ্যপোত অনিশ্চিত ফললাভের আশায় অনন্ত অপার সাগরে ভাসাইয়া দিয়া নৈরাশ্যের ঝঞ্ঝাবাতে ওতপ্রোত হই না। আমরা ইহাকে (বাণিজ্য) সহজ ও স্বল্পায়াসসাধ্য করিয়া লইয়াছি। অর্থাৎ বাণিজ্য ব্যবসায়ে যে কঠিন পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা বর্জন করিয়াছি। এইজন্য আমাদের দোকানে প্রয়োজনীয় জিনিস নাই, শুধু বিলাসদ্রব্য—নানাবিধ কেশতৈল ও নানাপ্রকার রোগবর্ধক ঔষধ এবং রাঙা পিত্তলের অলঙ্কার, নকল হীরার আংটি, বোতাম ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ মজুদ আছে। ঈদৃশ ব্যবসায়ে কায়িক পরিশ্রম নাই। আমরা খাঁটি সোনা রূপা বা হীরা জওয়াহেরাৎ রাখি না, কারণ টাকার অভাব। বিশেষত আজি কালি কোন্ জিনিসটার নকল না হয়?

যখনই কেহ একটু যত্ন পরিশ্রম স্বীকারপূর্বক "দীর্ঘকেশী" তৈল প্রস্তুত করেন, অমনই আমরা তদনুকরণে "হ্রস্বকেশী" তৈল আবিষ্কার করি। যদি কেহ "কৃষ্ণকেশী" তৈল বিক্রয় করেন, তবে আমরা "শুভ্রকেশী" বাহির করি। "কুন্তলীনের" সঙ্গে "কেশলীন" বিক্রয় হয়। বাজারে "মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী" ঔষধ আছে, "মস্তিষ্ক উষ্ণকারী" দ্রব্যও আছে। এক কথায় বলি, যত প্রকারের নকল ও নিষ্প্রয়োজনীয় জিনিস হইতে পারে, সবই আছে। আমরা ধান্য তণ্ডুলের ব্যবসায় করি না, কারণ তাহাতে পরিশ্রম আবশ্যক।

আমাদের অন্যতম ব্যবসায়—পাস বিক্রয়। এই পাস বিক্রেতার নাম "বর" এবং ক্রেতাকে "শ্বশুর" বলে। এক একটি পাসের মূল্য কত জান? "অর্ধেক রাজত্ব ও এক রাজকুমারী"। এম, এ, পাস অমূল্যরত্ন, ইহা যে সে ক্রেতার ক্রেয় নহে। নিতান্ত সস্তা দরে বিক্রয় হইলে, মূল্য—এক রাজকুমারি এবং সমুদয় রাজত্ব। আমরা অলস, তরলমতি, শ্রমকাতর, কোমলাঙ্গ বাঙ্গালি কিনা তাই ভাবিয়া দেখিয়াছি, সশরীরে পরিশ্রম করিয়া মুদ্রালাভ করা অপেক্ষা Old fool শ্বশুরের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করা সহজ!

এখন কৃষিকার্যের কথা বলি। কৃষি দ্বারা অন্নবৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি কৃষিবিভাগের কার্য (Agriculture) করা অপেক্ষা মস্তিষ্ক উর্বর (Brain culture) করা সহজ। অর্থাৎ কর্কশ উর্বর ভূমি কর্ষণ করিয়া ধান্য উৎপাদন করা অপেক্ষা মুখস্থ বিদ্যার জোরে অর্থ উৎপাদন করা সহজ। এবং কৃষিকার্যে পারদর্শিতা

প্রদর্শন করা অপেক্ষা কেবল M.R.A.C পাস করা সহজ! আইনচর্চ্চা করা অপেক্ষা কৃষি বিষয়ে জ্ঞানচর্চা করা কঠিন। অথবা রৌদ্রের সময় ছত্র হস্তে কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শনের জন্য ইতস্তত ভ্রমণ করা অপেক্ষা টানাপাখার তলে আরাম কেদারায় বসিয়া দুর্ভিক্ষ সমাচার (Famine Report) পাঠ করা সহজ। তাই আমরা অন্নোৎপাদনের চেষ্টা না করিয়া অর্থ উৎপাদনে সচেষ্ট আছি। আমাদের অর্থের অভাব নাই, সুতরাং অন্নকষ্টও হইবে না! দরিদ্র হতভাগা সব অন্নাভাবে মরে মরুক, তা'তে আমাদের কি?

আমরা আরও অনেক প্রকার সহজ কার্য নির্বাহ করিয়া থাকি। যথা :

(১) রাজ্য স্থাপন করা অপেক্ষা "রাজা" উপাধি লাভ সহজ।

(২) শিল্পকার্যে পারদর্শী হওয়া অপেক্ষা B. Sc. S D. Sc. পাস করা সহজ।

(৩) অল্প বিস্তর অর্থব্যয়ে দেশে কোন মহৎ কার্য দ্বারা খ্যাতি লাভ করা অপেক্ষা "খাঁ বাহাদুর" বা "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভের জন্য অর্থ ব্যয় করা সহজ।

(৪) প্রতিবেশী দরিদ্রদের শোক দুঃখে ব্যথিত হওয়া অপেক্ষা বিদেশীয় বড় লোকদের মৃত্যুদুঃখে "শোক সভার" সভ্য হওয়া সহজ।

(৫) দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য পরিশ্রম করা অপেক্ষা আমেরিকার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করা সহজ।

(৬) স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান হওয়া অপেক্ষা স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ঔষধ ও ডাক্তারের হস্তে জীবন সমর্পণ করা সহজ।

(৭) স্বাস্থ্যের উন্নতি দ্বারা মুখশ্রীর প্রফুল্লতা ও সৌন্দর্য বর্ধন করা (অর্থাৎ Healthy & cheerful হওয়া) অপেক্ষা (শুষ্কগণ্ডে!) কালিডোর, মিল্ক অভ রোজ ও ভিনোলিয়া পাউডার (Kalydore, milk of rose ও Vinolia powder) মাখিয়া সুন্দর হইতে চেষ্টা করা সহজ।

(৮) কাহারও নিকট প্রহার লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ বাহু বলে প্রতিশোধ লওয়া অপেক্ষা মানহানির মোকদ্দমা করা সহজ ইত্যাদি।

তারপর আমরা মূর্তিমান আলস্য—আমাদের গৃহিণীগণ এ বিষয়ে অগ্রণী। কেহ কেহ শ্রীমতীদিগকে স্বহস্তে রন্ধন করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু বলি, আমরা যদি রৌদ্রতাপ সহ্য করিতে না পারি, তবে আমাদের অর্ধাঙ্গীগণ কিরূপে অগ্নির উত্তাপ সহিবেন? আমরা কোমলাঙ্গ—তাঁহারা কোমলাঙ্গী; আমরা পাঠক, তাঁহারা পাঠিকা, আমরা লেখক, তাঁহারা লেখিকা। অতএব আমরা পাচক না হইলে তাঁহারা পাচিকা হইবেন কেন? সুতরাং যে লক্ষ্মীছাড়া দিব্যাঙ্গনাদিগকে রন্ধন করিতে বলে, তাহার ত্রিবিধ দণ্ড হওয়া উচিত। যথা তাহাকে (১) তুষানলে দগ্ধ কর, অতঃপর (২) জবেহ্ কর, তারপর (৩) ফাঁসী দাও!!

আমরা সকলেই কবি—আমাদের কাব্যে বীররস অপেক্ষা করুণরস বেশি। আমাদের এখানে লেখক অপেক্ষা লেখিকার সংখ্যা বেশি। তাই কবিতার স্রোতে বিনা কারণে অশ্রুপ্রবাহ বেশি বহিয়া থাকে। আমরা পদ্য লিখিতে বসিলে কোন্ বিষয়টা বাদ দিই? "ভগ্ন শূর্প", "জীর্ণ কাঁথা", "পুরাতন চটিজুতা"—কিছুই পরিত্যজ্য নহে। আমরা আবার কত নূতন শব্দের সৃষ্টি করিয়াছি; যথা—"অতি শুভ্রনীলাম্বর", "সাশ্রুসজলনয়ন"

ইত্যাদি। শ্রীমতীদের করুণ বিলাপ-প্রলাপপূর্ণ পদ্যের "অশ্রুজলের" বন্যায় বঙ্গদেশ ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছে! সুতরাং দেখিতেছেন, আমরা সকলেই কবি।

আর আত্মপ্রশংসা কত করিব? এখন উপসংহার করি।

অর্ধাঙ্গী

কোন রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমে রোগের অবস্থা জানা আবশ্যক। তাই অবলাজাতির উন্নতির পথ আবিষ্কার করিবার পূর্বে তাদের অবনতির চিত্র দেখাইতে হয়। আমি "স্ত্রীজাতির অবনতি" শীর্ষক প্রবন্ধে ভগিনীদিগকে জানাইয়াছি যে, আমাদের একটা রোগ আছে—দাসত্ব। সে রোগের কারণ এবং অবস্থা কতক পরিমাণে ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। এক্ষণে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব, সেই রোগ হওয়ায় আমাদের সামাজিক অবস্থা কেমন বিকৃত হইয়াছে। ঔষধ পথ্যের বিধান স্থানান্তরে দেওয়া হইবে।

এইখানে গোঁড়া পর্দা প্রিয় ভগ্নীদের অবগতির জন্য দু-একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক বোধ করি। আমি অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হই নাই। কেহ যদি আমার "স্ত্রীজাতির অবনতি" প্রবন্ধে পর্দা বিদ্বেষ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য দেখিতে না পান, তবে আমাকে মনে করিতে হইবে আমি নিজের মনোভাব উত্তমরূপে ব্যক্ত করিতে পারি নাই, অথবা তিনি প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন নাই।

সে প্রবন্ধে প্রায় সমগ্র নারীজাতির উল্লেখ আছে। সকল সমাজের মহিলাগণই কি অবরোধে বন্দিনী থাকেন? অথবা তাঁহারা পর্দা নশীন নহেন বলিয়া কি আমি তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ উন্নত বলিয়াছি? আমি মানসিক দাসত্বের (enslaved মনের) আলোচনা করিয়াছি।

কোন একটা নূতন কাজ করিতে গেলে সমাজ প্রথমতঃ গোলযোগ উপস্থিত করে, এবং পরে সেই নূতন চাল চলন সহিয়া লয়, তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ পার্সী মহিলাদের পরিবর্তিত অবস্থার উল্লেখ করিয়াছি। পূর্বে তাঁহারা ছত্রব্যবহারেরও অধিকারিণী ছিলেন না, তারপর তাঁহাদের বাড়াবাড়িটা সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে, তবু ত পৃথিবী ধ্বংস হয় নাই। এখন পার্সী মহিলাদের পর্দা মোচন হইয়াছে সত্য, কিন্তু মানসিক দাসত্ব মোচন হইয়াছে কি? অবশ্যই হয় নাই। আর ঐ যে পর্দা ছাড়িয়াছেন, তাহা দ্বারা তঁহাদের স্বকীয় বুদ্ধিবিবেচনার ত কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। পার্সী পুরুষগণ কেবল অন্ধভাবে বিলাতী সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া স্ত্রীদিগকে পর্দা র বাহিরে আনিয়াছেন। ইহাতে অবলাদের জীবনীশক্তির ত কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না—তাঁহারা যে জড়পদার্থ, সেই জড়পদার্থই আছেন। পুরুষ যখন তাঁহাদিগকে অন্তঃপুরে রাখিতেন, তাঁহারা তখন সেইখানে থাকিতেন। আবার পুরুষ যখন তাঁহাদের "নাকের দড়ি" ধরিয়া টানিয়া তাঁহাদিগকে মাঠে বাহির করিয়াছেন, তখনই তাঁহারা পর্দা র বাহির হইয়াছে! ইহাতে রমণীকুলের বাহাদুরি কি? ঐরূপ পর্দা-বিরোধ কখনই প্রশংসনীয় নহে।

কলম্বস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তখন লোকে তাঁহাকে বাতুল বলে নাই কি? নারী আপন স্বত্ব-স্বামিত্ব বুঝিয়া আপনাকে নরের ন্যায় শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে চাহে, ইহাও বাতুলতা বই আর কি?

পুরুষগণ স্ত্রীজাতির প্রতি যতটুকু সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারি না। লোকে কালী, শীতলা প্রভৃতি রাক্ষস-প্রকৃতির দেবীকে ভয় করে, পূজা করে, সত্য। কিন্তু সেইরূপ বাঘিনী, নাগিনী, সিংহী প্রভৃতি "দেবী"ও কি ভয় ও পূজা লাভ করে না? তবেই দেখা যায় পূজাটা কে পাইতেছেন,—রমণী কালী, না রাক্ষসী নৃমুণ্ডমালিনী?

নারীকে শিক্ষা দিবার জন্য গুরুলোকে সীতা দেবীকে আদর্শরূপে দেখাইয়া থাকেন। সীতা অবশ্যই পর্দা নশীন ছিলেন না। তিনি রামচন্দ্রের অর্ধাঙ্গী, রাণী, প্রণয়িনী এবং সহচরী। আর রামচন্দ্র প্রেমিক, ধার্মিক—সবই। কিন্তু রাম সীতার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, একটি পুতুলের সঙ্গে কোন বালকের যে সম্বন্ধ, সীতার সঙ্গে রামের সম্বন্ধও প্রায় সেইরূপ। বালক ইচ্ছা করিলে পুতুলকে প্রাণপণে ভালবাসিতে পারে; পুতুল হারাইলে বিরহে অধীর হইতে পারে; পুতুলের ভাবনায় অনিদ্রায় রজনী যাপন করিতে পারে; পুতুলটা যে ব্যক্তি চুরি করিয়াছিল, তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হইতে পারে; হারান পুতুল ফিরিয়া পাইলে আহলাদে আটখানা হইতে পারে; আবার বিনা কারণে রাগ করিয়াও পুতুলটা কাদায় ফেলিয়া দিতে পারে,—কিন্তু পুতুল বালকের কিছুই করিতে পারে না, কারণ হস্তপদ থাকা সত্ত্বেও পুত্তলিকা অচেতন পদার্থ! বালক তাহার পুতুল স্বেচ্ছায় অনলে উৎসর্গ করিতে পারে, পুতুল পুড়িয়া গেল দেখিয়া ভূমে লুটাইয়া ধূলি-ধূসরিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে পারে!!

রামচন্দ্র "স্বামিত্বের" ষোল আনা পরিচয় দিয়াছেন!! আর সীতা?—কেবল প্রভু রামের সহিত বনযাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাঁহারও ইচ্ছা প্রকাশের শক্তি আছে। রাম বেচারা অবোধ বালক, সীতার অনুভব শক্তি আছে, ইহা তিনি বুঝিতে চাহেন নাই, কেন না, বুঝিয়া কার্য করিতে গেলে স্বামিত্বটা পূর্ণমাত্রায় খাটান যাইত না!

আচ্ছা, দেশ কালের নিয়মানুসারে কবির ভাষায় স্বর মিলাইয়া না হয় মানিয়া লই যে, আমরা স্বামীর দাসী নহি—অর্ধাঙ্গী। আমরা তাঁহাদের গৃহে গৃহিণী, মরণে (না হয়, অন্তত তাঁহাদের চাকরি উপলক্ষে যথা তথা) অনুগামিনী, সুখ দুঃখে সমভাগিনী, ছায়াতুল্য সহচরী ইত্যাদি।

কিন্তু কলিযুগে আমাদের ন্যায় অর্ধাঙ্গী লইয়া পুরুষগণ কিরূপ বিকলাঙ্গ হইয়াছেন, তাহা কি কেহ একটু চিন্তাচক্ষে দেখিয়াছেন? আক্ষেপের (অথবা "প্রভু"দের সৌভাগ্যের!) বিষয় যে, আমি চিত্রকর নহি—নতুবা এই নারীরূপ অর্ধাঙ্গ লইয়া তাঁহাদের কেমন অপরূপ মূর্তি হইয়াছে, তাহা আঁকিয়া দেখাইতাম।

শুক্লকেশ বুদ্ধিমানগণ বলেন যে, আমাদের সাংসারিক জীবনটা দ্বিচক্র শকটের ন্যায়—ঐ শকটের এক চক্রপতি, অপরটি পত্নী। তাই ইংরাজি ভাষায় কথায় কথায় স্ত্রীকে অংশিণী (``partner") উত্তমার্ধ (``better half") ইত্যাদি বলে। জীবনের কর্তব্য অতি গুরুতর, সহজ নহে :

"সুকঠিন গার্হস্থ্য ব্যাপার
সুশৃঙ্খলে কে পারে চালাতে?
রাজ্যশাসনের রীতি নীতি
সূক্ষ্মভাবে রয়েছে ইহাতে।"

বোধ হয় এই গার্হস্থ্য ব্যাপারটাকে মস্তকস্বরূপ কল্পনা করিয়া শাস্ত্রকারগণ পতি ও পত্নীকে তাহার অঙ্গস্বরূপ বলিয়াছেন। তবে দেখা যাউক বর্তমান যুগে সমাজের মূর্তিটা কেমন।

মনে করুন কোন স্থানে পূর্বদিকে একটি মহৎ দর্পণ আছে, যাহাতে আপনি আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে পারেন। আপনার দক্ষিণাঙ্গভাগ পুরুষ এবং বামাঙ্গভাগ স্ত্রী। এই দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখুন :

আপনার দক্ষিণ বাহু দীর্ঘ (ত্রিশ ইঞ্চি) এবং স্থূল, বামবাহু দৈর্ঘ্যে চব্বিশ ইঞ্চি এবং ক্ষীণ। দক্ষিণ চরণ দৈর্ঘ্যে ১২ ইঞ্চি, বাম চরণ অতিশয় ক্ষুদ্র। দক্ষিণ স্কন্ধ উচ্চতায় পাঁচ ফিট, বাম স্কন্ধ উচ্চতায় চারি ফিট! (তবেই মাথাটা সোজা থাকিতে পারে না, বাম দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে! কিন্তু আবার দক্ষিণ কর্ণভারে বিপরীত দিকেও একটু ঝুঁকিয়াছে!) দক্ষিণ কর্ণ হস্তিকর্ণের ন্যায় বৃহৎ, বাম কর্ণ রাসভকর্ণের ন্যায় দীর্ঘ! দেখুন!—ভাল করিয়া দেখুন, আপনার মূর্তিটা কেমন!! যদি এ মূর্তিটা অনেকের মনোমত না হয়, তবে দ্বিচক্র শকটের গতি দেখাই। যে শকটের এক চক্র বড় (পতি) এবং এক চক্র ছোট (পত্নী) হয়, সে শকট অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে না; সে কেবল একই স্থানে (গৃহকোণেই) ঘুরিতে থাকিবে। তাই ভারতবাসী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না।

সমাজের বিধি ব্যবস্থা আমাদিগকে তাহাদের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিয়াছে; তাঁহাদের সুখ দুঃখ এক প্রকার, আমাদের সুখ দুঃখ অন্য প্রকার। এস্থলে বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "নবদম্পতীর প্রেমালাপ" কবিতার দুই চারি ছত্র উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম—

"বর। কেন সখি কোণে কাঁদিছ বসিয়া?
"কনে। পুষি মেনিটিরে ফেলিয়া এসেছি ঘরে।

*

"বর। কি করিছ বনে কুঞ্জভবনে?
"কনে। খেতেছি বসিয়া টোপা কুল।

*

"বর। জগৎ ছানিয়া, কি দিব আনিয়া জীবন করি ক্ষয়?
তোমা তরে সখি, বল করিব কি?
"কনে। আরো কুল পাড় গোটা ছয়।

*

"বর। বিরহের বেলা কেমনে কাটিবে?
"কনে। দেব পুতুলের বিয়ে!"

সুতরাং দেখা যায় কন্যাকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় না, যাহাতে সে স্বামীর ছায়াতুল্যা সহচরী হইতে পারে। প্রভুদের বিদ্যার গতির সীমা নাই, স্ত্রীদের বিদ্যার দৌড় সচরাচর "বোধোদয়" পর্যন্ত!

স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন একটা বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ (সেলাই করিবার জন্য) মাপেন! স্বামী যখন কল্পনা-সাহায্যে সুদূর আকাশে গ্রহনক্ষত্রমালা বেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন, সূর্যমণ্ডলের ঘনফল তুলাদণ্ডে ওজন করেন এবং ধূমকেতুর গতি নির্ণয় করেন, স্ত্রী যখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, চাউল ডাল ওজন করেন এবং রাঁধুনীর গতি নির্ণয় করেন। বলি জ্যোতির্বেত্তা মহাশয়, আপনার পার্শ্বে আপনার সহধর্মিণী কই? বোধ হয়, গৃহিণী যদি আপনার সঙ্গে সূর্যমণ্ডলে যান, তবে তথায় পঁহুছিবার পূর্বেই পথিমধ্যে উত্তাপে বাষ্পীভূত হইয়া যাইবেন! তবে সেখানে গৃহিণীর না যাওয়াই ভাল!!

অনেকে বলেন, স্ত্রীলোকদের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নাই। মেয়েরা চর্ব্য, চোষ্য রাঁধিতে পারে, বিবিধ প্রকার সেলাই করিতে পারে, দুই চারি খানা উপন্যাস পাঠ করিতে পারে, ইহাই যথেষ্ট। আর বেশি আবশ্যক নাই। কিন্তু ডাক্তার বলেন যে আবশ্যক আছে, যেহেতু মাতার দোষ গুণ লইয়া পুত্রগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়। এইজন্য দেখা যায় যে, আমাদের দেশে অনেক বালক শিক্ষকের বেত্রতাড়নায় কণ্ঠস্থ বিদ্যার জোরে এফ. এ. বি. এ. পাস হয় বটে; কিন্তু বালকের মনটা তাহার মাতার সহিত রান্নাঘরেই ঘুরিতে থাকে! তাহাদের বিদ্যাপরীক্ষায় এ কথার সত্যতার উপলব্ধি হইতে পারে।

আমার জনৈক বন্ধু তাঁহার ছাত্রকে উত্তর দক্ষিণ প্রভৃতি দিঙ্‌নির্ণয়ের কথা (cardinal points) বুঝাইতেছিলেন। শেষে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "যদি তোমার দক্ষিণ হস্ত পশ্চিমে এবং বাম হস্ত পূর্বে থাকে, তবে তোমার মুখ কোন্ দিকে হইবে?" উত্তর পাইলেন "আমার পশ্চাৎ দিকে!"

যাঁহারা কন্যার ব্যায়াম করা অনাবশ্যক মনে করেন, তাঁহারা দৌহিত্রকে হৃষ্টপুষ্ট "পাহলওয়ান" দেখিতে চাহেন কি না? তাঁহাদের দৌহিত্র ঘুষিটা খাইয়া থাপড়টা মারিতে পারে, এরূপ ইচ্ছা করেন কি না? যদি সেরূপ ইচ্ছা করেন, তবে বোধ হয়, তাঁহারা সুকুমারী গোলাপ-লতিকায় কাঁঠাল ফলাইতে চাহেন!! আর যদি তাঁহারা ইচ্ছা করেন যে দৌহিত্রও বলিষ্ঠ না হয়, বরং পয়জার পেটা হইয়া নত মস্তকে উচ্চৈঃস্বরে বলে, "মাৎ মারো! চোট্ লাগ্‌তা হায়!!" এবং পয়জার লাভ শেষ হইলে দূরে গিয়া প্রহারকর্তাকে শাসাইয়া বলে যে, "কায় মার্‌তা থা? হাম নালিশ করেগা!" তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে আমার বক্তব্য বুঝাইতে অক্ষম।

খ্রিস্টিয়ান সমাজে যদিও স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট সুবিধা আছে, তবু রমণী আপন স্বত্ব ষোল আনা ভোগ করিতে পায় না। তাহাদের মন দাসত্ব হইতে মুক্তি পায় না। স্বামী ও স্ত্রী কতক পরিমাণে জীবনের পথে পাশাপাশি চলিয়া থাকেন বটে; কিন্তু প্রত্যেক উত্তমার্ধই (Better half) তাঁহার অংশীর (partener এর) জীবনে আপন জীবন মিলাইয়া তন্ময়ী হইয়া যান না। স্বামী যখন ঋণজালে জড়িত হইয়া ভাবিয়া ভাবিয়া মরমে মরিতেছেন, স্ত্রী যখন একটা নূতন টুটির (bonnet এর) চিন্তা করিতেছেন! কারণ

তাঁহাকে কেবল মূর্তিমতী কবিতা হইতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—তাই তিনি মনোরমা কবিতা সাজিয়া থাকিতে চাহেন। ঋণদায়রূপ গদ্য (prosaic) অবস্থা তিনি বুঝিতে অক্ষম।

এখন মুসলমান সমাজে প্রবেশ করা যাউক। মুসলমানের মতে আমরা পুরুষের "অর্ধেক", অর্থাৎ দুইজন নারী একজন নরের সমতুল্যা। অথবা দুইটি ভ্রাতা ও একটি ভগিনী একত্র হইলে আমরা "আড়াই জন" হই! আপনারা "মুহম্মদীয় আইনে" দেখিতে পাইবেন যে বিধান আছে, পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্ধেক ভাগ পাইবে। এ নিয়মটি কিন্তু পুস্তকেই সীমাবদ্ধ। যদি আপনারা একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কোন ধনবান মুসলমানের সম্পত্তি বিভাগ করা দেখেন, কিম্বা জমিদারী পরিদর্শন করিতে যান, তবে দেখিবেন কার্যত কন্যার ভাগে শূন্য (০) কিংবা যৎসামান্য পড়িতেছে।

আমি এখন অপার্থিব সম্পত্তির কথা বলিব। পিতার স্নেহ, যত্ন ইত্যাদি অপার্থিব সম্পত্তি। এখানেও পক্ষপাতিতার মাত্রা বেশি। ঐ যত্ন, স্নেহ, হিতৈষিতার অর্ধেকই আমরা পাই কই? যিনি পুত্রের সুশিক্ষার জন্য চারি জন শিক্ষক নিযুক্ত করেন, তিনি কন্যার জন্য দুইজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন কি? যেখানে পুত্র তিনটা (বি. এ. পর্যন্ত) পাস করে, সেখানে কন্যা দেড়টা পাস (এন্ট্রাসি পাস ও এফ, এ, ফেল্) করে কি? পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা করা যায় না, বালিকাদের বিদ্যালয় সংখ্যায় পাওয়াই যায় না! যে স্থলে ভ্রাতা "শমস্-উল্-ওলামা" সে স্থলে ভগিনী "নজম্-উল্-ওলামা" হইয়াছেন কি? তাঁহাদের অন্তঃপুর গগনে অসংখ্য "নজমন্নেসা" "শম্সন্নেসা" শোভা পাইতেছেন বটে। কিন্তু আমরা সাহিত্য-গগনে "নজম্-উল্-ওলামা" দেখিতে চাই!

আমাদের জন্য এ দেশে শিক্ষার বন্দোবস্ত সচরাচর এইরূপ—প্রথমে আরবীয় বর্ণমালা, অতঃপর কোরান শরীফ পাঠ। কিন্তু শব্দগুলির অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া হয় না, কেবল স্মরণশক্তির সাহায্যে টিয়াপাখির মত আবৃত্তি কর। কোন পিতার হিতৈষণার মাত্রা বৃদ্ধি হইলে, তিনি দুহিতাকে "হাফেজা" করিতে চেষ্টা করেন। সমুদয় কোরানখানি যাঁহার কণ্ঠস্থ থাকে, তিনিই "হাফেজ।" আমাদের আরবী শিক্ষা ঐ পর্যন্ত! পারস্য এবং উর্দু শিখিতে হইলে, প্রথমেই "করিমা ববখশা এবর্ হালেমা" এবং একেবারে (উর্দু) "বানাতন্ নাশ্" পড়! একে আকার ইকার নাই, তাতে আবার আর কোন সহজপাঠ্য পুস্তক পূর্বে পড়া হয় নাই সুতরাং কাঠের গতি দ্রুতগামী হয় না।

অনেকের ঐ কয়খানি পুস্তক পাঠ শেষ হওয়ার পূর্বেই কন্যা-জীবন শেষ হয়। বিবাহ হইলে বালিকা ভাবে, "যাহা হোক, পড়া হইতে রক্ষা পাওয়া গেল!" কোন কোন বালিকা রন্ধন ও সূচীকর্মে সুনিপুণা হয়। বঙ্গদেশেও বালিকাদিগকে রীতিমত বঙ্গভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না। কেহ কেহ উর্দু পড়িতে শিখে, কিন্তু কলম ধরতে শিখে না। ইহাদের উন্নতির চরম সীমা সল্মা চুমকির কারুকার্য, উলের জুতা মোজা ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা পর্যন্ত।

যদি ধর্মগুরু মোহাম্মদ (দ) আপনাদের হিসাব নিকাশ লয়েন যে, "তোমরা কন্যার প্রতি কিরূপ ন্যায় ব্যবহার করিয়াছ?" তবে আপনারা কি বলিবেন?

পয়গম্বরদের ইতিহাসে শুনা যায়, জগতে যখনই মানুষ বেশি অত্যাচার অনাচার করিয়াছে, তখনই এক-একজন পয়গম্বর আসিয়া দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করিয়াছেন। আরবে স্ত্রীজাতির প্রতি অধিক অত্যাচার হইতেছিল; আরববাসিগণ কন্যা হত্যা করিতেছিল তখন হযরত মোহাম্মদ (দ) কন্যাকুলের রক্ষকস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তিনি কেবল বিবিধ ব্যবস্থা দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, স্বয়ং কন্যা পালন করিয়া আদর্শ দেখাইয়াছেন। তাঁহার জীবন ফাতেমাময় করিয়া দেখাইয়াছেন—কন্যা কিরূপ আদরণীয়া। সে আদর, সে স্নেহ জগতে অতুল।

আহা! তিনি নাই বলিয়া আমাদের এ দুর্দশা। তবে আইস ভগিনীগণ! আমরা সকলে সমস্বরে বলি :

"করিমা ববখ্শা এবর্ হালেমা!" করিম (ঈশ্বর) অবশ্যই কৃপা করিবেন। যেহেতু "সাধনায় সিদ্ধি।" আমরা "করিমের" অনুগ্রহলাভের জন্য যত্ন করিলে অবশ্যই তাঁহার করুণা লাভ করিব। আমরা ঈশ্বর ও মাতার নিকট ভ্রাতাদের "অর্ধেক" নহি। তাহা হইলে এইরূপ স্বাভাবিক বন্দোবস্ত হইত—পুত্র যেখানে দশ মাস স্থান পাইবে, দুহিতা সেখানে পাঁচ মাস! পুত্রের জন্য যতখানি দুগ্ধ আমদানি হয়, কন্যার জন্য তাহার অর্ধেক! সেরূপ ত নিয়ম নাই! আমরা জননীর স্নেহ মমতা ভ্রাতার সমানই ভোগ করি। মাতৃহৃদয়ে পক্ষপাতিতা নাই। তবে কেমন করিয়া বলিব, ঈশ্বর পক্ষপাতী? তিনি কি মাতা অপেক্ষা অধিক করুণাময় নহেন?

আমি এবার রন্ধন ও সূচিকার্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে আবার যেন কেহ মনে না করেন যে আমি সূচিকর্ম ও রন্ধনশিক্ষার বিরোধী। জীবনের প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু অন্নবস্ত্র; সুতরাং রন্ধন ও সেলাই অবশ্যই শিক্ষণীয়। কিন্তু তাই বলিয়া জীবনটাকে শুধু রান্নাঘরেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নহে।

স্বীকার করি যে, শারীরিক দুর্বলতাবশত নারীজাতি অপর জাতির সাহায্যে নির্ভর করে। তাই বলিয়া পুরুষ "প্রভু" হইতে পারে না। কারণ জগতে দেখিতে পাই, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট কোন না কোন প্রকার সাহায্য প্রার্থনা করে, যেন একে অপরের সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারে না। তরুলতা যেমন বৃষ্টির সাহায্য-প্রার্থী, মেঘও সেইরূপ তরুর সাহায্য চায়। জল বৃদ্ধির নিমিত্ত নদী বর্ষার সাহায্য পায়, মেঘ আবার নদীর নিকট ঋণী। তবে তরঙ্গিণী কাদম্বিনীর "স্বামী", না কাদম্বিনী তরঙ্গিণীর "স্বামী"? এ স্বাভাবিক নিয়মের কথা ছাড়িয়া কেবল সামাজিক নিয়মে দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা তাহাই দেখি।

কেহ সূত্রধর, কেহ তন্তুরায় ইত্যাদি। একজন ব্যারিস্টার ডাক্তারের সাহায্য-প্রার্থী, আবার ডাক্তারও ব্যারিষ্টারের সাহায্য চাহেন। তবে ডাক্তারকে ব্যারিস্টারের স্বামী বলিব, না ব্যারিস্টার ডাক্তারের স্বামী? যদি ইঁহাদের কেহ কাহাকে "স্বামী" বলিয়া স্বীকার না করেন, তবে শ্রীমতীগণ জীবনের চিরসঙ্গী শ্রীমান্‌দিগকে "স্বামী" ভাবিবেন কেন?

আমরা উত্তমার্ধ (better halves) তাঁহারা নিকৃষ্টার্ধ (worse halves), আমরা অর্ধাঙ্গী, তাঁহারা অর্ধাঙ্গ। অবলার হাতেও সমাজের জীবন-মরণের কাটি আছে, যেহেতু "না জাগিলে সব ভারত-ললনা" এ ভারত আর জাগিতে পারিবে না। প্রভুদের ভীরুতা

কিম্বা তেজস্বিতা জননীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে কেবল শারীরিক বলের দোহাই দিয়া অদূরদর্শী ভ্রাতৃমহোদয়গণ যেন শ্রেষ্ঠত্বের দাবি না করেন।

আমরা পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষা ও অনুশীলনের সম্যক সুবিধা না পাওয়ায় পশ্চাতে পড়িয়া আছি। সমান সুবিধা পাইলে আমরাও কি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিতাম না? আশৈশব আত্মনিন্দা শুনিতেছি, তাই এখন আমরা অন্ধভাবে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করি, এবং নিজেকে অতি তুচ্ছ মনে করি। অনেক সময় "হাজার হোক্ ব্যাটা ছেলে!" বলিয়া ব্যাটা ছেলেদের দোষ ক্ষমা করিয়া অন্যায় প্রশংসা করি। এই ত ভুল।

আমি ভগিনীদের কল্যাণ কামনা করি, তাঁহাদের ধর্মবন্ধন বা সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে বাহির করিতে চাহি না। মানসিক উন্নতি করিতে হইলে হিন্দুকে হিন্দুত্ব বা খ্রিস্টানকে খ্রিস্টানী ছাড়িতে হইবে এমন কোন কথা নাই। আপন আপন সম্প্রদায়ের পার্থক্য রক্ষা করিয়াও মনটাকে স্বাধীনতা দেওয়া যায়। আমরা যে কেবল উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে অবনত হইয়াছি, তাই বুঝিতে ও বুঝাইতে চাই।

অনেকে হয়ত ভয় পাইয়াছেন যে, বোধ হয় একটা পত্নীবিদ্রোহের আয়োজন করা হইতেছে। অথবা ললনাগণ দলে দলে উপস্থিত হইয়া বিপক্ষকে রাজকীয় কার্যক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিয়া সেই পদগুলি অধিকার করিবেন—শামলা, চোগা, আইন কানুনের পাঁজি পুঁথি লুঠিয়া লইবেন! অথবা সদলবলে কৃষিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কৃষকগুলিকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের শস্যক্ষেত্র দখল করিবেন, হাল গরু কাড়িয়া লইবেন, তবে তাঁহাদের অভয় দিয়া বলিতে হইবে—নিশ্চিন্ত থাকুন।

পুরুষগণ আমাদিগকে সুশিক্ষা হইতে পশ্চাৎপদ রাখিয়াছেন বলিয়া আমরা অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছি। ভারতে ভিক্ষু ও ধনবান—এই দুই দল লোক অলস; এবং ভদ্রমহিলার দল কর্তব্য অপেক্ষা অল্প কাজ করে। আমাদের আরাম-প্রিয়তা খুব বাড়িয়াছে। আমাদের হস্ত, পদ, মন, চক্ষু ইত্যাদির সদ্ব্যবহার করা হয় না। দশজন রমণীরত্ন একত্র হইলে ইহার উহার বিশেষত আপন আপন অর্ধাঙ্গের নিন্দা কিংবা প্রশংসা করিয়া বাক্‌পটুতা দেখায়। আবশ্যক হইলে কোন্দলও চলে।

আশা করি এখন "স্বামী" স্থলে "অর্ধাঙ্গ" শব্দ প্রচলিত হইবে।

সুগৃহিণী

ইতঃপূর্বে আমি "স্ত্রীজাতির অবনতি" প্রবন্ধে আমাদের প্রকৃত অবস্থার চিত্র দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি কিন্তু সত্য কথা সর্বদাই কিঞ্চিৎ শ্রুতিকটু বলিয়া অনেকে উহা পছন্দ করেন নাই। অতঃপর "অর্ধাঙ্গী" প্রবন্ধে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, নারী ও নর উভয়ে একই বস্তুর অঙ্গবিশেষ। যেমন একজনের দুইটি হাত কিংবা কোন শকটের দুইটি চক্র, সুতরাং উভয়ে সমতুল্য, অথবা উভয়ে মিলিয়া একই বস্তু হয়। তাই একটিকে ছাড়িয়া অপরটি সম্পূর্ণ উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না। একচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তিকে লোকে কানা বলে।

যাহা হউক আধ্যাত্মিক সমকক্ষতার ভাষা যদি স্ত্রীলোকেরা না বুঝেন, তবে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বা উচ্চভাবের কথায় কাজ নাই। আজি আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? বোধ হয় আপনারা সমস্বরে বলিবেন :

"সুগৃহিণী হওয়া"

বেশ কথা। আশাকরি আপনারা সকলেই সুগৃহিণী হইতে ইচ্ছা করেন, এবং সুগৃহিণী হইতে হইলে যে যে গুণের আবশ্যক, তাহা শিক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টাও করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত আপনাদের অনেকেই প্রকৃত সুগৃহিণী হইতে পারেন নাই। কারণ আমাদের বিশেষ জ্ঞানের আবশ্যক, তাহা আমরা লাভ করিতে পারি না। সমাজ আমাদের উচ্চশিক্ষা লাভ করা অনাবশ্যক মনে করেন। পুরুষ বিদ্যালাভ করেন অন্ন উপার্জনের আশায়, আমরা বিদ্যালাভ করিব কিসের আশায়? অনেকের মত আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার প্রয়োজন নাই। যেহেতু আমাদিগকে অন্নচিন্তা করিতে হয় না, সম্পত্তি রক্ষার্থে মোকদ্দমা করিতে হয় না, চাকরিলাভের জন্য সার্টিফিকেট ভিক্ষা করিতে হয় না, "নবাব" "রাজা" উপাধিলাভের জন্য শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের খোসামোদ করিতে হয় না, কিংবা কোন সময়ে দেশরক্ষার্থে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে না। তবে আমরা উচ্চশিক্ষা লাভ (অথবা *Mental* culture) করিব কিসের জন্য? আমি বলি, সুগৃহিণী হওয়ার নিমিত্তই সুশিক্ষা (*Mental* culture) আবশ্যক।

এই যে গৃহিণীদের ঘরকন্নার দৈনিক কার্যগুলি, ইহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্যও ত বিশেষ জ্ঞান বুদ্ধির প্রয়োজন। চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই সমাজের হর্ত্রী কর্ত্রী ও বিধাত্রী, তাঁহারাই সমাজের গৃহলক্ষ্মী, ভগিনী এবং জননী।

ঘরকন্নার কাজগুলি প্রধানত এই :

(ক) গৃহ এবং গৃহসামগ্রী পরিষ্কার ও সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখা।

(খ) পরিমিত ব্যয়ে সুচারুরূপে গৃহস্থালী সম্পন্ন করা।

(গ) রন্ধন ও পরিবেশন।

(ঘ) সূচিকর্ম।

(ঙ) পরিজনদিগকে যত্ন করা।

(চ) সন্তানপালন করা।

এখন দেখা যাউক ঐ কার্যগুলি এ দেশে কিরূপ হইয়া থাকে এবং কিরূপ হওয়া উচিত। আমরা ধনবান্ এবং নিঃস্বদিগকে ছাড়িয়া মধ্যম অবস্থার লোকের কথা বলিব।

গৃহখানা পরিষ্কার ও অল্পব্যয়ে সুন্দর রূপে সাজাইয়া রাখিতে হইলে বুদ্ধির দরকার। প্রথমে গৃহনির্মাণের সময়ই গৃহিণীকে স্বীয় সলিকা (taste) দেখাইতে হইবে কোথায় একটি বাগান হইবে, কোন স্থানে রন্ধনশালা হইবে ইত্যাদি তাঁহারই পছন্দ অনুসারে হওয়া চাই। ভাড়াটে বাড়ি হইলে তাহার কোন্ কামরা কিরূপে ব্যবহৃত হইবে, সে বিষয়ে সলিকা চাই। যেহেতু তিনি গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কিন্তু বলি, কয়জন গৃহিণীর এ জ্ঞান আছে? আমরা এমন গৃহিণী যে গৃহব্যাপারই বুঝি না! আমাদের বিস্‌মিল্লায়ই গলদ!!

গৃহনির্মাণের পর গৃহসামগ্রী চাই। তাহা সাজাইয়া গুছাইয়া রাখার জন্যও সলিকা চাই। কোথায় কোন্ জিনিসটা থাকিলে মানায় ভাল, কোথায় কি মানায় না, এসব বুঝিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। একটা মেয়েলী প্রবাদ আছে, "সেই ধান সেই চাউল গিন্নী গুণে আউল ঝাউল" (এলোমেলো)। ভাঁড়ার ঘরে সচরাচর দেখা যায়, মাকড়সার জাল চাঁদোয়ারূপে শোভা পাইতেছে! তেঁতুলে তণ্ডুলে বেশ মেশামিশী হইয়া আছে, কোথাও ধ'নের সহিত মৌরী মিশিয়াছে। চিনি খুঁজিয়া বাহির করিতে এক ঘণ্টা সময় লাগে। চারিদিক্ বন্ধ থাকে বলিয়া ভাঁড়ার ঘরের দ্বার খোলা মাত্র বদ্ধ বায়ুর এক প্রকার দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। অভ্যাসের কৃপায় এ দুর্গন্ধ গিন্নিদের অপ্রিয় বোধ হয় না।

অনেক শ্রীমতী পান সাজিতে বসিয়া যাঁতির খোঁজ করেন; যাঁতি পাওয়া গেলে দেখেন পানগুলি ধোওয়া হয় নাই। পানের ডিবে কোন ছেলে কোথায় রাখে তার ঠিক নাই! কখন বা খয়ের ও চুনের সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। পান থাকে ঘটিতে, সুপারি থাকে একটা সাজিতে, খয়ের হয়ত থাকে কাপড়ের বাক্সে! অবশ্য "সাহেবে সলিকা"গণ এরূপ করেন না। তাহাদের পানের সমস্ত জিনিস যথাস্থানে সুসজ্জিত থাকে।

কেহ বা চা'র পাত্র (tea-pot) মৎস্যাধাররূপে ব্যবহার করেন, ময়দা চালিবার চালনিতে পটল, কুমড়া প্রভৃতি তরকারি কুটিয়া রাখা হয়! পিতলের বাটিতে তেঁতুলের আচার থাকে! পূর্বে মুসলমানেরা "মোকাবা" (পাত্র বিশেষ, যাহাতে চুল বাঁধিবার সরঞ্জাম থাকে) রাখিতেন, আজি কালি অনেকে toilet table রাখেন। ইঁহাদের "মোকাবায়" কিংবা টেবিলের উপর চিরুনি তৈল (toilet এর) কোন সম্পর্ক নাই।

পরিমিত ব্যয় করা গৃহিণীর একটা প্রধান গুণ। হতভাগা পুরুষেরা টাকা উপার্জন করিতে কিরূপ শ্রম ও যত্ন করেন, কতখানি মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া এক একটি পয়সার মূল্য (পারিশ্রমিক) দিয়া থাকেন, অনেক গৃহিণী তাহা একটু চিন্তা করিয়াও দেখেন না। উপার্জন না করিলে স্বামীর সহিত ঝগড়া করিবেন, যথাসাধ্য কটুকাটব্য বলিবেন, কিন্তু একটু সহানুভূতি করেন কই? ঐ শ্রমার্জিত টাকাগুলি কন্যার বিবাহে বা পুত্রের অন্নপ্রাশনে কেবল সাধ (আমোদ) আহ্লাদে ব্যয় করিবেন, অথবা অলঙ্কার গড়াইতে ঐ টাকা দ্বারা স্বর্ণকারের উদর-পুর্তি করিবেন। স্বামী বেচারা এক সময় চাকরির আশায় সার্টিফিকেট কুড়াইবার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া, বহু আয়াসে সামান্য বেতনের চাকরি প্রাপ্ত হইয়া প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া যে টাকা কয়টি পত্নীর হাতে আনিয়া দেন, তাহার অধিকাংশ মল ও নূপুরের বেশে তাঁহার কন্যাদের চরণ বেড়িয়া রুনুঝুনু রবে কাঁদিতে থাকে। হায় বালিকে! তোমার চরণশোভন সেই মল গড়াইতে তোমার পিতার হৃদয়ের কতখানি রক্ত শোষিত হইয়াছে তাহা তুমি বুঝ না।
স্বামীর আয় অনুসারে ব্যয় করাই অর্থের সদ্ব্যবহার। ইউরোপীয় মহিলাদের কথার মূল্য বেশি, তাই একজন কাউন্টেসের (Countess উক্তি উদ্ধৃত করা গেল :

"The first point necessary to consider in the arrangement and ordering of a lady's household, is that everything should be on a scale exactly proportionate to her husband's income."

(ভাবার্থ—বাড়ি ঘর সাজাইবার সময় গৃহিণী সর্বপ্রথমে এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন যে তাঁহার গৃহস্থালীর যাবতীয় সামগ্রী যেন তাঁহার স্বামীর আয় অনুসারে প্রস্তুত হয়। তাঁহার গৃহসজ্জা দেখিয়া যেন তাঁহার স্বামীর আর্থিক অবস্থা ঠিক অনুমান করা যাইতে পারে)।

সুশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে আমরা টাকার সদ্ব্যবহার শিখিব কিরূপে? গৃহিণীরা যে স্বামীকে ভালবাসেন না, আমি ইহা বলিতেছি না। তাঁহারা স্বামীকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন, কিন্তু বুদ্ধি না থাকাবশত প্রকৃত সহানুভূতি করিতে পারেন না। কবিবর সাদী বুদ্ধিহীন বন্ধু অপেক্ষা বুদ্ধিমান শত্রুকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। বাস্তবিক স্ত্রীদের অন্ধপ্রেমে অনেক সময় পুরুষদের ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট সাধিত হয়।

কেহ আবার পরিমিত ব্যয় করিতে যাইয়া একেবারে কৃপণ হইয়া পড়েন, ইহাও উচিত নহে।

গৃহিণীর রন্ধন শিক্ষা করা উচিত, এ কথা কে অস্বীকার করেন? একটা প্রবাদ আছে যে স্ত্রীদের রান্না তাঁহাদের স্বামীর রুচি অনুসারে হয়। গৃহিণী যে খাদ্য প্রস্তুত করেন; তাহার উপর পরিবারস্থ সকলের জীবনধারণ নির্ভর করে। মূর্খ রাঁধুনীরা প্রায়ই "কালাই"[১] রহিত তাম্রপাত্রে দধি মিশ্রিত করিয়া যে কোর্মা প্রস্তুত করে, তাহা বিষ ভিন্ন আর কিছু নহে; মুসলমানেরা প্রায়ই অরুচি, ক্ষুদামান্দ্য ও অজীর্ণ রোগে ভুগিয়া থাকেন, তাহার কারণ খাদ্যের দোষ ছাড়া আর কি হইতে পারে? এ সম্বন্ধেও সেই কাউন্‌টেসের (Countess) উক্তি শুনুন,—

"Bad food, ill-cooked food, monotonous food, insufficient food, injure the physique and ruin the temper. No lady should turn to the more tempting occupations or amusements of the day till she had gone into every detail of the family commissariat and assured herself that is it is as good as her purse, her cook, and the season can make it."

(ভাবার্থ—কোন মহিলাই প্রথমে স্বীয় পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের আহারের সুবন্দোবস্ত এবং রন্ধনশালা পরিদর্শন না করিয়া যেন অন্য কোন বিষয়ে মনোযোগ না করেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থানুসারে খাদ্যসামগ্রী যথাসাধ্য সুরুচিকর হইয়া থাকে কি না এ বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। ষড়ঋতুর পরিবর্তনের সহিত আহার্য বস্তুরও পরিবর্তন করা আবশ্যক। ভোজ্য দ্রব্য যথাবিধি রন্ধন না হইলে কিম্বা সর্বদা একই প্রকার খাদ্য এবং অখাদ্য ভোজন করিলে শরীর দুর্বল এবং নানা রোগের আধার হইয়া পড়ে)।

সুতরাং রন্ধনপ্রণালীর সঙ্গে সঙ্গেই গৃহিণীর ডাক্তারী ও (Chemistry) রসায়ন বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান আবশ্যক। কোন্ খাদ্যের কি গুণ, কোন্ বস্তু কত সময়ে পরিপাক হয়, কোন্ ব্যক্তির নিমিত্ত কিরূপ আহার্য প্রয়োজন, এসব বিষয়ে গৃহিণীর জ্ঞান চাই। যদি আহারই যথাবিধি না হয়, তবে শরীরের পুষ্টি হইবে কিসের দ্বারা? অযোগ্য ধাত্রীর হস্তে কেহ সন্তান পালনের ভার দেয় না, তদ্রূপ অযোগ্যা রাঁধুনীর হাতে খাদ্য দ্রব্যের ভার দেওয়া কি কর্তব্য? রন্ধনশালার চতুর্দিকে কাদা হইলে সেই স্থান হইতে সতত দূষিত বাষ্প উঠিতে থাকে; বাড়ির লোকেরা দুগ্ধ এবং অন্যান্য খাদ্যের সহিত ঐ বাষ্প আত্মসাৎ করে। কেবল আহারের স্থান পরিষ্কৃত হইলেই চলিবে না; যে স্থানে আহার

করা হয় সে জায়গার বায়ু (Atmosphere) পর্যন্ত যাহাতে পরিষ্কৃত থাকে, গৃহিণী সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

অনেকে শাকসব্‌জি খাইতে ভালবাসেন। বাজারের তরকারি অপেক্ষা গৃহজাত তরকারি অবশ্য ভাল হয়। গৃহিণী প্রায়ই শিম, লাউ, শশা, কুষ্মাণ্ড স্বহস্তে বপন করিয়া থাকেন। যদি তাঁহারা উদ্যান প্রস্তুত প্রণালী (Horticulture) অবগত থাকেন, তবে ঐ লাউ কুড়মার কি সমধিক উন্নতি হইবে না? অন্তত কোন্ স্থানের মাটি কিরূপ, কোথায় শশা ভাল ফলিবে, কোথায় লঙ্কা ভাল হইবে, গৃহিণীর এ জ্ঞানটুকু ত থাকা চাই।

অনেকেই ছাগল, কুক্কুট, হংস, পারাবাত ইত্যাদি পালন করেন, কিন্তু সেই সকল জন্তু পালন করিবার রীতি অনেকেই জানেন না। উহাদের নিমিত্ত নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র স্থান না থাকায় উহারা বাড়ির মধ্যেই ঘুরিয়া চরিয়া বেড়ায়। কাজেই বাড়িখানাকে পশুশালা বা পশুপক্ষীদের "ময়লার ঘর" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহাতে এই জন্তুগুলি রুগ্ন না হইয়া হৃষ্টপুষ্ট থাকে এবং গৃহ নোংরা করিতে না পারে, তৎপ্রতি গৃহিণীর দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। উহাদের বাসস্থানও পরিষ্কৃত এবং হাওয়াদার (airy) হওয়া উচিত। নচেৎ রুগ্ন পশুপক্ষীর মাংস খাওয়ায় অনিষ্ট বই উপকার নাই। তবেই দেখা যায়, এক রন্ধন শিক্ষা করিতে যাইয়া আমাদিগকে উদ্ভিদবিজ্ঞান, রসায়ন ও উত্তাপ তত্ত্ব (Horticulture, Chemistry ও Theory of heat) শিখিতে হয়!!

অন্নের পরই বস্ত্র—না, মানুষ বস্ত্রকে অন্ন অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় মনে করে। শীত গ্রীষ্মানুযায়ী বস্ত্র প্রস্তুত কিংবা সেলাই করা গৃহিণীর কর্তব্য। পূর্বে তাঁহারা চরখা কাটিয়া সূতা প্রস্তুত করিতেন। এখন কল কারখানার অনুগ্রহে কাপড় সুলভ হইয়াছে বটে, কিন্তু নিজ Caste (পছন্দ) অনুসারে সেলাই করিতে হয়। এজন্যও সুশিক্ষা লাভ করা আবশ্যক। আপনারা হয়ত মনে করিবেন যে, আমার সব কথাই সৃষ্টিছাড়া। এতকাল হইতে নিরক্ষর দরজিরা ভালই সেলাই করিয়া আসিতেছে, সেলাইএর সঙ্গে সুশিক্ষার সম্বন্ধ কি? সেলাইএর সহিত পড়ার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই বটে, কিন্তু আনুষঙ্গিক (indirect) সম্বন্ধ আছে। পড়িতে (বিশেষত ইংরাজি) না জানিলে সেলাইয়ের কল (sewing machine এর) ব্যবস্থাপত্র পাঠ করা যায় না। ব্যবস্থা না বুঝিলে মেশিন্ (machine) দ্বারা ভাল সেলাই করা যায় না। কেবল হাতে সেলাই করিলে লেখাপড়া শিখিতে হয় না, সত্য। কিন্তু হাতের সেলাইএর সহিত মেশিনএর সেলাইয়ের তুলনা করিয়া দেখিবেন ত কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ? তাহা ছাড়া মেশিন দ্বারা অল্প সময়ে এবং অল্প পরিশ্রমে অধিক সেলাই হয়। অতএব মেশিন চালনা শিক্ষা করাই শ্রেয়। এতদ্ব্যতীত ক্যান্‌ভাস (Canvas) এর জুতা, পশমের মোজা, শাল প্রভৃতি কে না ব্যবহার করিতে চাহেন? এই প্রকারের সূচিকার্য ইংরাজি (knitting ও Crochet সম্বন্ধীয়) ব্যবস্থাপত্রের সাহায্য ব্যতীত সুচারুরূপে হয় না। ঐ ব্যবস্থাপুস্তক পাঠে শিক্ষয়িত্রীর বিনা সাহায্যে সূচিকর্মে সুনিপুণা হওয়া যায়; কাপড়ের ছাঁট কাট সবই উৎকৃষ্ট হয়। কাপড়ের কাট ছাঁটের জন্যও ত বুদ্ধির দরকার। কাপড়, পশম, জুতা ইত্যাদির পরিমাণ জানা থাকিলে, একজোড়া মোজার জন্য তিন জোড়ার পশম কিনিয়া অনর্থক অপব্যয় করিতেও হয় না।

পরিবারভুক্ত লোকদের সেবা যত্ন করা গৃহিণীর অবশ্য কর্তব্য। প্রত্যেকের সুখ সুবিধার নিমিত্ত নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগ করা রমণীজীবনের ধর্ম। এ কার্যের জন্যও সুশিক্ষা (training) চাই। সচরাচর গৃহিণীরা পরিজনকে সুখ দিবেন ত দূরের কথা, তাঁহাদের সহিত ছোট ছোট বিষয় লইয়া কোঁদল কলহে সময় কাটাইয়া থাকেন। শাশুড়ির নিন্দা ননদিনীর নিকট, আবার ননদের কুৎসা মাতার নিকট করেন, এইভাবে দিন যায়।

কেহ পীড়িত হইলে তাহার যথোচিত সেবা করা গৃহিণীর কর্তব্য, রোগীর সেবা অতি গুরুতর কার্য। যথারীতি শুশ্রূষা-প্রণালী (nursing) অবগত না হইলে এ বিষয়ে কৃতকার্য হওয়া যায় না। আমাদের দেশে অধিকাংশ রোগী ঔষধ পথ্যের অভাব না হইলেও শুশ্রূষার অভাবে মারা যায়। অনেক স্থানে নিরক্ষর সেবিকা রোগীকে মালিশের ঔষধ খাওয়াইয়া দেয়। কেহ বা অসাবধানতাবশত বিষাক্ত ঔষধ যেখানে সেখানে রাখে, তাহাতে অবোধ শিশুরা সেই ঔষধ খাইয়া ফেলে। এইরূপ ভ্রমের জন্য চিরজীবন অনুতাপে দগ্ধ হইতে হয়। কেহ বা রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া পথ্য দান করে, কেহ অত্যধিক স্নেহবশত তিন চারিবারের ঔষধ একবারে সেবন করায়। এরূপ ঘটনা এ দেশে বিরল নহে। ডাক্তারী বিষয়ে সেবিকার উপযুক্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক, একথা কেহ অস্বীকার করেন কি? ডাক্তারী না জানিয়া শুশ্রূষা করিতে যাওয়া যা, আর স্বর্ণকারের কাজ শিখিয়া চর্মকারের কাজ করিতে যাওয়াও তাই!

কিন্তু ডাক্তারী জান বা না জান, রোগীর সেবা সকলকেই করিতে হয়। এমন দুহিতা কে আছেন, যিনি অশ্রুধারায় জননীর পদ প্রক্ষালন করিতে করিতে ভাবেন না যে "এত যত্ন পরিশ্রম ব্যর্থ হ'ল; আমার নিজের পরমায়ু দিয়াও যদি মাকে বাঁচাইতে পারিতাম।" এমন ভগিনী কে আছেন, যিনি পীড়িত ভ্রাতার পার্শ্বে বসিয়া অনাহারে দিন যাপন করেন না? এমন পত্নী কে, যিনি স্বামীর পীড়ার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া নিজে আধমরা হন না? এমন জননী কে আছেন, যিনি জীবনে কখনও পীড়িত শিশু কোলে লইয়া অনিদ্রায় রজনী যাপন করেন নাই? যিনি কখনও এরূপ রোগীর সেবা করেন নাই, তিনি প্রেম শিখেন নাই। না কাঁদিলে প্রেম শিক্ষা হয় না।

বিপদের সময় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব রক্ষা করা অতি আবশ্যক। এই গুণটা আমাদের অনেকেরই নাই। আমরা কেবল হায়! হায়! করিয়া কাঁদিতে জানি! বোধ হয় আশা থাকে যে, অবলার চক্ষের জল দেখিয়া শমনদের সদয় হইবেন! অনেক সময় দেখা যায় রোগী এ দিকে পিপাসায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন, সেবিকা ওদিকে বিলাপ করিয়া (নানা ছন্দে বিনাইয়া বিনাইয়া) কাঁদিতেছেন! হায় সেবিকে, এ সময় রোগীর মুখে কি একটু দুধ দেওয়ার দরকার ছিল না? এ সময়টুকু যে দুধ না খাওয়াইয়া রোদনে অপব্যয়িত হইলে, ইহার ফলে রোগীর অবস্থা বেশি মন্দ হইল।

এ স্থলে একটি পতিপ্রাণা গৃহিণীর কথা মনে পড়িল। একদা রাত্রিতে তাঁহার স্বামীদেবের বুকে ব্যথা হইয়াছিল; সেজন্য তিনি দুর্ভাবনায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ছিলেন। পরদিন প্রভাতে কবিরাজ আসিয়া বলেন, "এখন অবস্থা মন্দ, রাত্রেই বুকে একটুকু সর্ষের তৈল মালিশ করিলে এরূপ হইত না।" গৃহিণী অনিদ্রায় নিশি যাপন করিলেন,

একটু তৈলমর্দন করিলেন না। কারণ এ জ্ঞানটুকু তাঁহার ছিল না। ঐ অজ্ঞানতার ফলে ত্রিবিধ অনিষ্ট সাধিত হইল, (১) স্বামীর স্বাস্থ্য বেশি খারাপ হইল; (২) নিজে অনর্থক রাত্রিজাগরণে অসুস্থ হইলেন; (৩) চিকিৎসকের জন্য টাকার অপব্যয় হইল। কারণ রাত্রে তৈল মাখিলেই ব্যথা সারিয়া যাইত, চিকিৎসক ডাকিবার প্রয়োজন হইত না।

এখন যদি আমি বলি যে, গৃহিণীদের জন্য একটা "জেনানা মেডিকেল কলেজ" চাই, তবে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

সন্তানপালন।—ইহা সর্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার। সন্তানপালনের সঙ্গে সঙ্গেই সন্তানের শিক্ষা হইয়া থাকে একজন ডাক্তার বলিয়াছেন যে, "মাতা হইবার পূর্বেই সন্তানপালন শিক্ষা করা উচিত। মাতৃকর্তব্য অবগত না হইয়া যেন কেহ মাতা না হন।" যে বেচারিকে ত্রয়োদশবর্ষ বয়ঃক্রমে মাতা, ছাব্বিশ বৎসর বয়সে মাতামহী এবং চল্লিশ বৎসরে প্রমাতামহী হইতে হয়, সে মাতৃজীবনের কর্তব্য কখন শিখিবে?

শিশু মাতার রোগ, দোষ, গুণ, সংস্কার সকল বিষয়েরই উত্তরাধিকারী হয়। ইতিহাসে যত মহৎ লোকের নাম শুনা যায়, তাঁহারা প্রায় সকলেই সুমাতার পুত্র ছিলেন। অবশ্য অনেক স্থলে সুমাতার কুপুত্র অথবা কুমাতারও সুপুত্র হয়, বিশেষ কোন কারণে ওরূপ হয়। স্বভাবত দেখা যায় আতার গাছে আতাই ফলে, জাম ফলে না। শিশু স্বভাবত মাতাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে, তাঁহার কথা সহজে বিশ্বাস করে। মাতার প্রতিকার্য, প্রতিকথা শিশু অনুকরণ করিয়া থাকে। প্রতি ফোঁটা দুগ্ধের সহিত মাতার মনোগত ভাব শিশুর মনে প্রবেশ করে। কবি কি চমৎকার ভাষায় বলিতেছেন :

"—দুগ্ধ যবে পিয়াও জননী,
শুনাও সন্তানে শুনাও তখনি,
বীরগুণগাথা বিক্রমকাহিনী,
বীরগর্বে তার নাচুক ধমনী।"

তাই বটে, বীরাঙ্গনাই বীর-জননী হয়! মাতা ইচ্ছা করিলে শিশু-হৃদয়ের বৃত্তিগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া তাহাকে তেজস্বী, সাহসী, বীর, ধীর সবই করিতে পারে। অনেক মাতা শিশুকে মিথ্যা বলিতে ও সত্য গোপন করিতে শিক্ষা দেয়, ভবিষ্যতে সেই পুত্রগণ ঠগ, জুয়াচোর হয়। অযোগ্য মাতা কারণে অকারণে প্রহার করিয়া শিশুর হৃদয় নিস্তেজ (spirit low) করে, ভবিষ্যতে তাহারা শ্বেতাঙ্গের অর্ধচন্দ্র ও সবুট পদাঘাত নীরবে—অক্লেশে সহ্য করে। কোন মজুরের পৃষ্ঠে জনৈক গৌরাঙ্গ নূতন পাদুকা ভাঙ্গিয়া ভগ্ন জুতার মূল্য আদায় না করায় সেই কূলি "নৌতুন জুতা দিয়া মারলো—দামডী লইল না" বলিয়া সাহেবের প্রশংসা করিয়াছিল! বলা বাহুল্য যে, অনেক "ভদ্রলোকের" অবস্থাও তদ্রূপ হইয়া থাকে।

অতএব, সন্তান পালনের নিমিত্ত বিদ্যা বুদ্ধি চাই, যেহেতু মাতাই আমাদের প্রথম, প্রধান ও প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী। হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ পুত্র লাভ করিতে হইলে প্রথমে মাতার স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইবে।

কেবল কাজ লইয়াই ১৬/১৭ ঘণ্টা সময় কাটান কষ্টকর। মাঝে মাঝে বিশ্রামও চাই। সেই অবসর সময়টুকু পরনিন্দায়, বৃথা কোঁদলে কিংবা তাস খেলায় না কাটাইয়া

নির্দোষ আমোদে কাটাইলে ভাল হয় না কি? সেজন্য চিত্র ও সঙ্গীত শিক্ষা করা উচিত। যিনি এ বিষয়ে পারদর্শিনী হইতে চাহেন, তাঁহাকেও বর্ণমালার সহিত পরিচয় করিতে হইবে। চিত্রের বর্ণ, তুলির বর্ণনা, সঙ্গীতের স্বরলিপি সবই পুস্তকে আবদ্ধ অথবা সুপাঠ্য পুস্তক অধ্যয়নে কিংবা কবিতা প্রভৃতি রচনায় অবসর সময় যাপন করা শ্রেয়।

প্রতিবেশীর প্রতি গৃহিণীর কর্তব্য সম্বন্ধেও দুই চারি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি। অতিথি সৎকার ও প্রতিবেশীর প্রতি সদয় ব্যবহারের জন্য এককালে আরব জাতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। কথিত আছে, আরবীয় কোন ভদ্রলোকের আবাসে ইঁদুরের বড় উৎপাত ছিল। তাঁহার জনৈক বন্ধু তাঁহাকে বিড়াল পুষিতে উপদেশ দেওয়ায় তিনি বলিলেন যে বিড়ালের ভয়ে ইঁদুরগুলি তাঁহার বাড়ি ছাড়িয়া তাঁহার প্রতিবেশীদিগকে উৎপীড়ন করিবে, এই আশঙ্কায় তিনি বিড়াল পোষেন না।

আর আমরা শুধু নিজের সুখ সুবিধার চিন্তায় ব্যস্ত থাকি, অপরের অসুবিধার বিষয় আমাদের মনে উদয়ই হয় না। বরং কাহারও বপিদের দ্বারা আমাদের কিছু লাভ হইতে পারে কি না, সেই কথাই পূর্বে মনে উদয় হয়! কেহ দুঃসময়ে কোন জিনিস বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ক্রেতা ভাবেন এই সুযোগে জিনিসটি বেশ সুলভ পাওয়া যাইবে! ঈদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থে দৃষ্টি রাখা শিক্ষিত সমাজের শোভা পায় না। অথবা একজনে হয়ত ক্ষণিক ক্রোধের বশবর্তী হইয়া তাঁহার ভাল চাকরাণীটাকে বিদায় দিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ অপর একজন গৃহিণী সেই বিতাড়িতা চাকরাণীকে হাত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আদর্শ গৃহিণী সে স্থলে সেই পরিচারিকাকে পুনরায় তাহার প্রভুর বাড়ি নিযুক্ত করিতে প্রয়াস পাইবেন। প্রতিবেশিনীর বিপদকে নিজের বিপদ বলিয়া মনে করা উচিত।

আর প্রতিবেশীর পরিধি বৃহৎ হওয়া চাই—অর্থাৎ প্রতিবেশী বলিলে যেন কেবল আমাদের দ্বারস্থিত গৃহস্থ না বুঝায়। বঙ্গদেশের প্রতিবেশী বলিতে পাঞ্জাব, অযোধ্যা; উড়িষ্যা— এসবই যেন বুঝায়। হইতে পারে পাঞ্জাবের একদল ভদ্রলোক কোন কারখানায় কাজ করেন; সেই কারখানার কর্তৃপক্ষকে তাঁহারা বিশেষ কোন অভাবের বিষয় জানাইতে বারম্বার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হওয়ায় ধর্মঘট করিতে বাধ্য হইলেন। ঐ ধর্মঘটকে যেন উড়িষ্যা বা মাদ্রাজের লোকে নিজেদের কার্য প্রাপ্তির সুযোগ ভাবিয়া আহ্লাদিত না হন। সুগৃহিণী আপন পতি পুত্রকে তাদৃশ ধর্মঘট স্থলে কার্য গ্রহণে বাধা দিবেন। আর স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা শুধু হিন্দু বা মুসলমান কিম্বা পারসী বা খ্রিস্টিয়ান অথবা বাঙ্গালি, মাদ্রাজী, মাড়ওয়ারী বা পাঞ্জাবী নহি—আমরা ভারতবাসী। আমরা সর্বপ্রথমে ভারতবাসী তারপর মুসলমান শিখ বা আর কিছু। সুগৃহিণী এই সত্য আপন পরিবার মধ্যে প্রচার করিবেন। তাহার ফলে তাঁহার পরিবার হইতে ক্ষুদ্র স্বার্থ, হিংসা দ্বেষ ইত্যাদি ক্রমে তিরোহিত হইবে এবং তাঁহার গৃহ দেবভবন সদৃশ ও পরিজন দেবতুল্য হইবে। এমন ভারতমহিলা কে, যিনি আপন ভবনকে আদর্শ দেবালয় করিতে না চাহিবেন?

দরিদ্রা প্রতিবেশিনীদিগকে নানা প্রকারে সাহায্য করাও আমাদের অন্যতম কর্তব্য। তাহাদের সূচিশিল্প এবং চরকায় প্রস্তুত সূত্রের বস্ত্রাদি উচিত মূল্যে ক্রয় করিলে তাহাদের

পরম উপকার করা হয়। এইরূপে এবং আরও অনেক প্রকারে তাহাদের সাহায্য করা যাইতে পারে; বিস্তারিত বলা বাহুল্য মাত্র।

আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, বালক বালিকাদিগকে ভৃত্যের প্রতি সদয় ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। সচরাচর দেখা যায়, বড় ঘরের বালকেরা ভারি দাম্ভিক হয়, তাহারা চাকরকে নিতান্ত নগণ্য কি যেন কি মনে করে। বেতনভোগী হইলেই ভৃত্যবর্গ যে মানুষ এবং তাহাদেরও স্বীয় পদানুসারে মান অপমান জ্ঞান আছে, সুকুমারমতি শিশুদিগকে একথা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। অনেক গৃহিণী নিজের পুত্রকন্যার দোষ বুঝেন না, তাঁহারা চাকরকেই অযথা শাসন করেন। ওরূপে শিশুকে প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায়।

উর্দু "বানাতননাশ" গ্রন্থে বর্ণিত নবাবনন্দিনী হোসনে-আরা অন্যায় আদরে এমন দুর্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহার দৌরাত্ম্য দাসী, পাচিকা প্রভৃতি সেবিকাবৃন্দ ত্রাহি ত্রাহি করিত![৪] যাহাতে বালিকারা বিনয়ী এবং শিষ্ট শান্ত হয়, এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

নরগেস কাঁদিয়া আসিয়া বলিল, "দেখুন, ছোট সাহেবজাদী (হোসনে-আরা) এমন পাথর ছুড়িয়া মারিয়াছেন ভাগ্যক্রমে আমার চক্ষু নষ্ট হয় নাই।"

সোসন আসিয়া বলিল, "দেখুন, ছোট সাহেবজাদী আমায় বলিলেন, 'দেখি সোসন তোর জিহ্বা', যেই আমি জিহ্বা বাহির করিলাম অমনি তিনি আমার চিবুকে এমন জোরে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন যে আমার সমস্ত দাঁত রসনায় বিদ্ধ হইয়াছিল!"

গোলাপ চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "হায়! আমার কান রক্তাক্ত করিয়া দিলেন!"

রন্ধনশালা হইতে পাচিকা উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "এই দেখুন ছোট সাহেবজাদী তরকারির হাঁড়িতে মুঠা ভরিয়া ছাই দিতেছেন!"

ঐসব শুনিয়া বড় বেগম ডাকিলেন, "হোস্‌না! এখানে আইস!" হোসেনা তৎক্ষণাৎ আসিল ত; কিন্তু আসিয়া, মাসীকে নমস্কার করিবে ত দূরের কথা,—হাতে ছাই পায় কাদা—এই অবস্থায় সে হঠাৎ মাসীর গলা জড়াইয়া ধরিল। তিনি সাদরে বলিলেন, "হোস্‌না! তুমি বড় দুষ্ট হইয়াছ।"

হোস্‌না তখন উপস্থিত দাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এই সম্বেল পেত্নী বুঝি কোন কথা আপনাকে লাগাইয়াছে?" এই বলিয়াই সে মাসীর ক্রোড় হইতে লাফাইয়া উঠিয়া নির্দোষ সম্বেলের কেশাকর্ষণ করিয়া প্রহার আরম্ভ করিল! "আঁ! ও কি কর! কি কর!" বলিয়া বড় বেগম বারম্বার নিষেধ করিলেন, কিন্তু সে কিছুই শুনিল না।

পরে হোসনে-আরা জেনানা মক্‌তবে (পাঠশালায়) প্রেরিত হইয়া সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এতদ্বারা লেখক মহোদয় দেখাইয়াছেন যে অমন অবাধ্য অনম্য বালিকাও শিক্ষার গুণে ভাল হয়।

আমাদের বিশ্বাস সুশিক্ষা স্পর্শমণি যাহাকে স্পর্শ করে সেই সুবর্ণ হয়।

"মাশুক"—যাহাকে ভালবাসা যায়; beloved object.

পরিশেষে বলি প্রেমিক হও, ধার্মিক হও বা নাস্তিক হও, যাই হইতে চাও, তাহাতেই মানসিক উন্নতির (mental culture -এর) প্রয়োজন। প্রেমিক হইতে গেলে নির্ভর ন্যায়পরতা, মাশুকের নিমিত্ত আত্মবিসর্জ্জন ইত্যাদি শিক্ষণীয়। নতুবা নির্বোধ বন্ধু হইলে কাহারই উপকার করিতে পারিবে না। ধর্মসাধনের নিমিত্ত শিক্ষা দীক্ষার প্রয়োজন, কারণ "কৈঁ বে-ইল্‌মে না তওযাঁ খোদারা শেনাখ্‌ত"। অর্থাৎ জ্ঞান না হইলে ঈশ্বরকে চেনা যায় না! অন্যত্র প্রবাদ আছে "মূর্খের উপাসনা ও বিদ্বানের শয়নাবস্থা সমান"। অতএব দেখা যায় যে, রমণীর জন্য আজ পর্যন্ত যে সব কর্তব্য নির্ধারিত আছে, তাহা সাধন করিতেও বুদ্ধির প্রয়োজন। অর্থ উপার্জনের নিমিত্ত পুরুষদের যেমন মানসিক শিক্ষা (mental culture) আবশ্যক, গৃহস্থালীর জন্য গৃহিণীদেরও তদ্রূপ মানসিক শিক্ষা (mental culture) প্রয়োজনীয়।

ইতর শ্রেণীর লোকদের মত যেমন-তেমনভাবে গৃহস্থালী করিলেও সংসার চলে বটে, কিন্তু সেরূপ গৃহিণীকে সুগৃহিণী বলা যায় না; এবং ঐ সব ডোম চামারের পুত্রগণ যে কালে "বিদ্যাসাগর" "বিদ্যাভূষণ" বা "তর্কালঙ্কার" হইবে এরূপ আশাও বোধ হয় কেহ করেন না।

আমি আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। এখন সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা আপনাদের কর্তব্য। যদি সুগৃহিণী হওয়া আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে স্ত্রীলোকের জন্য সুশিক্ষার আয়োজন করিবেন।

বোরকা

আমি অনেক বার শুনিয়াছি যে আমাদের "জঘন্য অবরোধ প্রথা"ই নাকি আমাদের উন্নতির অন্তরায়। উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত ভগ্নীদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা প্রায়ই আমাকে "বোরকা" ছাড়িতে বলেন। বলি, উন্নতি জিনিসটা কি? তাহা কি কেবল বোরকার বাহিরেই থাকে? যদি তাই হয় তবে কি বুঝিব যে জেলেনী, চামারনী, ডুমুনী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা আমাদের অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে।

আমাদের ত বিশ্বাস যে অবরোধের সহিত উন্নতির বেশি বিরোধ নাই। উন্নতির জন্য অবশ্য উচ্চশিক্ষা চাই। কেহ কেহ বলেন যে ঐ উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে হইলে এফ. এ., বি.এ. পরীক্ষার জন্য পর্দা ছাড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (University Hall এ) উপস্থিত হইতে হইবে। এ যুক্তি মন্দ নহে! কেন? আমাদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় (University) হওয়া এবং পরীক্ষক স্ত্রীলোক হওয়া কি অসম্ভব? যতদিন এইরূপ বন্দোবস্ত না হয়, ততদিন আমাদের পাস করা বিদ্যা না হইলেও চলিবে।

অবরোধ-প্রথা স্বাভাবিক নহে—নৈতিক। কেননা পশুদের মধ্যে এ নিয়ম নাই। মনুষ্য ক্রমে সভ্য হইয়া অনেক অস্বাভাবিক কাজ করিতে শিখিয়াছে। যথা—পদব্রজে ভ্রমণ করা স্বাভাবিক, কিন্তু মানুষের সুবিধার জন্য গাড়ি, পালকি প্রভৃতি নানাপ্রকার যানবাহন প্রস্তুত করিয়াছে। সাঁতার দিয়া জলাশয় পার হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু মানুষে নানাবিধ জলযান প্রস্তুত করিয়াছে।—তাহার সাহায্যে সাঁতার না জানিলেও অনায়াসে

সমুদ্র পার হওয়া যায়। ঐরূপ মানুষের "অস্বাভাবিক" সভ্যতার ফলেই অন্তঃপুরের সৃষ্টি।

পৃথিবীর অসভ্য জাতীরা অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় থাকে। ইতিহাসে জানা যায়, পূর্বে অসভ্য ব্রিটনেরা অর্ধনগ্ন থাকিত। ঐ অর্ধনগ্ন অবস্থার পূর্বে গায়ে রঙ মাখিত! ক্রমে সভ্য হইয়া তাহারা পোশাক ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে।

এখন সভ্যতাভিমানিনী (Civilized) ইউরোপীয়া এবং ব্রাহ্মসমাজের ভগ্নীগণ মুখ ব্যতীত সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া হাটে মাঠে বাহির হন। আর অন্যান্য দেশের মুসলমানেরা (ঘরের বাহির হইবার সময়) মহিলাদের মুখের উপর আরও একখণ্ড বস্ত্রাবরণ (বোরকা) দিয়া ঐ অঙ্গাবরণকে সম্পূর্ণ উন্নত (perfect) করিয়াছেন। যাঁহারা বোরকা ব্যবহার করেন না, তাঁহারা অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকেন।

কেহ কেহ বোরকা ভারি বলিয়া আপত্তি করেন। কিন্তু তুলনায় দেখা গিয়াছে ইংরাজ মহিলাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হ্যাট অপেক্ষা আমাদের বোরকা অধিক ভারি নহে।

পর্দা অর্থে ত আমরা বুঝি গোপন করা বা হওয়া, শরীর ঢাকা ইত্যাদি—কেবল অন্তঃপুরের চারি-প্রাচীরের ভিতর থাকা নহে। এবং ভালমতে শরীর আবৃত না করাকেই "বে-পর্দা" বলি। যাঁহারা ঘরের ভিতর চাকরদের সম্মুখে অর্ধ-নগ্ন অবস্থায় থাকেন, তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা ভালমতে পোশাক পরিয়া মাঠে বাজারে বাহির হন, তাঁহাদের পর্দা বেশি রক্ষা পায়।

বর্তমান যুগে ইউরোপীয় ভগ্নীগণ সভ্যতার চরম সীমায় উঠিয়াছেন; তাঁহাদের পর্দা নাই কে বলে? তাঁহাদের শয়নকক্ষে, এমনকি বসিবার ঘরেও কেহ বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেন না। এ প্রথা কি দোষণীয়? অবশ্য নহে। কিন্তু এ দেশের যে ভগ্নীরা বিলাতী সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া পর্দা ছাড়িয়াছেন, তাঁহাদের না আছে ইউরোপীয়দের মত শয়নকক্ষের স্বাতন্ত্র্য (bedroom privacey) না আছে আমাদের মত বোরকা!

কেহ বলিয়াছেন যে "সুন্দর দেহকে বোরকা জাতীয় এক কদর্য ঘোমটা দিয়া আপাদমস্তক ঢাকিয়া এক কিম্ভূতকিমাকার জীব সাজা যে কি হাস্যকর ব্যাপার যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন"—ইত্যাদি। তাহা ঠিক! কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে রেলওয়ে প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া কোন সম্ভ্রান্ত মহিলাই ইচ্ছা করেন না যে তাঁহার প্রতি দর্শকবৃন্দ আকৃষ্ট হয়। সুতরাং এরূপ কুৎসিত জীব সাজিয়া দর্শকের ঘৃণা উদ্রেক করিলে কোন ক্ষতি নাই। বরং কুলকামিনীগণ মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য দেখাইয়া সাধারণ দর্শকমণ্ডলীকে আকর্ষণ করাই দোষণীয় মনে করিবেন।

ইংরাজি আদব কায়দা (etiquette) ও আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে ভদ্রমহিলাগণ আড়ম্বররহিত (simple) পোশাক ব্যবহার করিবেন—বিশেষত পদব্রজে ভ্রমণকালে চাকচিক্যময় বা জাঁকজমক-বিশিষ্ট কিছু ব্যবহার করা তাঁহাদের উচিত নহে। নিমন্ত্রণ ইত্যাদি রক্ষা করিতে যাইলে মহিলাগণ সচরাচর উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ও বহুমূল্য অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকেন। গাড়ি হইতে নামিবার সময় ঐ পরিচ্ছদ রূপ আভরণ কোচম্যান্ দ্বারবান প্রভৃতির দৃষ্টি হইতে গোপন করিবার জন্য একটা সাদাসিধা (simple)

বোরকার আবশ্যক হয়। রেলওয়ে ভ্রমণকালে সাধারণের দৃষ্টি (public gaze) হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঘোমটা কিম্বা বোরকার দরকার হয়।

সময় সময় ইউরোপীয়া ভগ্নীগণও বলিয়া থাকেন, "আপনি কেন পর্দা ছাড়েন না (Why don't you break off purdah)?" কি জ্বালা! মানুষে নাকি পর্দা ছাড়িতে পারে? ইহাদের মতে পর্দা অর্থে কেবল অন্তঃপুরে থাকা বুঝায়। নচেৎ তাঁহারা যদি বুঝিতেন যে তাঁহারা নিজেও পর্দা র (অর্থাৎ privacy র) হাত এড়াইতে পারেন না, তবে ওরূপ বলিতেন না। যদিও তাঁহাদের পোশাকেও সম্পূর্ণ পর্দা রক্ষা হয় না, বিশেষত সান্ধ্য-পরিধেয় (evening dress) ত নিতান্তই আপত্তিজনক। তবু তাহা বহু কামিনীর এবং হারা মিহি শাড়ি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

তারপর অন্তঃপুর ত্যাগের কথা—অন্তঃপুর ছাড়িলে যে কি উন্নতি হয়, তাহা আমরা ত বুঝি না। প্রকারান্তরে উক্ত স্বাধীনা রমণীদেরও ত শয়নকক্ষরূপ অন্তঃপুর আছে।

মোটের উপর আমরা দেখিতে পাই সকল সভ্যজাতিদেরই কোন না কোন রূপ অবরোধ প্রথা আছে। এই অবরোধ-প্রথা না থাকিলে মানুষ ও পশুতে প্রভেদ কি থকে? এমন পবিত্র অবরোধ-প্রথাকে যিনি "জঘন্য" বলেন, তাঁহার কথার ভাব আমরা বুঝিতে অক্ষম।

সভ্যতা (civilization) ই জগতে পর্দা বৃদ্ধি করিতেছে! যেমন পূর্বে লোকে চিঠিপত্র কেবল ভাঁজ করিয়া পাঠাইত, এখন সভ্য (civilized) লোকে চিঠির উপর লেফাফার আবরণ দেন। চাষারা ভাতের থালা ঢাকে না; অপেক্ষাকৃত সভ্য লোকে খাদ্যসামগ্রীর তিন চারি পাত্র একখানা বড় থালায় (tray তে) রাখিয়া উপরে একটা "খানপোষ' বা "সরপোষ" ঢাকা দেন; যাঁহারা আরও বেশি সভ্য তাঁহাদের খাদ্য বস্তুর প্রত্যেক পত্রের স্বতন্ত্র আবরণ থাকে। এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, যেমন টেবিলের আবরণ, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়—ইত্যাদি।

SH জিকালি যে সকল ভগ্নী নগ্নপদে বেড়াইয়া থাকেন, তাঁহাদেরই আত্মীয়া সুশিক্ষিত (enligthtened) ভগ্নীগণ আবার সভ্যতার পরিচায়ক মোজা জুতার ভিতর পদযুগল আবৃত করেন। ক্রমে হাত ঢাকিবার জন্য দস্তানার সৃষ্টি হইয়াছে। তবেই দেখা যায়—সভ্যতার (civilization এর) সহিত অবরোধ-প্রথার বিরোধ নাই।

তবে সকল নিয়মেরই একটা সীমা আছে। এ দেশে আমাদের অবরোধ-প্রথাটা বেশি কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। যেমন অবিবাহিতা বালিকাগণ স্ত্রীলোকের সহিতও পর্দা করিতে বাধ্য থাকেন! কখন কোন প্রতিবেশিনী আসিয়া উপস্থিত হইবে, এই ভয়ে নবম বর্ষীয়া বালিকা প্রাঙ্গণে বাহির হয় না। এইভাবে সর্বদা গৃহকোণে বন্দিনী থাকায় তাহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের সুশিক্ষার ব্যাঘাত হয়। যেহেতু খুব নিষ্ঠ সম্পর্কীয়া আত্মীয়া ব্যতীত তাহারা অন্য কাহাকেও দেখিতে পায় না, তবে শিখিবে কাহার নিকট? নববধূদের অন্যায় পর্দা ও উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বিবাহের পর প্রথম দুই চারি মাস কেবল "জড় পুত্তলিকা" সাজিয়া থাকিতে বাধ্য হন! এরূপ কৃত্রিম আ ও বোবা হইয়া থাকায় কেমন অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা যে সশরীরে ভোগ করে, সেই জানে!! কথিত আছে, কোন সময় একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের নববধূর পৃষ্ঠে

ঘটনাক্রমে বৃশ্চিক দংশন করে—তিনি সে যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন! তৃতীয় দিবস "চৌথী"র স্নানের সময় অন্য স্ত্রীলোকেরা তাঁহার পৃষ্ঠের ক্ষত দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছিল! আজি কালি বৃদ্ধাগণ খুব প্রশংসার সহিত ঐ বধূটির উপমা দিয়া থাকেন! বোধ হয় বৃশ্চিকটা খুব বিষাক্ত ছিল না!

যাহা হউক ঐ সকল কৃত্রিম পর্দা কম (moderate) করিতে হইবে। অনেক পরিবারে মহিলাগণ ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব ব্যতীত অপর কাহারও বাড়ি যাতায়াত করেন না। ইহাতে পাঁচ রকমের স্ত্রীলোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইতে পারে না বলিয়া তাঁহারা একেবারে কূপমণ্ডুক হইয়া থাকেন। অন্তঃপুরিকাদের পরস্পর দেখাশুনা বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুরুষেরা যেমন সকল শ্রেণীর লোকের সহিত আলাপ করিয়া থাকেন, আমাদের তদ্রূপ করা উচিত। অবশ্য যাঁহাদিগকে আমরা ভদ্র-শিষ্ট বলিয়া জানি, কেবল তাঁহাদের সঙ্গে মিশিব,—তাঁহারা যে কোন ধর্মাবলম্বিনী (য়িহুদী, নাসারা, বুৎপরস্ত বা যা'ই) হউন, ক্ষতি নাই। এই যে "গয়ের মজহব" বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের সহিত পর্দা করা হয়, ইহা ছাড়িতে হইবে। আমাদের ধর্ম নষ্ট হইবে, এরূপ আশঙ্কার কারণ কি?

আমরা অন্যায় পর্দা ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব। প্রয়োজন হইলে অবগুণ্ঠন (ওরফে বোরকা) সহ মাঠে বেড়াইতে আমাদের আপত্তি নাই। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য শৈলবিহারে বাহির হইলেও বোরকা সঙ্গে থাকিতে পারে। বোরকা পরিয়া চলাফেরায় কোন অসুবিধা হয় না। তবে সেজন্য সামান্য রকমের একটু অভ্যাস (practice) চাই; বিনা অভ্যাসে কোন কাজটা হয়?

সচরাচর বোরকার আকৃতি অত্যন্ত মোটা (coarse) হইয়া থাকে। ইহাকে কিছু সুদর্শন (fine) করিতে হইবে। জুতা কাপড় প্রভৃতি যেমন ক্রমশ উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ বোরকারও উন্নতি প্রার্থনীয়। যে বেচারা (বোরকা) সুদূর আরব হইতে এ দেশে আসিয়াছে, তাহাকে হঠাৎ নির্বাসিত করিলেই কি আমরা উন্নতির সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠিব?

সম্প্রতি আমরা যে এমন নিস্তেজ, সঙ্কীর্ণমনা ও ভীরু হইয়া পড়িয়াছি, ইহা অবরোধে থাকার জন্য হয় নাই—শিক্ষার অভাবে হইয়াছে। সুশিক্ষার অভাবেই আমাদের হৃদয়বৃত্তিগুলি এমন সংকুচিত হইয়াছে। ললনাকুলের ভীরুতা ক্রমে বালকদের হৃদয়ে সংক্রামিত হইতেছে। পঞ্চম বর্ষীয় বালক যখন দেখে যে তাহার মাতা পতঙ্গ দর্শনে মূর্ছিতা হন, তখন কি সে ভাবে না যে পতঙ্গ বাস্তবিকই কোন ভয়ানক বস্তু?

এইখানে বলিয়া রাখি যে কীট পতঙ্গ দেখিয়া মূর্ছা যাওয়ার দোষে কেবল আমরা দোষী নহি। সুসভ্যা ইংরাজ রমণীও এ অপবাদ হইতে মুক্তি পান না। "গালিভরের ভ্রমণ" নামক পুস্তকে ("Gullivers' Travels" এ) দেখা যায়, যখন ডাক্তার গালিভর "ব্রব্‌ডিঙ্গন্যাগ" (Brobdingnag) দের দেশে গিয়া শস্যক্ষেত্রে সভয়ে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন একজন ব্রব্‌ডিঙ্গন্যাগ তাঁহাকে হাতে তুলিয়া লইয়া আপন স্ত্রীকে দেখাইতে গেল! ইংরাজ-ললনা যেমন কীট পতঙ্গ বা মাকড়সা দেখিয়া ভীত হন, ব্রব্‌ডিঙ্গন্যাগ রমণীও তদ্রূপ ডাক্তার গালিভরকে দেখিয়া ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল!! কারণ দীর্ঘকায়া ব্রব্‌ডিঙ্গন্যাগ রমণী ডাক্তারকে একটি ক্ষুদ্র কীট-বিশেষ মনে করিয়াছিল!! তাই বলি পর্দা ছাড়িলেও পতঙ্গ-ভীতি দূর হয় না!

পতঙ্গ-ভীতি দূর করিবার জন্য প্রকৃত সুশিক্ষা চাই—যাহাতে মস্তিষ্ক ও মন উন্নত (brain ও mind cultured) হয়। আমরা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে সমাজও উন্নত হইবে না। যতদিন আমরা আধ্যাত্মিক জগতে পুরুষদের সমকক্ষ না হই, ততদিন পর্যন্ত উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। আমাদিগকে সকল প্রকার জ্ঞানচর্চা করিতে হইবে।

শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত হইয়াছি। অযোগ্য হইয়াছি বলিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছি। অদূরদর্শী পুরুষেরা ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্য এতদিন আমাদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিতেন। এখন দূরদর্শী ভ্রাতাগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে ইহাতে তাঁহাদের ক্ষতি ও অবনতি হইতেছে। তাই তাঁহারা জাগিয়া উঠিতে ও উঠাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন। আমি ইতঃপূর্বেও বলিয়াছি যে "নর ও নারী উভয়ে মিলিয়া একই বস্তু হয়। তাই একটিকে ছাড়িয়া অপরটি সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না" এখনও তাহাই বলি। এবং আবশ্যক হইলে ঐ কথা শতবার বলিব।

এখন ভ্রাতাদের সমীপে নিবেদন এই—তাঁহারা যে টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া কন্যাকে জড় স্বর্ণ মুক্তার অলঙ্কারে সজ্জিত করেন, ঐ টাকা দ্বারা তাহাদিগকে জ্ঞান-ভূষণে অলঙ্কৃতা করিতে চেষ্টা করিবেন। একখানা জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠে যে অনির্বচনীয় সুখ লাভ হয়, দশখানা অলঙ্কার পরিলে তাহার শতাংশের একাংশ সুখও পাওয়া যায় না। অতএব শরীর-শোভন অলঙ্কার ছাড়িয়া জ্ঞান-ভূষণ লাভের জন্য ললনাদের আগ্রহ বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ অমূল্য অলঙ্কার :

"চোরে নাহি নিতে পারে করিয়া হরণ,
জ্ঞাতি নাহি নিতে পারে করিয়া বণ্টন,
দান কৈলে ক্ষয় নাহি হয় কদাচন,
এ কারণে বলে লোকে বিদ্যা মহাধন।"

আমি আরো দুই চারি পংক্তি বাড়াইয়া বলি :

অনলে না পারে ইহা করিতে দহন,
সলিলে না পারে ইহা করিতে মগন,
অনন্ত অক্ষয় ইহা অমূল্য রতন,—
এই ভূষা সঙ্গে থাকে যাবত জীবন!

তাই বলি অলঙ্কারের টাকা দ্বারা "জেনানা স্কুলের" আয়োজন করা হউক। কিন্তু ভগ্নীগণ যে স্কুল লাভের জন্য সহজে গহনা ত্যাগ করিবেন, এরূপ ভরসা হয় না। দুঃখের কথা কি বলিব,—আমার ভগ্নীদিগকে বোধ হয় এক প্রকার গৃহ-সামগ্রীর মধ্যে গণনা করা হয়! তাই টেবিলটা যেমন ফুল পাতা দিয়া সাজান হয়; জানালার পর্দা টা যেমন ফুলের মালা, পুঁতির মালা বা তদ্রূপ অন্য কিছু দ্বারা সাজান হয়, সেইরূপ গৃহিণী আপন পুত্র-বধূটিকেও একরাশি অলঙ্কার দ্বারা সাজান আবশ্যক বোধ করিয়া থাকেন! সময় সময় ভ্রাতাগণ আমাদিগকে "সোনা-রূপা রাখিবার স্তম্ভ (stand) বিশেষ" বলিয়া বিদ্রূপ করিতেও ছাড়েন না! কিন্তু "চোর না শুনে ধরম কাহিনী"!

যাহা হউক, পর্দা কিন্তু শিক্ষার পথে কাঁটা হইয়া দাঁড়ায় নাই। এখন আমাদের শিক্ষয়িত্রীর অভাব আছে। এই অভাবটি পূরণ হইলে এবং স্বতন্ত্র স্কুল কলেজ হইলে

যথাবিধি পর্দা রক্ষা করিয়াও উচ্চশিক্ষা লাভ হইতে পারে। প্রয়োজনীয় পর্দা কম করিয়া কোন মুসলমানই বোধ হয় শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন না।

আমাদের মতের সহিত ছোটলাট বাহাদুরের মতের কি আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়।

আশা করি, এখন আমাদের উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্তা ভগ্নীগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে বোরকা জিনিসটা মোটের উপর মন্দ নহে।

গৃহ

গৃহ বলিলে একটা আরাম বিরামের শান্তি-নিকেতন বুঝায়—যেখানে দিবাশেষ গৃহী কর্মক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম করিতে পারে। গৃহ গৃহীকে রৌদ্র বৃষ্টি হিম হইতে রক্ষা করে। পশু পক্ষীদেরও গৃহ আছে। তাহারাও স্ব স্ব গৃহে আপনাকে নিরাপদ মনে করে। ইংরাজ কবি মনের আবেগে গাহিয়াছেন :

"Home, sweet home;
There is no place like home.
Sweet sweet home."

পিপাসা না থাকিলে জল যেমন উপাদেয় বোধ হয় না, সম্ভবত সেইরূপ গৃহ ছাড়িয়া কতকদিন বিদেশে না থাকিলে গৃহসুখ মিষ্ট বোধ হয় না। বিরহ না হইলে মিলনে সুখ নাই। পুরুষেরা যদিও সর্বদা বিদেশে যায় না, তবু সমস্ত দিন বাহিরে সংসারক্ষেত্রে থাকিয়া অপরাহ্নে গৃহে ফিরিয়া আসিবার জন্য উৎসুক হয়—বাড়ি আসিলে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

আবাস বিশ্লেষণ করিলে দুই অংশ দেখা যায়—এক অংশ আশ্রয়স্থান, অপরাংশ পারিবারিক জীবন (অর্থাৎ Home)। গৃহরচনা স্বাভাবিক; বিহগ বিহগী পরস্পরে মিলিয়া নীড় নির্মাণ করে, শৃগালেরও বাসযোগ্য গর্ত প্রস্তুত হয়। ঐ নিলয় ও গর্তকে আলয় বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা প্রকৃত "গৃহ" নয়। সে যাহা হউক,—পশুদের "গৃহ" আছে কি না এস্থলে তাহা আলোচ্য নয়। এখন আমাদের গৃহ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে চাই। আমাদের সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখি, অধিকাংশ ভারত নারী গৃহসুখে বঞ্চিতা। যাহারা অপরের অধীনে থাকে, অভিভাবকের বাড়িকে আপন ভবন মনে করিতে যাহাদের অধিকার নাই, গৃহ তাহাদের নিকট কারাগার তুল্য বোধ হয়। পারিবারিক জীবন যে সুখী নহে, যে নিজেকে পরিবারের একজন গণ্য (member) বলিয়া মনে করিতে সাহসী নহে , তাহার নিকট গৃহ শান্তি-নিকেতন বোধ হইতে পারে না। কুমারী, সধবা, বিধবা—সকল শ্রেণীর অবলার অবস্থাই শোচনীয়। প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি অন্তঃপুরের একটু একটু নমুনা দিতেছি। এরূপে অন্তঃপুরের পর্দা উঠাইয়া ভিতরের দৃশ্য দেখাইলে আমার ভ্রাতৃগণ অত্যন্ত ব্যথিত হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু কি করি—নালীঘার অস্ত্র চিকিৎসার একান্ত প্রয়োজন! ইহাতে রোগীর অতীব যন্ত্রণা হইলেও তাহা রোগীর সহ্য করা উচিত। উপরের চর্মাবরণ খানিকটা না কাটিলে ভিতরের ক্ষত দেখাইব কিরূপে? তাই ভ্রাতাদের নিকট অন্তঃপুরের কোন কোন অংশের পর্দা তুলিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করি।

আমি ইহা বলি না, যে আমাদের সমাজের গুণ মোটেই নাই। গুণ অনেক আছে, দোষও বিস্তর আছে। মনে করুন, একজনের এক হাত ভাল আছে, অন্য হাতে নালীঘা হইয়াছে। এক হাত ভাল আছে বলিয়া কি অন্য হাতের চিকিৎসা করা উচিত নহে? চিকিৎসা করিতে হইলে রোগের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা আবশ্যক।

অদ্য আমরা সমাজ-অঙ্গের ক্ষত স্থলের আলোচনা করিব। সমাজের সুস্থ অংশ নিশ্চিন্ত থাকুক। আমাদের সমাজে অনেক সুখী পরিবার আছেন, তাঁহাদের বিষয় আমাদের আলোচ্য নহে—তাঁহারা সুখে শান্তিতে ঘুমাইতে থাকুন। আসুন পাঠিকা! আমরা লৌহপ্রাচীর-বেষ্টিত অন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষগুলি পরিদর্শন করি।

১. বলিয়াছি ত কখন বিদেশে না গেলে গৃহ-আগমন সুখ অনুভব করা যায় না। আমরা একবার (বেহারে) জামালপুরের নিকটবর্তী কোন সহরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে আমাদের জনৈক বন্ধুর বাড়ি আছে। সে বাড়ির পুরুষের সহিত আমাদের আত্মীয় পুরুষদের বন্ধুত্ব আছে বলিয়া শরাফত[১] উকিলের বাড়ির স্ত্রীলোকদিগকে দেখিতে আমাদের আগ্রহ হয়। দেখিলাম, মহিলা কয়টি অতিশয় শান্তশিষ্ট মিষ্টভাষিণী, যদিও কূপমণ্ডূক! তাঁহারা আমাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। সেখানে শরাফতের পত্নী হাসিনা, ভগ্নী জমিলা, জমিলার কন্যা ও পুত্রবধূ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর জমিলাকে যখন আমাদের বাসায় যাইতে অনুরোধ করিলাম, তখন তিনি বলিলেন যে তাঁহারা কোন কালে বাড়ির বাহির হন না, ইহাই তাঁহাদের বংশগৌরব! কখনও ঘোড়ার গাড়ি বা অন্য কোন যানবাহনে আরোহণ করেন নাই। শিবিকা-আরোহণের কথায় "হাঁ" কি "না" বলিয়াছিলেন, তাহা আমার ঠিক মনে নাই! আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "তবে আপনারা বিবাহ করিয়া শ্বশুরবাড়ি যান কিরূপে? আপনার ভ্রাতৃবধূ আসিলেন কি করিয়া?" জমিলা উত্তর দিলেন, "ইনি আমাদের আত্মীয়-কন্যা—এ পাড়ায় কেবল আমাদেরই গোষ্ঠীর বাড়ি পাশাপাশি দেখিবে।" এই বলিয়া তিনি আমাকে অন্য একটা ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "এই আমার কন্যা বাড়ি; এখন আমার বাড়ি চল।" তিনি আমাকে একটা অপ্রশস্ত গলির (ইহার একদিকে ঘরবাড়ি, অন্যদিকে উচ্চ প্রাচীর) ভিতর দিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। তাঁহার সকলগুলি কক্ষ দেখাইলেন। কক্ষগুলি "অসূর্যম্পশ্য" বলিয়া বোধ হইল। অতঃপর একটি দ্বার খুলিলে দেখিলাম অপরদিকে হাসিনার পুত্রবধূ আছে!— জমিলা বলিলেন, "দেখিলে, এই দ্বারের ওপার্শ্বে আমার ভাইএর বাড়ি, এপার্শ্বে আমার বাড়ি। ও কক্ষে বধূ থাকেন বলিয়া এ দ্বারটি বন্ধ রাখি। আমাদের সওয়ারির দরকার হয় না কেন, তাহা এখন বুঝিলে?" ঐরূপে সকল বাড়িই প্রদক্ষিণ করা যায়। সমস্ত মহাল্লাটা পর্যটন করা আমার অভিপ্রেত না থাকায় আমরা গৃহতুল্য বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। জমিলা বলিয়াছেন, তিনি শীঘ্রই মক্কা শরীফ যাইবেন,— এ পাপদেশে তাঁহার আর থাকিবার ইচ্ছা নাই! আমরা আশা করি, তিনি মক্কা শরীফ হইতে ফিরিয়া আসিলে গৃহ-আগমন সুখটা অনুভব করিবেন।

পাঠিকা কি মনে করেন যে হাসিনা বা জমিলা গৃহে আছেন? অবশ্য না; কেবল চারি প্রাচীরের ভিতর থাকিলেই গৃহে থাকা হয় না। এ দেশে বাসরঘরকে "কোহ্‌বর" বলে, কিন্তু "কবর" বলা উচিত!! বাড়িখানা ত শরাফতের, সেখানে যেমন এক পাল

ছাগল আছে, হংস কুক্কুট আছে, সেইরূপ একদল স্ত্রীলোকও আছেন! অথবা স্ত্রীলোকদের "বন্দিনী" বলা যাইতে পারে! যেহেতু তাঁহাদের পারিবারিক জীবন নাই! আপনার নিজের বাড়ির কথা মনে করুন! তাহা হইলে হাসিনার অবস্থা বুঝিবেন।

২. অনেক পরিবারের গৃহিণীদের সম্বন্ধে এরূপ বলা যাইতে পারে– "বাহার মিঁয়া হফ্‌ত্‌ হাজারী, ঘরমেঁ বিবি কাহাৎ কি মারী।" অর্থাৎ, বাহিরে ত যথেষ্ট জাঁকজমক– যেন স্বামী সাতহাজার সেনার অধিনায়ক; আর অন্তঃপুরে গৃহিণী দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতা!! বাহিরে বৈঠকখানা আছে, আস্তাবল আছে–অনেক কিছু আছে, আর ভিতরে গৃহিণীর নমাজের উপযুক্ত স্থান নাই!

৩. এখন আমরা অন্তঃপুরের ক্ষতস্থল দেখাইব। সাধারণত পরিবারের প্রধান পুরুষটি মনে করেন গৃহখানা কেবল "আমার বাড়ি"–পরিবারস্থ অন্যান্য লোকেরা তাঁহার আশ্রিতা। মালদহে কয়েকবার আমরা একজনের বাড়িতে যাতায়াত করিয়াছি। গৃহস্বামী কলিমের স্ত্রীকে আমরা কখনও প্রফুল্লমুখী দেখি নাই। তাঁহার ম্লান মুখখানি নীরবে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি আকর্ষণ করিত। ইহার কারণ এই–কয় বৎসর অতীত হইল, কলিম স্বীয় ভায়রাভাইএর সহিত বিবাদ করিয়াছেন; তাহার ফলে কলিমের পত্নী স্বীয় ভগ্নীর সহিত দেখা করিতে পান না! তিনি এতটুকু ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন না, "আমার ভগ্নী আমার নিকট অবশ্য আসিবেন।" হায়! বাড়ি যে কলিমের! তিনি যাহাকে ইচ্ছা আসিতে দিবেন, যাহাকে ইচ্ছা আসিতে দিবেন না! আবার ওদিকে ও বাড়িখানা সলিমের! সেখানে কলিমের পত্নীর প্রবেশ নিষেধ!

বলাবাহুল্য কলিমের স্ত্রীর অন্ন, বস্ত্র বা অলঙ্কারের অভাব নাই। বলি, অলঙ্কার কি পিতৃমাতৃহীনা অবলার একমাত্র ভগ্নীর বিচ্ছেদ–যন্ত্রণা ভুলাইতে পারে? শুনিলাম, তিনি সপত্নী–কণ্টক হইতেও বিমুক্ত নহেন! এরূপ অবস্থায় তাঁহার নিকট গৃহ কি শান্তিনিকেতন (sweet home) বলিয়া বোধ হয়? তিনি কি নিভৃতে নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবেন না, "আমার মত হতভাগী নিরাশ্রয়া আর নাই।"

৪. একস্থলে দুই ভ্রাতার কলহ হইল–মনে করুন, বড় ভাইটির নাম "হাম", ছোট ভাইটির নাম "সাম"। ভ্রাতার সহিত বিবাদ করিয়া হাম স্বীয় কন্যাকে বলিলেন, "হামিদা! তুমি যতদিন আমার বাড়িতে আছ, ততদিন জোবেদাকে (সামের কন্যা) পত্র লিখিতে পাইবে না।" পিতৃ-আদেশ অবশ্যই শিরোধার্য। কিন্তু হামিদা আশৈশব যে পিতৃব্যতনয়াকে ভালবাসিয়াছে, তাহাকে হঠাৎ ভুলিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে সহজ নহে। যন্ত্রণায় তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।–যে দুইটি বালিকার শৈশবের ধূলাখেলার স্মৃতি উভয়ের জীবনে বিজড়িত রহিয়াছে–দূরে থাকিয়াও যাহারা পত্রসূত্রে একত্র গ্রথিতা ছিল, আজ সেই একবৃন্তের কুসুম দুইটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া হাম গৃহস্বামিত্বের পরিচয় দিলেন! দুইটি অসহায়া অক্ষমা বালিকার কোমল হৃদয় দলিত ও চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া গৃহস্বামী স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন!! বলা বাহুল্য, জোবেদাও হামিদাকে পত্র লিখিতে অক্ষম! যদি তাহারা কোন প্রকারে পরস্পরকে চিঠি পাঠায়–তবে হামিদার পত্র সাম আটক (intercept) করেন, জোবেদার পত্র হামের কবলে পড়িয়া মারা যায়!! বালিকাদ্বয়ের রুদ্ধ-অশ্রু, হৃদয়বিদারী দীর্ঘনিশ্বাস যবনিকার অন্তরালেই বিলীন হয়! শুনা

যায়, আইন অনুসারে ১৮ (কিম্বা ২২) বর্ষীয়া কন্যার চিঠিপত্র আটক (intercept) করিতে পিতা অধিকারী নহেন। সে আইন কিন্তু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পায় না! কবি বেশ বলিয়াছেন:

"তোমরা বসিয়া থাক ধরা প্রান্তভাগে,
শুধু ভালবাস। জান না বাহিরে বিশ্বে
গরজে সংসার"—

তাইত; আইন আছে, থাকুক, তাহাতে হামিদা বা জোবেদার লাভ কি? ঐরূপ কত পত্র দেবর ভাসুর প্রভৃতি কর্তৃক অবরুদ্ধ (intercepted) হয়, কে তাহার সংখ্যা করে? বিধবা ভ্রাতৃবধূটি স্বীয় ভ্রাতা ভগিনীর চিঠিপত্র লইয়া কোনমতে কালক্ষেপ করেন—যদি আশ্রয়দাতা দেবরটি বিরক্ত হন, তবে আর তাঁহার ভ্রাতা ভগ্নীর পত্র পাইবার উপায় নাই। অসহায়া অন্তঃপুরিকাদিগকে ঈশ্বর ব্যতীত আর কে সাহায্য করিবে?

৫। আমরা রমাসুন্দরীকে অনেকদিন হইতে জানি। তিনি বিধবা; সন্তান সন্ততিও নাই তাঁহার স্বামীর প্রভূত সম্পত্তি আছে, দুই চারিটি পাকা বাড়িও আছে। তাঁহার দেবর এখন সে সকল সম্পত্তির অধীশ্বর। দেবরটি কিন্তু রমাকে একমুঠা অন্ন এবং আশ্রয়দানেও কুণ্ঠিত। আমরা বলিলাম, "ইনি হয়ত দেবর-পত্নীর সহিত কোঁদল করেন।" এ কথার উত্তরে একজন (যিনি রমাকে ১৪/১৫ বৎসর হইতে জানেন) বলিলেন, "রমা সব করিতে জানে, কেবল কোঁদল জানে না। রমা বেশ জানে, কি করিয়া পরকে আপন করিতে হয়; কেবল আপনাকে পর করিতে জানে না।"

"এত গুণ সত্ত্বেও দেবরের বাড়ি থাকিতে পান না কেন?"

"কপালের দোষ।"

হায় অসহায়া অবলা! তোমরা নিজের দোষকে "কপালের" দোষ বল বটে, কিন্তু ভুগিবার বেলা তোমরাই স্বকীয় কর্মফল ভুগিতে থাক! তোমাদের দোষ মূর্খতা, অক্ষমতা, দুর্বলতা ইত্যাদি। রমাসুন্দরী বলিলেন, "বেঁচে থাকতে বাধ্য ব'লে বেঁচে আছি; খেতে হয় ব'লে খাই—আমাদের সেই সহমরণপ্রথাই বেশ ছিল! গভর্নমেন্ট সহমরণ-প্রথা তুলে দিয়ে বিধবার যন্ত্রণা বৃদ্ধি করেছেন!" ঈশ্বর কি রমার কথাগুলি শুনিতে পান না? তিনি কেমন দয়াময়।

৬. আমরা একটি রাজবাটি দেখিতে গিয়েছিলাম। অবশ্য রাজার অনুপস্থিতি সময় যাওয়া হইয়াছিল। তিনি উপাধিপাপ্ত রাজা—রাজ্যের বার্ষিক আয় প্রায় ৫,০০,০০০ টাকা।

বাড়িখানি কবি-বর্ণিত অমরাবতীর ন্যায় মনোহর। বৈঠকখানা বিবিধ মূল্যবান সাজসজ্জায় ঝলমল করিতেছে; এদিকে সেদিকে ৫/৭ খানা রজত-আসন শূন্য হৃদয়ে রাজাকে আহ্বান করিতেছে! এক কোণ হইতে রবির একটু ক্ষীণরশ্মি একটি দর্পণে পড়িয়াছিল; তাহার প্রতিরশ্মি চারিদিকে বেল্লুরের ঝাড়ে প্রতিভাত হইয়া এক অভিনব আলোকরাজ্য রচনা করিয়া ফেলিয়াছে! এক কক্ষে রাজার রৌপ্যনির্মিত পর্যঙ্কখানা মশারি ও শয্যায় পরিশোভিত হইয়া প্রবাসী রাজার অপেক্ষা করিতেছে। পাঠিকা হয়ত বলিবেন, "খাটখানা রানী ব্যবহার করেন না কেন?" তাহা হইলে সমাগত লোকেরাও

লক্ষ টাকার পর্য্যঙ্কখানা দেখিতে পাইত না যে! বহির্বাটি পরিদর্শন করিয়া আমরা রাণীর মহলে গেলাম।

রানীর ঘর কয়খানাতেও টেবিল, টিপাই, চেয়ার ইত্যাদি সাজসজ্জা আছে। কিন্তু তাহার উপর ধূলার স্তর পড়িয়াছে। রাজা কোন কালে এসব কক্ষে পদার্পণ করেন বলিয়া বোধ হইল না। রানীর শয্যাপার্শ্বে কয়েকখানা বাঙ্গালা পুস্তক এলোমেলোভাবে ছড়ান রহিয়াছে।

রানীকে দেখিয়া আমি হতাশ হইলাম। কারণ বৈঠকখানা দেখিয়া আমি রানীর যেরূপ মূর্তি কল্পনা করিয়াছিলাম, এ মূর্তি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি পরমা সুন্দরী (১৬/১৭ বৎসরের) বালিকা—পরিধানে সামান্য লালপেড়ে বিলাতি ধুতি; অলঙ্কার বলিতে হাতে তিন তিন গাছি বেল্লুরের চুড়ি, মাথায় রুক্ষ কেশের জটা—অনুমান পনের দিন হইতে তৈলের সহিত চুলগুলির সাক্ষাৎ হয় নাই, মুখখানি এমনই করুণভাবে পূর্ণ যে রানীকে মূর্তিমতী "বিষাদ" বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনেকের মতে চক্ষু মনের দর্পণ স্বরূপ। রানীর নয়ন দু'টিতে কি কি হৃদয়বিদারক ভাব ছিল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম।

রাজা সর্বদা বিদেশে,—বেশির ভাগে কলিকাতায় থাকেন। সেখানে তাঁহার অপ্সরা, বিদ্যাধরীর অভাব হয় না, এখানে রাণী বেচারি চিরবিরহিণী! বাড়িতে দাস-দাসী, ঠাকুর দেবতা, পুরোহিত ইত্যাদি সবই আছে; আনন্দ কোলাহলও যথেষ্ট আছে, কেবল রানীর হৃদয়ে আনন্দ নাই! গৃহখানা তাঁহার নিকট কারাগার স্বরূপ বোধ হইতেছে। রানী যেন একদল দাসীসহ নির্জ্জন কারাবাসদণ্ডভোগ করিতেছেন!! আমাদের সঙ্গীয়া একটি মহিলা জনান্তিকে বলিলেন, "এমন চমৎকার বাড়ি, আর ঘরে এমন পরী যাঁর, তিনি কি সুখে বিদেশে থাকেন!"

রানী বাঙ্গালা বেশ জানেন; তিনি কেবল বই পড়িয়া দুর্বহ সময় কাটান। তিনি—মিতভাষিণী, বেশি কিছু বলিলেন না, কিন্তু যে দুই একটি কথা বলিলেন, তাহা অতি চমৎকার। আমাদের একটি বর্ষীয়সী সঙ্গিনী বলিলেন, "তুমি রাজার রাণী, তোমার এ বেশ কেন? এস আমি চুল বেঁধে দেই।" রানী উত্তর দিলেন, "জানি না কি পাপে রানী হয়েছি!" ঠিক কথা! অথচ লোকে এই রানীর পদ কেমন বাঞ্ছনীয় বোধ করে!

অন্তঃপুরের ঐ সকল ক্ষতকে নালীঘা না বলিয়া আর কি বলিব? এ রোগের কি ঔষধ নাই? বিধবা ত সহমরণ-আকাঙ্ক্ষা করে; সধবা কি করিবে?

৭. "মহম্মদীয় আইন" অনুসারে আমরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হই—"আমাদের বাড়ি"ও হয়। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়,—বাড়ির প্রকৃত কর্তা স্বামী, পুত্র, জামাতা, দেবর ইত্যাদি হ'ন। তাঁহাদের অভাবে বড় আমলা বা নায়েবটি বাড়ির মালিক! গৃহকর্ত্রীটি ঐ নায়েবের ক্রীড়াপুতুল মাত্র। নায়েব কর্ত্রীকে যাহা বুঝায়, অবোধ নিরক্ষর কর্ত্রী তাহাই বুঝেন।

গৃহকর্ত্রী মোহসেনা স্বীয় জামাতার সহিত কলহ করিয়া দুই এক দিনের জন্য কোন দূর সম্পর্কীয় দেবর কাসেমের বাড়ি যান। এ বাড়িখানা মোহসেনার পৈতৃক সম্পত্তি—সুতরাং ইহা তাঁহার একান্ত "আপন" বস্তু। কর্ত্রীর একমাত্র দুহিতাও মারা গিয়াছেন; তবু

তিনি জামাতাকে (দুই চারিজন দৌহিত্রী ইত্যাদি সহ) বাড়িতে রাখিয়াছেন। এরূপ স্থলে জামাতা জামালকে শাশুড়ির আশ্রিত বলা যাইতে পারে। কিন্তু তামাসা দেখুন, মোহসেনা গৃহে ফিরিয়া আসিলে, দ্বারবান তাঁহাকে জানাইল, এ বাড়িতে তাঁহার প্রবেশ নিষেধ! তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন— "কি? আমার বাড়িতে আমারই প্রবেশ নিষেধ? পর্দা কর, আমি (শিবিকা হইতে) নামিব।"

দ্বারবান—পর্দা করিতে পারি না, মালিকের হুকুম নাই।

কর্ত্রী—কে তোর মালিক? একমাত্র মালিক ত আমি!

দ্বারবান—বে-আদবী মাফ হউক; হুজুর কি আমাকে তাঁহার পয়জার হইতে রক্ষা করিতে পারেন? হুজুর ত পর্দা য় থাকেন, আমরা জামাল মিয়াঁকেই জানি। আপনি মালিক, তাহা ত দুনিয়া জানে;—কিন্তু আমার প্রতি দয়া করিয়া আপনি ফিরিয়া যান। আপনি এখানে নামিলে গোলামের উপর জুলুম হবে। হুজুরেরও অপমান হওয়ার সম্ভাবনা।

যাহা হউক, হুজুর ফিরিয়া গেলেন!! তিনি কাসেমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন কি কোন আইন নাই, যাহার দ্বারা আমার বাড়ি আমি দখল করিতে পারি?" কাসেম বলিলেন, "আছে। আপনি নালিশ করুন, আমরা সাহায্য করিব।" ওদিকে জামাল এই নালিশের বিষয় জানিতে পারিয়া কাসেমের নিকট আসিলেন। সবিনয়ে মিষ্ট ভাষায় কাসেমকে বুঝাইলেন, "আজ আপনি যদি আমার শাশুড়ির সাহায্য করেন, তবে ত অন্তঃপুরিকাদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। যদি কখন আপনার এরূপ বিপদ ঘটে তবে কেহ আপনার পরিবারের স্ত্রীলোকদের সাহায্য করিবে, আপনি কি তাহা পছন্দ করিবেন? ভাবিয়া দেখুন, এরূপ হওয়া কি ভাল? মিছামিছি শত্রুতা পাতাইবেন কেন?"

কাসেম অন্তঃপুরে আসিয়া মোহসেনাকে বুঝাইলেন যে, মামলা মোকদ্দমায় অনেক হেঙ্গাম; ওসব গোলমাল না করাই ভাল! অভাগিনী ক্রোধে, অভিমানে নীরবে দগ্ধ হইতে থাকিলেন!!

ঐরূপ আরও কত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। খদিজা প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, তাঁহার স্বামী হাশেম দরিদ্র কিন্তু কুলীন বিগ্নান। হাশেম ছলে কৌশলে সমস্ত জমিজমা আত্মসাৎ করিয়া লইলেন; খদিজার হাতে এক পয়সা নাই। খদিজার পৈত্রিক বাড়িতে বসিয়াই হাশেম আর দুই তিনটা বিবাহ (?) করিয়া তাঁহাকে সতিনী জ্বালায় দগ্ধ করিতে লাগিলেন! এরূপ না করিলে আর ক্ষমতাশালী পুরুষের বাহাদুরী কি? ইহাতে যদি খদিজা সামান্য বিরক্তি প্রকাশ করেন, তবে প্রবীণা মহিলাগণ তাঁহার হৃদয়ে স্বামীভক্তির অভাব দেখিয়া নিন্দা করেন, কেহ দুই একটা জীর্ণ পুঁথি (মসলামসায়েলের বঙ্গানুবাদ) দেখাইয়া বলেন, "স্বামী মাথা কাটিলে 'আহ্' বলিতে নাই!" কেহ সুরযোগে আবৃত্তি করিলেন :

"নারীর মোর্সেদ স্বামী সের্তাজ জানিবে
মোর্সেদের সম নারী পতিকে ভজিবে!"

যাহা হউক খদিজার দুঃখে সহানুভূতি করিবে, এমন লোকটি পর্যন্ত নাই! ইহাকে নরকযন্ত্রণা ভিন্ন আর কি বলিব? কোন মৌলভী বক্তৃতা (ওয়াজ) করিতে যাইয়া

বলিয়াছেন, "স্ত্রীলোকে বেশি গুণা (দোষ) করে; হযরত মেয়ারাজ গিয়া দেখিয়াছেন নরকে বেশির ভাগে স্ত্রীলোক শাস্তি পাইতেছে।" আমরা কিন্তু এই পৃথিবীতেই দেখিতেছি– কুলকামিনীরা অসহ্য নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন!

৮. পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ হইতে কন্যাকে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত কি কি জঘন্য উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে, তাহা কে না জানে? কোন ভ্রাতা তাহা মুখ ফুটিয়া বলেন না–বলিলে অবলাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে যে! সুতরাং সে শোচনীয় কথা আমাদিগকেই বলিতে হইতেছে। কোন স্থলে আফিংখোর, গাঁজাখোর, নিরক্ষর, চিররোগী বৃদ্ধ–যে মোকদ্দমা করিয়া জমিদারীর অংশ বাহির করিতে অক্ষম এইরূপ লোককে কন্যাদান করা হয়! অথবা ভগ্নীর দ্বারা বিবাহের পূর্বেই লা-দাবী লিখাইয়া লওয়া হয় কিম্বা ভগ্নীদিগকে চিরকুমারী রাখা হয়; এবং ভ্রাতৃবধূ ননদদিগকে দাসীর মত ভাবেন! আর যদি কোন পরিবারে পুত্র মোটেই না থাকে, কেবল ডজন, অর্ধ ডজন কন্যাই থাকে,–তবে জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর ভাগ্যবান স্বামীটি অবশিষ্ট শ্যালিকা কয়টিকে চিরকুমারী রাখিতে চেষ্টা করেন! ইহাই সমাজের নালীঘা!! হায় পিতা মোহাম্মদ (দ)! তুমি আমাদের উপকারের নিমিত্ত পিতৃসম্পত্তিতে অধিকারিণী করিয়াছ, কিন্তু তোমার সুচতুর শিষ্যগণ নানা উপায়ে কুলবালাদের সর্বনাশ করিতেছে!! আহা! "মহম্মদীয় আইন" পুস্তকের মসি-রেখারূপে পুস্তকেই আবদ্ধ থাকে। টাকা যার, ক্ষমতা যার আইন তাহারই আইন আমাদের ন্যায় নিরক্ষর অবলাদের নহে!

৯. নববিধবা সৌদামিনী দুই পুত্র ও এক কন্যাসহ ভ্রাতার আলয়ে আশ্রয় লইয়াছেন। ৯/১০ মাস পরে তাঁহার (১৫ ও ১২ বৎসরের) পুত্র দুইটি দশ দিনের ভিতর মারা যায়। সৌদামিনীর নিকট ১০,০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ ছিল।

যে সময় বিধবা সৌদামিনী পুত্রশোকে পাগলপ্রায় ছিলেন, সেই সুযোগে (অর্থাৎ বালকদ্বয়ের মৃত্যুর একমাস পরেই) ভ্রাতা নগেন্দ্র ঐ টাকাগুলি তাঁহারই নামে গচ্ছিত রাখিতে ভগ্নীকে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন, "স্ত্রীলোকের নামে টাকা জমা থাকলে গোলমাল হ'তে পারে। আমি ত আর তোমার পর নই।" ভগ্নীর মাথা ঠিক ছিল না, নগেন্দ্র যাহা লিখাইলেন তিনি তাহাই লিখিলেন। ভাবিলেন, "অমন চাঁদ যদি গিয়াছে, তবে আর পোড়ার টাকা থেকে কি হবে? প্রতিভার বিয়ে ত নগেন্দ্র দিবেই। আমি এখন ম'লে বাঁচি।" নগেন্দ্র ক্রমে দুই তিনটা কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইলেন কিন্তু প্রতিভার বিবাহের জন্য মোটেই ভাবেন না। তাহার বয়স ১২ বৎসর হইলে সৌদামিনী তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইলেন। তিনি যত তাড়া করেন, নগেন্দ্র ততই বলেন, "বর পাওয়া যায় না!"

প্রতিভা ১৫ বৎসরের হইল–বিবাহ হইল না। ১০,০০০ টাকা দিয়া বর পাওয়া যায় না, একথা কি পাঠিকা বিশ্বাস করেন? প্রতিবেশিনীরা নিন্দা করে, অভিশাপ দেয়, "ছি ছি কেমন মামা!" বলে, তাহাতে নগেন্দ্রের কি ক্ষতি হয়! পল্লিগ্রামের নিন্দা অপবাদ চতুপার্শ্বস্থিত শস্যক্ষেত্রেই বিলীন হয়। প্রকাণ্ড পাটক্ষেত্রে বড় বড় শূকর লুক্কায়িত থাকিতে পারে, আর ঐ নিন্দাটুকু লুকাইতে পারিবে না।

এখন সৌদামিনী দেখিলেন তাঁহার স্বামীর কষ্টে উপার্জিত টাকা দ্বারা নগেন্দ্রের অবস্থা ভাল হইল, কন্যাদের বিবাহ হইল— কেবল তাঁহারই একমাত্র প্রতিভা কুমারী রহিল!!

ভগ্নী মানকুমারী বলিয়াছেন :

"কাঁদ তোরা অভাগিনী। আমিও কাঁদিব,
আর কিছু নাহি পারি, ক' ফোঁটা নয়ন বারি
ভগিনী! তোদেরি তরে বিজনে ঢালিব;
যখন দেখিব চেয়ে অনূঢ়া "প্রাচীনা মেয়ে"
কপালে যোটেনি বিয়ে—তখনি কাঁদিব,
যখন দেখিব বালা সহিত্যে সতিনি জ্বালা
তখনি নয়ন জলে বুক ভাসাইব;
সধবা বিধবা প্রায় পরান্ন মাগিয়া খায়—
দেখিলে কাঁদিয়া তার যমেরে ডাকিব,
এ তুচ্ছ এ হীন প্রাণ দিতে পারি বলিদান—
তোদেরি কল্যাণে বোন্! কিন্তু কি করিব?
কাঁদিতে শকতি আছে, কাঁদিয়া মরিব।"

আমি কিন্তু তাঁহার সহিত একমত হইয়া কাঁদিবার সুরে সুর মিলাইতে পারিতেছি না। আমার ভগ্নীটি অবশেষে সবখানি শক্তি কেবল "কাঁদিয়া মরিতে" ব্যয় করিলেন! বাস! ঐরূপ বিজনে অশ্রু ঢালিয়া ঢালিয়াই ত আমরা এমন অবলা হইয়া পড়িয়াছি।

আমার এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ভ্রাতা ভগ্নীগণ হয়ত মনে করিবেন যে আমি কেবল ভ্রাতৃবৃন্দকে নরাকারে পিশাচরূপে অঙ্কিত করিবার জন্যই কলম ধরিয়াছি। তাহা নয়। আমি ত কোথাও ভ্রাতাদের প্রতি কটু শব্দ ব্যবহার করি নাই—কাহাকেও পাপিষ্ঠ, পিশাচ, নিষ্ঠুর বলিয়াছি কি? কেবল রমণীহৃদয়ের ক্ষত দেখাইয়াছি। ঐ যে কথায় বলে, "বলিতে আপন দুঃখ পরনিন্দা হয়", এক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে—ভগ্নীর দুঃখ বর্ণনা করিতে ভ্রাতৃনিন্দা হইয়া পড়িয়াছে।

সুখের বিষয় আমাদের অনেক ভ্রাতা এরূপ আছেন, যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে যথেষ্ট শান্তিতে গৃহসুখে রাখেন। কিন্তু দুঃখের সহিত আমরা ইহাও বলিতে বাধ্য যে অনেক ভ্রাতা আপন আপন বাটিতে অন্যায় স্বামীত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন।

এখন বোধ হয় সুযোগ্য ভ্রাতৃগণ বুঝিবেন যে "এত বড় সংসারে আমরা নিরাশ্রয়া" বলিয়া আমি ভুল করি নাই—ঐ কথার প্রতিবর্ণ সত্য। আমরা যে কোন অবস্থায় থাকি না কেন, অভিভাবকের বাটিতে থাকি। প্রভুদের বাটি যে আমাদিগকে সর্বদাই রৌদ্র, বৃষ্টি, হিম হইতে রক্ষা করে, তাহা নহে। তবু :

যখন আমাদের চালের উপর খড় থাকে না, দরিদ্রের জীর্ণতম কুটিরের শেষ চালখানা ঝঞ্ঝানিলে উড়িয়া যায়,—টুপ-টাপ বৃষ্টিধারায় আমরা সমস্ত রাত্রি ভিজিতে থাকি,—চপলা-চমকে নয়নে ধাঁধা লাগে,—বজ্রনাদে মেদিনী কাঁপে, এবং আমাদের বুক কাঁপে,—প্রতি মুহূর্তে ভাবি, বুঝি বজ্রপাতে মারা যাই—তখনও আমরা অভিভাবকের বাটিতেই থাকি!

যখন আমরা রাজকন্যা, রাজবধূরূপে প্রাসাদে থাকি, কখনও প্রভু-গৃহে থাকি। আবার যখন ঐ প্রাসাদতুল্য ত্রিতল অট্টালিকা ভূমিকম্পে চূর্ণ হয়,—সোপান অতিক্রম করিয়া অবতরণ কালে আমাদের মাথা ভাঙ্গে, হাত পা ভাঙ্গে—রক্তাক্ত কলেবরে হতজ্ঞান প্রায় অবস্থায় গোশালায় গিয়া আশ্রয় লই,—তখনও অভিভাবকের বাটিতে থাকি!!

অথবা গৃহস্থের বৌ-ঝী রূপে প্রকাণ্ড আটচালায় বাস করিলেও প্রভুর আলয়ে থাকি; আর যখন চৈত্র মাসে ঘোর অমানিশীথে প্রভুর বাটীতে দুষ্টলোক কর্তৃক লঙ্কাকাণ্ডের অভিনয় হয়,—সব জিনিসপত্রসহ ঘরগুলি দাউদাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে,—আমরা একবসনে প্রাণটি হাতে করিয়া কোনমতে দৌড়াইয়া গিয়া দূরস্থিত একটা কুলগাছতলে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে থাকি,—তখনও অভিভাবকের বাড়িতে থাকি!!! (জানি না, কবরের ভিতরও অভিভাবকের বাড়িতে থাকা হয় কি না!!)

ইংরাজীতে Home বলিলে যাহা বুঝায়, "গৃহ" শব্দ দ্বারা আমি তাহাই বুঝাইতে চাই। উপরে যে রানী, রমা, হামিদা, জোবেদা প্রভৃতির অবস্থা বলা হইয়াছে, তাঁহারা কি গৃহসুখ ভোগ করিতেছেন? শারীরিক আরাম ও মানসিক শান্তিনিকেতন যাহা, তাহাই গৃহ। বিধবা হইলে স্বামীগৃহ একরূপ বাসের অযোগ্য হয়; হতভাগিনী তখন পিতা, ভ্রাতার শরণাপন্ন হয় কিন্তু তাহাতে তাহার যে দশা হয়, সৌদামিনী-চিত্রে বর্ণিত হইয়াছে। একটা হিন্দি প্রবাদ আছে :

"ঘর কি জ্বলি বনমেঁ গেয়ী—বনমেঁ লাগি আগ
বন বেচারা কেয়া করে,—কর্‌মমেঁ লাগি আগ!"

অর্থাৎ "গৃহে দগ্ধ হইয়া বনে গেলাম, বনে লাগিল আগুন; বন বেচারা কি করিবে, (আমার) কপালেই লাগিয়াছে আগুন!"

তাই বলি, গৃহ বলিতে আমাদেরই একটি পর্ণকুটীর নাই। প্রাণি-জগতে কোন জন্তুই আমাদের মত নিরাশ্রয়া নহে। সকলেরই গৃহ আছে—নাই কেবল আমাদের।

রসনা-পূজা

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু পূজা করিয়া থাকে। কেহ অগ্নি উপাসক, কেহ চন্দ্র-সূর্যের উপাসক, কেহ জড়-পুত্তলিকা উপাসক, ইত্যাদি। কেবল নিষ্ঠাবান মুসলমান অদ্বিতীয় ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন বস্তুর উপাসনা করেন না। কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজ রসনা-পূজা করিয়া থাকেন। যদি আমি ইহাদিগকে "রসনা-পরস্ত" (রসনা উপাসক) বলি, তবে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। এবং নিম্নশ্রেণীর মুসলমান সমাজে 'বূতপরস্তি'-ও যে প্রবেশ করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। যেহেতু দেবতাদের অনুকরণে অনেকগুলি পীরের নাম শুনা যায়—এক এক প্রকার বিপদে এক এক পীরের অনুগ্রহ লাভের নিমিত্ত "নজর ও নেয়াজ" দিতে হয়! যাহাকে ক্ষিপ্ত কুকুর দংশন করে, সে বেচারা, "কোত্তা (কুকুর) পীরের দরগাহে" (মন্দিরে?) গিয়া "নজর" (দর্শনী) মানস করিয়া আইসে! হঠাৎ কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে "আচানক (হঠাৎ) পীরের" উদ্দেশ্যে রোজা রাখা হয়!! সম্ভবত পা খোঁড়া হইলে "লঙ্গর শাহের দরগাহে" "শিন্নী" লইয়া যাইতে হয়!!

ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর পূজা করিলে আত্মার অধঃপতন হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রকার অবনতিও হয়। আমাদের দুর্গতি ও অবনতির কারণ অনেকে অনেক রূপে অনুমান করেন; আমার বোধ হয় রসনা-পূজা ইহার অন্যতম কারণ। স্ত্রীলোকেরা ঐ পূজার আয়োজনে সমস্ত সময় ব্যয় করেন। অন্য বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতে তাঁহাদের অবসর থাকে না। সমস্ত দিন ও অর্ধরাত্রি ত তাঁহাদের রন্ধনের চিন্তায়ই অতিবাহিত হয়, পরে নিদ্রায় স্বপ্ন দেখেন—"যাঃ! মোরব্বার সিরা (চিনির রস) জ্বলিয়া গেল!"

আমরা আহার ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারি না, সত্য। আহার দ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন হয়। মনে রাখিবেন, ভোজনের উদ্দেশ্য শরীরের পুষ্টিসাধন। কিন্তু সচরাচর আমাদের খাদ্যসামগ্রী যেরূপ হয়, তাহাতে শরীরের পুষ্টিসাধন হওয়া দূরে থাকুক, বরং ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণ, অরুচি প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া শরীরের ধ্বংস সাধন হয়। আমাদের চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়—খাদ্যগুলি কেবল রসনা-দেবের তৃপ্তির নিমিত্ত প্রস্তুত হয়।

জনৈক ডাক্তার একদা কোন ধনী মুসলমান কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "আপনার বাড়ি একদিন খেয়ে আমি তিনদিন খেতে পারি নাই। এই রকম খাবার আপনারা সর্বদাই খেয়ে থাকেন, কাজেই আপনাদের অসুখ ছাড়ে না।" ডাক্তারবাবু ঠিক বলিয়াছেন। আবার মজা এই যে, চিররুগ্ন জীবন বহন করাই ভদ্রতার লক্ষণ। কুশল প্রশ্ন করিলে কেহ সহসা উত্তর দেয় না, "সম্পূর্ণ ভাল আছি।" তাদৃশ চিররুগ্ন অবস্থা রমণী- সুলভ কোমলতা ("নাজাকৎ!") বলিয়া প্রশংসিত হয়। কেবল চাষা স্ত্রীলোকেরা সবল সুস্থ থাকে।

আহারের অত্যাচার যে কেবল ধনবানের গৃহে হয় তাহা নহে, দরিদ্রের জীর্ণ কুটিরেও সুযোগ অনুসারে রসনা-পূজা হইয়া থাকে।

শুনিতে পাওয়া যায়, কোন ডেপুটি কালেক্টর নাকি বলিতেন, "(দরিদ্র) কুলীন মুসলমান আমি বেশ চিনি। যদি কাহারও মুখ দেখিয়া চিনিতে না পারি, তবে একবার তার বাড়ি গেলে আর চিনিতে বাকি থাকে না। কুলীনের লক্ষণ এই,—

"কাহারও বাড়ি গেলে দেখিবে, চালের উপর খড় নাই, ঘরখানার চারিদিক আবর্জনাময়, বসিবার একটু স্থান নাই; মাথার উপর (চালে) মাকড়সার জাল ঝুলিতেছে, এইরূপ ত হীন অবস্থা। কিন্তু জল খাবার সময় দেখিবে, অতি উৎকৃষ্ট পারাটা, কোর্মা, কাবাব উপস্থিত—আমাদের সাত দিনের খাবার খরচ তাঁহার একদিনে ব্যয় হয়।"

যদি উক্ত কালেক্টর মহাশয় কখন কাহার বহির্বাটি দেখিয়া কুলীন চিনিতে না পারেন, তবে তিনি একবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে গৃহস্বামীর কৌলীন্য সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ থাকিবে না। কিন্তু সে ডেপুটি কালেক্টরের ভাগ্যে অন্তঃপুর দর্শন লাভ অসম্ভব। অতএব আমরা একটু নমুনা দেখাই—

প্রথমে রন্ধনশালার দিকে অগ্রসর হউন—দ্বারদেশে পচা কাদা; হংস, কুক্কুট ইত্যাদি সেই (পচা ফেনমিশ্রিত) কাদা ঘাঁটিতেছে, তাহার দুর্গন্ধে আপনার ঘ্রাণেন্দ্রিয় ত্রাহি ত্রাহি করিবে।[১] কিন্তু পশ্চাৎপদ হইবেন না।—কোনমতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিবেন কেহ

বাটনা বাটিতেছে, কেহ কুটনা কুটিতেছে, কেহ কেওড়া বা গোপাল জলে জাফরান ভিজাইতেছে ইত্যাদি। এখানকার সুগন্ধ এতই আনন্দপ্রদ (inviting) যে ব্রাহ্মণের পৈতা ছিড়িতে ইচ্ছা হইবে! পারাটা, সমোসা ভাজার সৌরভ কি চমৎকার—বলিহারি যাই! এখানকার সৌন্দর্য দেখিলেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরে যায় তৃপ্তি হয়, আহার ত দূরে থাকুক। এখানে দাঁড়াইয়া আপনার বোধ হইবে—"আঃ মরি! মরি! এ কোন সৌরভ-রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম!—এ স্বর্গ নাকি!!"

আমাদের খাদ্য সম্বন্ধীয় পরিচ্ছন্নতা সময় সময় সীমা লঙ্ঘন করে। যেমন, মাংস এত ধোওয়া হয় যে, তাহার বলকারক গুণ থাকে না, গরম জলে মাংস ধুইলে মাংসে আর থাকে কি? অন্যান্য বস্তুও প্রায় প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিষ্কার করা হয়। এই প্রকার খাদ্য দ্বারা কেবল জড় রসনার পূজা হয়।

আমরা কেবলই রসনা-পূজায় সময় কাটাই। আধ্যাত্মিক জীবন আমাদের নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জ্ঞানচর্চা ত আমরা জানিই না। সামান্য সূচিকার্য ও রন্ধন-প্রণালী কেবল আমাদের শিক্ষণীয়। ৫০০ রকমের আচার চাটনী; ৪০০ প্রকার মোরব্বা প্রস্তুত করিতে জানিলে সুগৃহিণী বলিয়া পরিচিতা হইতে পারা যায়। রমণী রাঁধুনীরূপে জন্মগ্রহণ করে, এবং মরণে বাবুর্চি জীবন লীলা সাঙ্গ করে। আমাদের সুখের চরম সীমা সচরাচর উপাদেয় খাদ্য রাঁধিতে শিক্ষা করা ও বিবিধ অলঙ্কার ব্যবহার করা পর্যন্ত! এইরূপ অত্যধিক রসনা-পূজায় বিলাসিতা বৃদ্ধি পায়। এস্থলে রসনা-পূজার কেবল ত্রিবিধ অনিষ্টের উল্লেখ করা গেল। (১) ব্যয়-বাহুল্য বা অপব্যয়, (২) শ্রম-বাহুল্য এবং (৩) স্বাস্থ্য নষ্ট। ময়দার পারাটা ও মসলা-বহুল কোর্মা সহজে পরিপাক হয় না, তাহা দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়া অসম্ভব। কারণ ঐ দুষ্পাচ্য খাদ্যের পরিপাক কার্যে আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলিকে অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। ঐ শক্তি যোগাইতে গিয়া শরীরের অন্যান্য যন্ত্র দুর্বল হইয়া পড়ে। তাদৃশ অখাদ্য রাঁধিতে গৃহিণীদের অনর্থক সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করা হয়।

শরীরের পুষ্টি সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আহার করিতে গেলে রসনা-পূজা ত্যাগ করিতে হইবে। প্রতিদিন অত ছাই-ভস্ম না খাইয়া কেবল যথানিয়মে উপযুক্ত পরিমাণে সুখাদ্য খাইলেই আহারের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। মোহনভোগ ফিরণী ইত্যাদির পরিবর্তে পাতলা দুধ খাওয়া যুক্তিসিদ্ধ।

উক্ত প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিতে অপেক্ষাকৃত সময় কম লাগে। ব্যয়ও পরিমিত হয়। ঐ অবসরটুকু অন্য সৎকার্যে ব্যয় হইতে পারে।

আমরা রসনা-পূজা করিতে বসিয়া অধঃপাতে গিয়াছি। দিল্লীর সম্রাটগণ বিলাস-স্রোতে ভাসিয়াই দিল্লী হারাইয়াছেন। এস্থলে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করা গেল। দিল্লীশ্বর মোহাম্মদ শাহের সহিত নাদির শাহ যুদ্ধ করিতেছিলেন। মোহাম্মদ শাহ ছিলেন বিলাসী-সর্বদা নানাবিধ সুস্বাদু বস্তু দ্বারা রসনা-পূজা করিতেন, তাই পরাস্ত হইয়া সিংহাসন হারাইলেন, আর নাদির শাহ রসনা-উপাসক ছিলেন না—কেবল শুষ্ক রুটি ও কাবাব খাইতেন, তাই বিজয়ী হইয়া মোহাম্মদ শাহের মুকুট ও সিংহাসন লইতে পারিলেন। দেখুন ত শুষ্ক রুটির গুণ ক্ষমতা কত! অতীতের পুরাতন কথা ছাড়িয়া দিলে,

বর্তমানে রুশ জাপান যুদ্ধও তাই দেখা যায়। রুশীয়দের অপেক্ষা জাপানিদের ভোজনের আড়ম্বর কম, অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষুদ্র জাপান অমিত তেজের পরিচয় দিতেছে। তাই দেখুন, কেবল আহার করিলে বলবৃদ্ধি হয় না। খাদ্য পরিপাক হইলে লাভ, নচেৎ না।

অল্প আহারে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় না, বরং পরামায়ু বৃদ্ধি হয়। অনেকে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। কোন কোন রোগে অন্য চিকিৎসা না করিয়া কেবল আহার পরিমিত করায় রোগীকে আরোগ্য লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। একটা প্রবাদ আছে, "যা না করে বৈদ্যে, তা করে পৈথ্যে।" রসনা সংযত করা মানুষের একান্ত কর্তব্য।

একটা বচন আছে, "মৃত্যুর পূর্বে মরিয়া থাক।" এ মরণের অর্থ ত্যাগ স্বীকার, বৈরাগ্য ইত্যাদি। মানুষ ত্যাগ না করিলে মুক্তি পাইতে পারে না। ক্রমে ক্রমে সংযম শিক্ষা না করিলে হঠাৎ বৈরাগ্য শিক্ষা হয় না। এক লাফে কে গাছের আগায় উঠিতে পারে? ক্রমশ এক পা দুই পা করিয়া উঠিতে হয়।

রোজা (উপবাস) ব্রত আমাদিগকে সংযম শিক্ষা দিয়া থাকে। এই রোজা যথানিয়মে পালন করিলে সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক বা আধ্যাত্মিক কল্যাণ হয়। মানুষ মাত্রেরই সংযম শিক্ষা আবশ্যক। এইজন্য দেখা যায়, "পৃথিবীর প্রায় সমুদয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কোন না কোন প্রকারের উপবাসব্রত বর্তমান রহিয়াছে।"[১] কারণ মানুষ জানে না, কি প্রকার খাদ্য কি পরিমাণে খাওয়া উচিত।

আক্ষেপের বিষয়, রমজান মাসে আমাদের খাদ্য-সামগ্রীর ধুমধাম সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হয়। সমস্ত দিন সাংসারিক কার্য হইতে বিরত থাকিয়া নির্মল চিত্তে উপাসান করা ত দূরে থাকুক, "ইফতারী" (সন্ধ্যাকালীন খাবার) প্রস্তুত করিতেই দিন শেষ হয়। কোথায় রসনা সংযত হইবে, না আরও রসনার সেবা বৃদ্ধি পায়। প্রকারান্তরে রোজার নাম করিয়া রসনা-পূজার মহা আড়ম্বর হয়। পূর্বে মহাপুরুষেরা সামান্য ফল-মূল বা শাক-রুটি দ্বারা সন্ধ্যায় জলপান (ইফতার) করিতেন। রাত্রিতে কি খাইবেন, দিবাভাগে খোদাকে ভুলিয়া সে চিন্তাও করিতেন না। ধর্মগুরু মোহাম্মদ (স) নিশ্চিন্তভাবে ঈশ্বরের ধ্যান করিবার আশায় সমস্ত দিন পান-ভোজন ত্যাগ করিয়া নির্জন স্থানে থাকিতেন। আর এ দেশের মুসলমানেরা তাঁহার উপযুক্ত? শিষ্য কিনা,—"ধর্ম ধর্ম" বলিয়া চিৎকার-স্বরে গগন-মেদিনী কাঁপাইয়া তোলেন,—তাই বন্ধু বান্ধবের নিমন্ত্রণে ও সন্ধ্যার খাবার আয়োজনে সমস্ত দিন ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকে!! ইহাতে রোজার উদ্দেশ্য যে কত দূর সাধিত হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

যত প্রকার উপবাস-ব্রত প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে আমাদের রোজা-ব্রতই শ্রেষ্ঠ—অবশ্য, যদি রোজার সব নিয়মগুলি যথাবিধি প্রতিপালিত হয়। ইহা দ্বারা যত উপকার হয়, তাহা এক মুখে বলিয়া শেষ করা অসাধ্য। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই তাহা বুঝেন।

খ্রিস্টীয় রোজার (গুড ফ্রাইডের) সময় ধর্মপরায়ণ খ্রিস্টানগণ শুধু পান-ভোজন ব্যতীত পাথিব সমুদয় কার্য হইতে বিরত থাকেন। সে সময় তাঁহারা কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন না এবং নিজেরাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন না, নূতন কাপড় পরেন না, একান্ত

প্রয়োজন না হইলে কোন বস্তু ক্রয় বিক্রয় করেন না,—এক কথায়, সকল প্রকার আমোদ, আহ্লাদ ভোগম বিলাস ত্যাগ করেন। এ ত্যাগ স্বীকার করায় যে অর্থ সঞ্চিত হয়, তাহা ঈশ্বরের তুষ্টির জন্য সদ্ব্যয় করেন! আমাদের "এতেকাফ" এর[৩] সহিত ঐ ব্রতের কিছু সাদৃশ্য আছে। তবে প্রভেদ এই যে, "এতেকাফের" সময় মসজিদে বসিয়া মুসলমানের ক্রয়-বিক্রয় করা নিষিদ্ধ নহে। (মৌলভী নইমুদ্দীন প্রণীত "জোব্দাতল মসায়েল" দ্রষ্টব্য)। আর খ্রিস্টানদের তাহা নিষিদ্ধ। (তবে দায়ে পড়িলে ভিন্ন কথা)। এবং আমাদের "ফেতরা"দানের সময়ও ঘরের (অতিরিক্ত) পয়সা বাহির করিতে হয়। মহাত্মা মোহম্মদ (স) হয়ত বলিয়াছিলেন যে, রোজার সময় আহার পরিমিত করায় যে খবর বাঁচিয়া যায়, তাহা দ্বারা আপন দরিদ্র প্রতিবেশীর সাহায্য কর ("ফেতরা" দাও); কিন্তু বঙ্গীয় মোসলেমগণ তাঁহার ভক্তশিষ্য, তাই উল্টা চাল চালেন; তাঁহাদের উপদেশের বিপরীত কার্য করেন। সুতরাং অন্যান্য মাসের ব্যয় অপেক্ষা রমজান মাসে তাঁহাদের ব্যয় বৃদ্ধি হয়। আমার এই কথা প্রমাণিত করিবার জন্য অন্য কোন দলিলের প্রয়োজন নাই—পাঠিকাগণ আপন আপন জমা-খরচ মিলাইয়া দেখিবেন, অন্যান্য মাসের তুলনায় রমজান শরীফের খরচ বেশি কিনা।

হিন্দুগণ সময় সময় ভীম (বা নির্জলা) একাদশী করিয়া থাকে তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় না। হিন্দু বিধবারা প্রায় দীর্ঘজীবী হয় একথা কেহ অস্বীকার করেন কি? বিধবাদের পরমায়ু বৃদ্ধির কারণ এই যে, তাঁহারা রসনা সংযত রাখেন—এক সন্ধ্যা আহার করেন।

পাদ্রীগণ বলিয়া থাকেন যে, মুসলমানের রোজায় স্বাস্থ্য ভঙ্গ ব্যতীত কোন ফল লাভ হয় না; এ কথাটি যুক্তিহীন। প্রমাণ—হিন্দু বিধবার স্বাস্থ্য। তবে "মুসলমান" নামধেয় জীবগণ যদি রোজার সব নিয়মগুলি যথাবিধি পালন না করে, সে দোষ তাহাদের,—রোজার নহে। সকল প্রকার সাংসারিক বস্তু ত্যাগ করাই প্রকৃত রোজা। (নতুবা "ধর্ম হয় না ক'রলে উপবাস।") কিন্তু সচরাচর মুসলমানেরা এই পবিত্র রোজার কি ভয়ানক অবমাননা করিয়া থাকেন!!

আমাদিগকে মুসলমান বলিলেও "মুসলমান" শব্দটির অপমান করা হয়। সুতরাং আমাদের ভণ্ড রোজার সম্বন্ধে যে পাদ্রীগণ বলেন, æWhatever is gained by fasting, is lost by feasting" (অর্থাৎ দিনে রোজার দ্বারা যে পুণ্য হয়, তাহা রাত্রির অতি ভোজনে নষ্ট হয়) তাহা ঠিক। আমাদের রোজার উদ্দেশ্য কেবল রসনা-পূজার মহা ঘটা!

কবে মুসলমান, "মানুষ" হইবে? রসনা-পূজা ছাড়িয়া ঈশ্বর-পূজা করিতে শিখিবে? জগতের অনেক জাতি জাগিয়া উঠিয়াছে, ভাল-মন্দ বুঝিয়াছে; কেবল ইহাদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। এখন ত আমাদের আর সে "জরির মসনদ" তাকিয়া বা দুগ্ধফেননিভ শুভ্র কুসুম-কোমল "শাহানা বিছানা" নাই, তবে নিদ্রা যাইতেছি কোন সুখে? আমাদের অবস্থা এখন এই প্রকার— "ঝোপড়ী মেঁ রহনা ও মহলকা খাব দেখ না!" অর্থাৎ বর্তমানে কুঁড়ে ঘরে থাকি এবং অতীতের অট্টালিকার স্বপ্ন দেখি!! একজন কবি বলিয়াছেন :

I slept and dreamt life was beauty,
I woke and found life is duty.

তাই ত জীবনটা খেলা নহে।

পরিশেষে বলি, জীবন-ধারণের নিমিত্ত আহার করিতে হয়, খাইবার আশায় জীবন-ধারণ করা উচিত বোধ হয় না। ভরসা করি, এবার রমজান শরীফে আপনারা সাবধান থাকিবেন।

'নবনূর', অগ্রহায়ণ ১৩১১

ঈদ-সম্মিলন

সংবৎসর পরে আবার ঈদ আসিল। আজি আনন্দের দিন, উৎসবের দিন, সমুদয় মোসলেম সমাজের সম্মিলনের দিন।

সারা বৎসরের অবসাদের পর আজি উৎসাহের দিন আসিয়াছে। যেন বসন্ত-সমাগমে মানবের গৃহরূপ কানে অসংখ্য প্রীতি-কুসুম ফুটিয়াছে। বালক-বালিকার দল ত মনে করে, ঈদ না জানি কি! আর তাহাদের অভিভাবকেরাও কি আত্ম-বিস্মৃত হইয়া তাহাদের আনন্দ-কোলাহলে যোগদান করেন না? আজিকার এ আনন্দ-প্রবাহে ধনীর অট্টালিকা ও দরিদ্রের দীনতম কুটির একই ভাবে প্লাবিত।

ঈদের নামাজের মূলে কি মহান ঐক্য লক্ষ্যিত হয়! সহস্র সহস্র লোক একই কাবাশরীফ লক্ষ্য করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নামাজে দাঁড়াইয়াছে;—সকলে একই সঙ্গে ওঠে, একই সঙ্গে বসে, একই সঙ্গে সহস্রাধিক মস্তক প্রভুর উদ্দেশ্যে আনত হয়। তারপর? তারপর, নামাজ সমাপ্ত হইলে পর সকলে ভ্রাতৃভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। কি সুন্দর ভ্রাতৃভাব। যাহারা প্রতিবেশীর প্রতি এতদিন কোনরূপ বিদ্বেষভাব পোষণ করিত, তাহারা আজি সে হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া গিয়াছে। আজি মসজিদে ছোট-বড় ধনী-নির্ধন এক যোগে সম্মিলিত হইয়াছে! এ দৃশ্য কি চমৎকার! এ দৃশ্য দেখিলে চক্ষু পবিত্র হয়, ক্ষুদ্র স্বার্থ, নীচ ঈর্ষা লজ্জায় দূরীভূত হয়, নিরানন্দ, মৃতপ্রায় প্রাণে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়। জাপানে একতা আছে সত্য, কিন্তু আমাদের এ অপার্থিব একতার তুলনা কোথায়? বৎসরের শুভদিনে এমন শুভ-সম্মিলন কোথায়?

কালের আবর্ত্তনে এইরূপ আরও অনেক ঈদ আসিয়াছে; আরও অনেকবার মোসলেম ভ্রাতৃগণ এমনই ঈদের নামাজে যোগ দিয়াছেন, আরও অনেক বৎসর ঈদের নবীন চন্দ্র তাঁহাদের প্রাণে এমনই করিয়া ঐক্য জাগাইয়া দিয়াছে। কিন্তু দিবাশেষে ঈদ রবির অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভ্রাতৃভাবও ম্লান হইয়াছে। যেন প্রতি বৎসর ঐরূপ অমূল্য রত্নটি আমরা মসজিদ প্রাঙ্গণে রাখিয়া আসি! অথবা একতা যেন মসজিদ প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ থাকে! বলি, এ বৎসর এ বিংশ শতাব্দীর সভ্যযুগেও কি আমাদের ঈদ সম্মিলন দিবাশেষে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইবে? না, এবার আমরা একতা সযত্নে রক্ষা করিব।

একতা মহাশক্তি; একতা আমাদের ধর্মের মূল,—আমাদের সমুদয় ধর্ম কর্মেই ঐক্য নিহিত আছে। জানি না, কোন দস্যু (আমাদিগকে অজ্ঞান-তিমির নিশীতে নিদ্রিত পাইয়া) আমাদের মহামূল্য একতানিধি অপহরণ করিয়াছে। জানি না, কাহার অভিশাপে

আমরা অভিশপ্ত হইয়াছি। তাই এখন আমরা সহোদরের সহিত মল্লযুদ্ধ করি, সহোদরার সহিত হিংসা করি, পুত্র-কন্যার অমঙ্গল কামনা করি। আমাদের ঘরে ঘরে আত্মকলহ লাগিয়া আছে। যাহাদের গৃহে পিতাপুত্রের বিবাদ, ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ? তাহারা সমস্ত সমাজটিকে "আপন"ভাবিতে পারিবে কিরূপে?

ঈদ-সমাগমে আজি আমাদের সে দুঃখ যামিনীর অবসান হউক। ঈদের বালার্কের সহিত আমাদের অন্ধকার হৃদয়ে নব-আশার নবনূর উদ্দীপ্ত হউক। সমষ্টির মঙ্গলের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ পদদলিত হউক! বলিয়াছি ত, এবার আমরা একতা মসজিদে ফেলিয়া আসিব না। আমাদের এ মহাব্রতে ঈশ্বর সহায় হউন।

আর এক কথা। এমন শুভদিনে আমরা আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃবৃন্দকে ভুলিয়া থাকি কেন? ঈদের দিন হিন্দু ভ্রাতৃগণ আমাদের সহিত সম্মিলিত হইবেন, এরূপ আশা কি দুরাশা? সমুদয় বঙ্গবাসী একই বঙ্গের সন্তান নহেন কি? অন্ধকার অমানিশার অবসানে যেমন তরুণ অরুণ আইসে, তদ্রূপ আমাদের এখানে অভিশাপের পর এখন আশীর্বাদ আসুক; ভ্রাতৃ বিরোধের স্থানে এখন পবিত্র একতা বিদ্যমান থাকুক। আমীন!

আবার বলি, আজি কি সুখের দিন—আশীর্বাদ ও সুসংবাদ লইয়া শুভ ঈদ আসিয়াছে!!

'নবনূর', পৌষ ১৩১২

আশা-জ্যোতিঃ

এখনও সূর্যোদয় হয় নাই। পূর্বাকাশে তবে ও কিসের আলোক দেখা যায়? মাত্র অমানিশা অবসানে আকাশের কোলে শুকতারা দেখা দিয়েছে; ঊষা ও বালার্ক এখনও বহুদূর।

অনেক সময় মনে করি, আমাদের উন্নতির কোনো আশা ভরসা নাই। যে দেশে পুরুষজাতি অবলার প্রতি শত্রুতাচরণই গৌরবের বিষয় মনে করে, সে দেশে আর আশা কি? কিন্তু কালের বিচিত্রগতি সবদিন সমান যায় না। এখন দেখি, দয়াময় আমাদের প্রতি সদয় কটাক্ষে চাহিয়াছেন।

বাঙ্গালি হিন্দু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু অপেক্ষা অধিক উন্নত ও সুশিক্ষিত; পক্ষান্তরে বাঙ্গালি মুসলমান পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমানের তুলনায় অনেক হীন ও অধঃপতিত। অতএব কেবল বঙ্গের কতিপয় নারীবিদ্বেষীর ক্ষুদ্রাশয়তা দর্শনে আমাদের হতাশ হওয়া উচিত নহে।

সমাজের অর্ধঅঙ্গ বিকল রাখিয়া উন্নতি লাভ করা অসম্ভব; এ রহস্য মুম্বাই, লাহোর ও আলীগড়ের মোসলেম ভ্রাতৃবৃন্দ বেশ বুঝিয়াছেন। তাই এখন আলীগড়ে স্ত্রীশিক্ষার যথাসাধ্য আয়োজন হইতেছে।

বঙ্গীয়া পাঠিকা বলিতে পারেন, "আলীগড়ে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন হইলে আমাদের লাভ কি? আমরা আছি বঙ্গদেশে—আলীগড় ত বহুদূরে। আমাদের মুক্তির উপায় কৈ?"

মুক্তির উপায় ঐ শিক্ষাবিস্তার। আমরা যদি শিক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি, তবে আলীগড়ের দূরত্ব আমাদিগকে আলীগড়ে পৌঁছিতে বাধা দিতে পারিবে না। সাধনা ব্যতীত সিদ্ধির আশা করা যায় কি? যদি মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে সুশিক্ষালাভই আধ্যাত্মিক মুক্তির উপায়, তবে শিক্ষার পথে যতই কণ্টক থাকুক না কেন, বিশ্বাসী (বিশ্বাসিনী) তাহা উৎপাটন করিতে করিতে অগ্রসর হইবেই। এবার এলাহাবাদের কুম্ভমেলায় প্রায় ৫০ লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল,—তাহারা কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহিয়াছে, শত ব্যক্তি জনতার পদচাপে নিষ্পিষ্ট হইয়াছে। তবু কি তীর্থযাত্রী পুনরায় তথায় যাইতে পশ্চাৎপদ হইবে। কখনই না। তিথি বিশেষে ব্রহ্মপুত্র নদে অসূর্যম্পশ্যা হিন্দু কুলবালারা শিবিকাসহ ডুবিয়া স্নান করেন। সুতরাং দেখিতেছেন, বিশ্বাসিনীর শুভকার্যে দুর্ভেদ্য পরদাও প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।

জ্ঞান ধর্মেরই প্রধান অঙ্গ। এককালে মোসলেম সমাজ অতিশয় উন্নত ছিল; কিসের বলে? জ্ঞান-বলে। আজি ইউরোপ ও আমেরিকা সুসভ্য, ধনাঢ্য এবং সর্ববিষয়ে উন্নত; কেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের কৃপায়। যে ক্ষুদ্র জাপানের দিকে চাহিয়া অভাগিনী বঙ্গভূমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে, তাহারও উন্নতির একমাত্র কারণ—জ্ঞান।

কোন বস্তুই ইচ্ছামাত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; তাহার জন্য পরিশ্রম করিতে হয়। আমরা জ্ঞানপিপাসা অনুভব করা মাত্রই কেহ সুভাভাণ্ড হস্তে আমাদের ঘরে ঘরে উপস্থিত হইবে না। তৃষ্ণার্তের নিকট কূপ আইসে না—পিপাসীকে কূপের নিকট যাইতে হয়। সমাজের একটি সুনীতি একতা—এই একতা স্থাপনের জন্য আলীগড় ও বাঙ্গালাকে একাকার করিতে হইবে।

আমাদের শিক্ষার অন্তরায় অনেক, জানি; বাঙ্গালি মুসলমানগণ অত্যন্ত নারীবিদ্বেষী, ইহারা উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে জ্ঞানপুরীর তোরণ রক্ষা করিতেছেন, জানি। তবু আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। সকল দেশেই কতকগুলি পুরুষ স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী হয়। ইংল্যান্ডের পুরুষসমাজ উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তা রমণীদের "ব্লুস্টকিং" বলিয়া বিদ্রূপ করেন; শিক্ষিতা বঙ্গবালাও "নভেলপাণি" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর এক চমৎকার কথা—আমরা পুরুষের রচনায় ইংল্যান্ডের সমাজের যত চিত্র না দেখিতে পাই, তাহা মহিলাদের রচনায় দেখিয়া থাকি। মিসেস হেনরী উড এবং মেরি করেলীর উপন্যাসে অনেক সামাজিক ক্ষত দৃষ্টিগোচর হয়। এমনকি মাননীয়া মেরি করেলী তাঁহার কোন উপাখ্যানের নায়িকা (ডেলিশিয়া)র প্রিয় কুকুরটিকে পুরুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন!!

যাহা হউক, এত হিংসা-বিদ্বেষ উপেক্ষা করিয়াও ইংরাজললনা মাথা তুলিয়াছেন, এবং বঙ্গীয়া (ব্রাহ্ম) ভগিনীরাও মাথা তুলিতেছেন; এবার মোসলেম ললনার পালা।

দুই বৎসর পূর্বে আমরা বলিয়াছিলাম, "আমাদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া এবং পরীক্ষক স্ত্রীলোক হওয়া কি অসম্ভব?" এখন দেখি সত্যই আলীগড়ে আমাদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষাগারের সূত্রপাত হইতেছে। ইহা কি কম সৌভাগ্যের বিষয়? অবশ্য জেনানা কলেজ এখনও সুদূর ভবিষ্যতের পরপারে। সম্প্রতি কেবল সাধারণভাবে স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইতেছে; এই স্কুলটিকে সেই ভাবী জেনানা কলেজের মাতামহী বা প্রমাতামহী বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কেহ বলিতে পারেন, তবে এখনই এত আশায়

উৎফুল্ল হওয়া কেন? আশার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমে বীজ, তৎপরে অঙ্কুর, তারপর বৃক্ষ—সর্বশেষে ফল। আজি যে দীর্ঘ তাল-তরুটি উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া গগন চুম্বন করিতেছে, তাহার বীজ কবে নিহিত হইয়াছে? অন্তত চল্লিশ বৎসর পূর্বে। অতএব আলীগড়ের "স্কুলবীজ" দেখিয়া আমাদের আশান্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। অবশ্য আমরা ইহার ফল ভোগ করিতে পাইব না—ফল ভোগ করিবে আমাদের তৃতীয় পুরুষ। যে তালের গাছ বপন করে, সে নিজে কদাচিত ফল খাইতে পায়!

আমরা কেবল আশায় আশ্বস্ত হইলেই কি আমাদের কাজ শেষ হইবে? অবশ্য না ঐ স্কুলবীজটির প্রতি আমাদের অনেক কর্তব্য আছে। উপযুক্ত অর্থাভাবে এখনও স্কুলের কার্য আরম্ভ হইতে পারিতেছে না—আমাদিগকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। ভদ্রলোকেরা চাঁদা দেন, ভাল কথা—যদি না দেন, তবে মহিলাদের চাঁদা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক কর্তব্য আছে, যিনি তাহা পালন করিতে ইচ্ছুক তিনি সেক্রেটারি সাহেবকে পত্র লিখিয়া জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারেন। সম্প্রতি চাঁদা সংগ্রহই প্রধান কার্য। আলীগড়ের মহানুভব লোকেরা যে মহৎ কার্যের আয়োজন করিতেছেন, তাহা দুই চারিজনের দ্বারা সাধিত হওয়া অসম্ভব।

এ সময় যদি সকলে উহাতে যোগদান না করেন, তবে এ স্কুলবীজ অঙ্কুরিত হইতে পারিবে না—যদি আশাতরু এবার অর্থাভাবে অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়, তবে আবার বীজ সংগৃহীত হওয়া সুদূরপরাহত। যে মাতৃজাতির কল্যাণের নিমিত্ত এই প্রয়োজন, তাঁহারা নিশ্চিতভাবে নিদ্রিত থাকিলে চলিবে কেন? আর উদাসীন থাকিবার সময় নাই।

লাহোর, মুম্বাই ও আলীগড় নিবাসী লোকের সহিত ঐক্য রক্ষা করিতে হইলে সকলকে একটি সাধারণ ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। সেই ভাষা ইংরাজি হইলে ভাল হয়; নতুবা কোন বিখ্যাত প্রাদেশিক (যেমন হিন্দী) ভাষার চর্চা রাখিলে চলে। লাহোরের লোকে আমাদের বঙ্গভাষা শিখিবে, এরূপ আশা দুরাশা, সুতরাং বাঙ্গালিকেই উর্দু শিখিতে হইবে।

দেশের বিশেষত নিজের সন্তান সন্ততির মঙ্গলের জন্য স্বার্থত্যাগে নারী কখনও পশ্চাৎপদ হয় না। যে শিক্ষা মানবের পক্ষে অশেষ উপকারী, সেই শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত রমণী সামান্য অর্থরূপ স্বার্থত্যাগ করিবে না কি? জ্ঞান বিনিময় হযরত "হাভা" স্বর্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন,—তাহারই দুহিতা হইয়া আমরা কি সামান্য অর্থত্যাগে বিমুখ হইব?

কেহ হয়ত বলিবেন, "একবার আদি জননী জ্ঞানফল চয়ন করায় পিতা আদমকে স্বর্গচ্যুত হইতে হইয়াছে, আবার বঙ্গজননীরা জ্ঞানলাভে অগ্রসর হইলে আমাদিগকে গৃহচ্যুত হইতে হইবে না ত?" উত্তরে বলা যাইতে পারে, গৃহচ্যুত হওয়ার ত আশঙ্কা নাই—আশঙ্কা আছে কর্মহীন, আকাঙ্ক্ষা উদ্যমহীন জড়তারূপ স্বর্গভ্রষ্ট হওয়ার।

আদি মাতা নিষ্কর্মা অলস জীবনের স্বর্গভোগ পরিত্যাগ না করিলে মানব জাতি ধর্মবিশ্বাসরূপ অমূল্যরত্ন পাইত কোথায়? আমাদের মনে হয়, স্বর্গবাসী আদম অপেক্ষা মর্তবাসী দরবেশ মনসুর অধিক সুখী ছিলেন। মহর্ষি মনসুর ঈশ্বরপ্রেমের যে মধুর আস্বাদ পাইয়াছিলেন, স্বর্গে থাকাকালীন হয়ত আদম কি সে সুধার আস্বাদ জানিতেন?

স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষেরা সর্বদা হীনবুদ্ধি বলিয়া থাকেন, তাই অবলারা নিজেকে নিতান্ত মেধাহীন ভাবিয়া ক্রমে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে—তাহারা আর জ্ঞানচর্চার দিকে সহজে অগ্রসর হইতে চাহে না। কোন ভাল লোককে ক্রমাগত পাগল বলিলে সত্যই সে পাগল হইয়া যায়। নারীজাতি কি বাস্তবিক হীনবুদ্ধি? না, বরং রমণী প্রতিভার আদি অধীশ্বরী। ইহা সর্ববাদীসম্মত যে নারীই প্রথমে জ্ঞানফল চয়ন ও ভক্ষণ করিয়াছেন, পরে পুরুষ তাঁহার (উচ্ছিষ্ট!) প্রদত্ত ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতবালাকে পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সুযোগ দেওয়া হয় না, সে স্বতন্ত্র কথা। নতুবা এ "ডানাকাটা" অবস্থায়ও তাহা সুবিধা পাইলে পুরুষের তুলনায় তাহাদের অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া দেখায়। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি, যে ক্ষেত্রে মুসলমান বালক শতকরা ২০/২৫ জন কৃতকার্য হয়, সে স্থলে বালিকা (মুম্বাইয়ে) শতকরা ৭৫ জন কৃতকার্য হইয়াছে। যে স্বদেশী ব্রত পালনে বাঙ্গালি পুরুষেরা প্রকৃত কার্যের তুলনায় ফাঁকা হৈচৈ বেশি করেন, সেই ব্রত "নভেলপাণি"রা দৃঢ়তার সহিত নীরবে প্রতিপালন করিতেছেন। সুতরাং অবলাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই।

সুদীর্ঘ নৈরাশ্য-যামিনীর শেষে আশা-শুকতারা উদয় হইল। এমন সুপ্রভাতে যে নিদ্রিত থাকে, তাহার দুর্ভাগ্য। তাই বলি, ভগিনী! ঐ চাহিদা দেখুন—ঐ দূরে-আশা-জ্যোতিঃ।

'নবনূর', জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩

দজ্জাল

যখন মহিলার শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহোদয় মোসলমান শাস্ত্রসংক্রান্ত অনেক পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন ও করিতেছেন তখন "কেয়ামত" "দজ্জাল" বা "পোলসেরাত" সম্বন্ধে মহিলায় কিছু লেখা অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক বোধ হইবে না। আমার মত মনে হয়, "মহিলা" যেন আমাদেরই কাগজ।

এস্থলে বলা আবশ্যক, মোসলমানের ন্যায় খ্রীষ্টানগণও মহাপ্রলয় (কেয়ামত) এবং মহাবিচারের দিনে বিশ্বাস করে। কথিত আছে যে, মহাপ্রলয়ের কিছুকাল (ধরাতলে হজরত ঈসার পুনরাগমনের) পূর্ব্বে এক বিধর্ম্মী পৃথিবীতে আসিয়া অনেক লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস নষ্ট করিবে, তাহার নাম 'দজ্জাল', দজ্জাল মাত্র চল্লিশ দিন রাজত্ব করিবে; এই চল্লিশ দিনের মধ্যেই সে অসংখ্য লোকের উপর প্রভুত্ব করিবে, নিজেকে ঈসা পয়গম্বর (যীশুখ্রিষ্ট) বলিয়া পরিচয় দিবে, সময় সময় ঈশ্বরত্বের দাবী করিবে। দজ্জালের সঙ্গে একটা অগ্নিকুণ্ড (নরক), একটা মনোরথ উদ্যান (স্বর্গ) এবং বাহনস্বরূপ একটা গর্দ্দভ থাকিবে। এই কয়টা জিনিস লইয়াই দজ্জাল দিগ্বিজয়ে বাহির হইবে! এবং দিগ্বিজয়ে সে অনেকটা কৃতকার্য্য হইবে। কারণ সে অপ্রতিহত ক্ষমতাশালী ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে; এবং তাহার সহিত অর্দ্ধখানি রুটী (অর্থাৎ অন্ন) থাকিবে,

আর পৃথিবীর যাবতীয় জলাশয় তাহার অধীন হইবে। যে ব্যক্তি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইবে, যাহার হাতে সমুদয় অন্ন জল থাকিবে, স্বর্গ ও নরক যাহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমান, সে যীশুখ্রীষ্টত্বের দাবী না'ই করিবে কেন?

তাহার কথায় মূর্খ ক্ষুধাতুর তৃষ্ণাকাতর লোকেরা আপন পৈতৃক ধর্ম্মবিশ্বাসে জলাঞ্জলি না'ই দিবে কেন? পেটের দায় বড় দায়!

যে ব্যক্তি দজ্জালের কথামতে কুপথে যাইবে, তাহাকে সে স্বীয় স্বর্গে স্থান দিবে, আর যে তাহার কথা অমান্য করিবে, তাহাকে ধরিয়া সে নরকে ফেলিবে! স্বর্গের লোভে নরকের ভয়ে অনেক লোভ দজ্জালের দলভুক্ত হইবে। হায় ক্ষুদ্র স্বার্থ!

কিন্তু দজ্জাল যাহাকে স্বর্গে রাখিবে, সে প্রকৃতপক্ষে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে, এবং যে তাহার নরকে যাইবে সে স্বর্গসুখ উপভোগ করিবে!

পাঠিকা ভগিনি! ঐ দজ্জালের বর্ণনা হইতে আপনি আর কোন নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উপদেশ লাভ করিতে পারেন না কি? প্রকৃত দজ্জাল ত পরে আসিবে, কিন্তু এখনই আমরা কি এ জীবনে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে দজ্জালের কুহকে পড়িয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হই না?

ক্ষণিক সুখের (দজ্জালের স্বর্গের) লোভে লোকে কি প্রেয় পথে অগ্রসর হইয়া শেষে নিজেকে অভিশপ্ত দেখে না? আর যে প্রেয়ের প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হইয়া শ্রেয় পথ অবলম্বন করে সে ক্ষণিক কষ্ট (দজ্জালের নরক) ভোগ করে বটে, কিন্তু সে পরিণামে অনন্ত শান্তিলাভ করে।

মানুষের মনে প্রধানত দুইটি ভাব দেখা যায়, একটি ইঙ্গিতে সুপথ, অপরটি কুপথ প্রদর্শন করে। আমরা প্রথমোক্ত ভাবকে দেবভাব এবং শেষোক্তকে অসুর ভাব বলিব। দেবভাবের কার্য্য সাত্ত্বিক, আর অসুর ভাবের কার্য্য তামসিক। শাস্ত্রকারদের মতে মানব ফেরেশ্‌তা (ইঞ্জিল বা দেবদূত) ও পশুর মধ্যবর্ত্তী জীববিশেষ! যে ব্যক্তি পশুভাব জয় করিয়া আপন আত্মাকে উন্নত করিতে পারেন, তিনি নরদেবতা; এমনকি তাঁহাকে ফেরেশতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যায়। আর যে পশুভাবের বশবর্তী হইয়া ক্রমে অবনতির দিকে অগ্রসর হয়, সে মনুষ্য নামের অযোগ্য নরপশু।

দজ্জাল অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ইত্যাদি, অর্থাৎ পতনের পাপপথ কুসুম আস্তৃত এবং সুগম। সুতরাং অবোধ লোকের পাপানলে পতঙ্গপ্রায় প্রাণ উৎসর্গ করে। আর ধর্ম্মের বা উন্নতির পথ কন্টকাকীর্ণ, অতি কষ্টে অগ্রসর হইতে হয়, পদে পদে মানবের পদস্খলন হয়। উন্নতির পথে কত বিঘ্ন, কত বাধা! ও পথে পদবিক্ষেপ করিবামাত্র ভুজঙ্গের শত ফণা গর্জ্জন করিয়া উঠে। অবনতি স্রোতে একবার গা ভাসাইয়া দিলে আর কিছু করিতে হয় না, অনায়াসে গড়াইয়া গড়াইয়া নরককূপে পড়া যায়!

একটি অতি দীর্ঘ সেতুর নাম "পোলসেরাত"। "পোলসেরাত" সেতুটি চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম (সঙ্কীর্ণ) এবং অসির অপেক্ষা তীক্ষ্ণ, তাও আবার সোজা নহে—তিন স্থলে বাঁকা! সে পোলসেরাত নরকের উপর স্থাপিত হইবে।

মহাবিচারের শেষে সকলে ঐ সেতু অতিক্রমে করিয়া স্বর্গাভিমুখে যাইবে। স্বর্গের পথ এমনই কঠিন!—

অমাবস্যার রজনীর ন্যায় ঘোর অন্ধকারে মানবকে ঐ সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ সেতু অতিক্রম করিতে হইবে! পুণ্যবান লোকেরা ত অনায়াসে পার হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু পাপীদের পাপের পরিমাণ অনুসারে বারবার পদস্খলন হওয়ায় তাহারা নরকে পতিত হইবে।

আমরা ঐ দুরূহ সেতুর আর একটি অর্থ বাহির করিতে চেষ্টা করিলে দোষ কি? মনে করুন, ঐ পোলসেরাত একটি পরীক্ষা বিশেষ। ঐ পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হয়, সে সিদ্ধি লাভ করে; যে ফেল (fail) হয়, তাহার মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ রহিয়া যায়। এই সংসার কি? একটা বিরাট পরীক্ষাক্ষেত্র নহে? মানব-জীবন পোলসেরাতের পথেই চলিতেছে না কি? কেহ আরম্ভে, কেহ এক-তৃতীয়াংশ পথে (পোলসেরাতের প্রথম মোড়ে), কেহ অর্দ্ধপথে (অথবা সেতুর দ্বিতীয় মোড়ে), কেহ আর কিছু দূরে (সেতুর তৃতীয় মোড় পর্যন্ত) অগ্রসর হইয়া ফেল হয়,—অধিকাংশ লোকেই ফেল হয়। কৃচিৎ দুই-দশ জন ভাগ্যবান লোক সফলকাম হয়। কবি বড় নৈরাশ্যে গাছিয়াছেন :

"মিছে কেন কর বিষয় ভাবনা—
কতই দেখিছ, এ ছার সংসারে
কারুই পুরে না মনোবাসনা।"

এই ভারতের ত্রিশ কোটি নরনারীর মধ্যে কয় জন লোক প্রতিদিন দুই বেলা পূর্ণোদর আহার প্রাপ্ত হয়? কয় জন লোকের জন্য জীবিকার পথ সুগম? কয় জনে পোলসেরাতের উপর বসিয়া অশ্রুপাত না করে? কয় জন জীবনের এক একটি দিনকে এক বৎসর তুল্য দীর্ঘ মনে না করে? কয়জনে জীবনের পথটা কন্টকময় মনে না করে? তাই কবি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়াছেন—

"জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে!"

তাই ত, একবার এ ভ্রমে পতিত হইলে আর সহজে নিষ্কৃতি নাই।

তাই বলিয়া পোলসেরাত যে একেবারে দুর্গম, তাহাও নহে। অনেকে ধর্ম্মজীবনে সিদ্ধিলাভ করেন; অনেকে আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করেন, যিনিই কোন বিশেষ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহাকেই কঠোর পরীক্ষা পোলসেরাত অতিক্রম করিতে হইয়াছে। বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাব অসম্ভব।

আর এক কথা বলিয়া এখন উপসংহার করি। দজ্জাল ১. যীশুখ্রিষ্টত্বের দাবী করিবে, (অর্থাৎ দজ্জাল খ্রীষ্টান?) তাহার সঙ্গে ২. অর্দ্ধেক রুটী থাকিবে, যে রুটী থাকিবে যে দেশে সে যাইবে, সেই দেশের, ৩. জলের কর্ত্তা হইবে; (অর্থাৎ তাহার হাতে দেশের অন্ন জল থাকিবে!) ৪. পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য্য তাহার করায়ত্ত হইবে; ৫. এবং তাহার ইচ্ছায় শুষ্ক মরু মঞ্জুরিত হইবে, ইত্যাদি কথার অবশ্যই কোন গূঢ় অর্থ আছে। মোটামুটি ত এই দেখা যায়;—১. খ্রীষ্টান দজ্জাল ২. অন্ন ৩. জল ও ৪. অতুল ঐশ্বর্য্যে অধীশ্বর এবং সে ৫. বিজ্ঞান বলে অঘটন ঘটাইতে (অর্থাৎ শুষ্ক বৃক্ষে ফল ফলাইতে) সমর্থ!!

ঐ দজ্জাল ও পোলসেরাতে প্রচুর নৈতিক ও দার্শনিক শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত। ধন্য সেই ধর্ম্মগুরু (হজরত মহম্মদ), যিনি এত কথা জানিতেন! যিনি এমন সূক্ষ্মদর্শী ও দূরদর্শী ছিলেন। ধন্য তিনি! অমর তিনি!!

অবশ্য আমার সাধ্য কি যে আমি দজ্জাল বা পোলসেরাতের প্রকৃত কর্ম্ম গ্রহণ করিতে বা তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারি! আমি কোন্ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট! তবে বাঙ্গালা "কেয়ামত-নামা" পাঠকালে যাহা মনে উদয় হইল, এস্থলে তাই বলিলাম, আবশ্যক বোধে উক্ত পুস্তকের কোন কোন অংশ পাদটীকায় উদ্ধৃত করা গেল।

যাহার চক্ষু আছে, সে দেখুক; যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক; আর যাহার মন আছে, সে চিন্তা করুক। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি দজ্জালকে একরূপ বুঝিলাম, আর কেহ হয়ত অন্যরূপ বুঝিবেন, কেহ হয়ত হাসিবেন। যিনি হাসিতে চাহেন, তাঁহার প্রতি আমার এই বিনীত অনুরোধ যে, হাসিবার পূর্ব্বে তিনি যেন একটু গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন। অদ্য এই পর্য্যন্ত।

মহিলা, ভাদ্র ১৩১৪

সুবেহ্ সাদেক

জাগো মাতা, ভগিনী, কন্যা—উঠ, শয্যা ত্যাগ করিয়া আইস; অগ্রসর হও। ঐ শুন, "মোয়াজ্জিন" আজান দিতেছেন। তোমরা কি ঐ আজান-ধ্বনি, আল্লাহর ধ্বনি শুনিতে পাও না? আর ঘুমাইও না; উঠ, এখন আর রাত্রি নাই, এখন সুবেহ্ সাদেক—মোয়াজ্জিন আজান দিতেছেন। যৎকালে সমগ্র জগতের নারীজাতি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহারা নানাবিধ সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে—তাহারা শিক্ষামন্ত্রী হইয়াছে, তাহারা ডাক্তার, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, যুদ্ধমন্ত্রী, প্রধানা সেনাধ্যক্ষা, লেখিকা, কবি ইত্যাদি ইত্যাদি হইতেছে—আমরা বঙ্গনারী গৃহ কারাগারে অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে পড়িয়া অঘোরে ঘুমাইতেছি আর যক্ষ্মা রোগে ভুগিয়া হাজারে হাজারে মরিতেছি।

আমরা নিজেদের জন্য যাবতীয় অভিসম্পাত "রিজার্ভ" করিয়া রাখিয়াছি, আমরা সময়ের গতির সহিত সমপদক্ষেপে নড়িব না। আমরা শপথ করিয়া বসিয়া আছি যে, আজানের শব্দ শুনিয়া শয্যা ত্যাগ করিব না। কিন্তু তাহা যে আর হইবে না। ভগিনীগণ! আপনারা স্বীয় কারাগারের ক্ষুদ্র ছিদ্র পথ দিয়া উঁকি মারিয়া একবার বাহিরের জগৎ দেখুন দেখি!

আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়াই শুনিয়াছি যে, আমরা জন্মিয়াছি দাসী, চিরকাল দাসী, থাকিব দাসী।

আহা! কবি বড় দুঃখে গাহিয়াছেন —

"মনের মরম ব্যথা প্রকাশিতে নারি,
কত পাপ ছিল তাই হয়েছিনু নারী।"

আমাদিগকে "নাকেসুল আকেল" বলিয়া দুনিয়ার সমস্ত দোষ আমাদের স্কন্ধে চাপানো হয়। আমরা মূক বলিয়া কোন কালে এইসব অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করি নাই। আমাদের প্রতি পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হয়, আমরা তাহাতেই গৌরব বোধ করি।

কিছুকাল হইতে আমাদের প্রভুগণ আমাদিগকে মূল্যবান অলঙ্কারের শামিল গণনা করিতেছে। তাই দেখুন কত প্রকারের "নারী রক্ষা সমিতি" গঠিত হইতেছে। বাস্তবিক, আমরা যখন জ্যান্ত লগেজ, তখন যাহাতে আমরা চুরি না হইতে পারি, সেজন্য জাগ্রত প্রহরীর প্রয়োজন। আমার অভাগিনী ভগিনীগণ! আপনারা কি ইহাতে অপমান বোধ করেন না? যদি করেন তবে এই নির্মম অবমাননা নীরবে হজম করেন কেন?

একবার নিজের দিকে চাহিয়া দেখুন দেখি—আমাদিগকে পশুর সহিত তুলনা করা হয়; তাই দেখুন, "পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির" পার্শ্বে "নারীরক্ষা সমিতি।" ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট অপমান আর কি হইতে পারে? যাহা হউক, এখন এ অপমানের ইতি হওয়া চাই।

ভগিনীগণ! চক্ষু রগড়াইয়া জাগিয়া উঠুন—অগ্রসর হউন! বুক ঠুকিয়া বল মা! আমরা পশু নই; বল ভগিনী! আমরা আসবাব নই; বল কন্যে! আমরা জড়োয়া অলঙ্কার রূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বল, আমরা মানুষ! আর কার্যত দেখাও যে, আমরা সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ অংশের অর্ধেক। বাস্তবিক পক্ষে আমরাই সৃষ্টি জগতের মাতা। তোমরা নিজের দাবি-দাওয়া রক্ষা করিবার জন্য নিজেরাই বিবিধ সমিতি গঠন কর।

শিক্ষা বিস্তারই এইসব অত্যাচার নিবারণের একমাত্র মহৌষধ! অন্ততঃপক্ষে বালিকাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতেই হইবে! শিক্ষা অর্থে আমি প্রকৃত সুশিক্ষার কথাই বলি; গোটা কতক পুস্তক পাঠ করিতে বা দু'ছত্র কবিতা লিখিতে পারা শিক্ষা নয়। আমি চাই সেই শিক্ষা—যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে, তাহাদিগকে আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ গৃহিণী এবং আদর্শ মাতারূপে গঠিত করিবে! শিক্ষা—মানসিক এবং শারীরিক উভয়বিধ হওয়া চাই। তাহাদের জানা উচিত যে, তাহারা ইহজগতে কেবল সুদৃশ্য শাড়ি, ক্লিপ ও বহুমূল্য রত্নালঙ্কার পরিয়া পুতুল সাজিবার জন্য আইসে নাই; বরং তাহারা বিশেষ কর্তব্য সাধনের নিমিত্ত নারীরূপে জন্মলাভ করিয়াছে। তাহাদের জীবন শুধু পতি-দেবতার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত উৎসর্গ হইবার বস্তু নহে! তাহারা যেন অন্নবস্ত্রের জন্য কাহারও গলগ্রহ না হয়।

শারীরিক শিক্ষার জন্য আমার মতে লাঠি ও ছোরা খেলা, ঢেঁকির সাহায্যে ধান ভানা, যাঁতায় আটা প্রস্তুত করা এবং যাবতীয় গৃহকর্ম শিক্ষা দেওয়া প্রশস্ত। এক ধান ভানা ও যাঁতা চালনায় দেশের সর্ববৃহৎ খাদ্য সমস্যা পূরণ হইবে। অধুনা ঢেঁকিছাটা চাউল ও যাঁতায় পেশা আটার অভাবে দেশের লোক মৃত্যুস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। শুধু লম্ফ-ঝম্ফ, নৃত্য ইত্যাদি অপেক্ষা উপরোক্ত রূপ শরীরচর্চা শতগুণ শ্রেয়। খোলা মাঠে প্রাতঃভ্রমণও অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। গভর্নমেন্ট এখন শিশুরক্ষার দিকে মনোযোগ দিয়াছেন, ভাল কথা, কিন্তু প্রথমে শিশুর মাতাকে রক্ষা করা চাই।

যাহা হউক, মাতা, ভগিনী, কন্যে! আর ঘুমাইও না,—উঠ, কর্তব্য-পথে অগ্রসর হও।

'মোয়াজ্জিন', আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৩৭

কূপমণ্ডূকের দর্শন

এখন আমরা হিমালয়ে যাচ্ছি। অনেক দিনের সাধ পূর্ণ হইল, আমি পর্বত দেখিলাম। পাঠিকাদিগের নিকট হিমালয় নতুন বোধ না হইতে পারে, কিন্তু আমার জন্য ইহা সম্পূর্ণ নতুন। পুস্তকে সাগর, ভূধর, নির্ঝর ইত্যাদির বিষয় পাঠে দর্শনাকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইত—নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতাম, এসব দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। বেশি দুঃখ হইত, এই ভাবিয়া যে, সুদূর ইউরোপের লোকেরা আমাদের হিমালয় দেখিয়া যায়, আর আমরাই তাহা দেখিতে পাই না। এতদিনে ঈশ্বর-কৃপায় আমরাও হিমালয় দেখিলাম।

যথাসময়ে যাত্রা করিয়া শিলিগুড়ি ষ্টেশনে আসিয়া পহুঁছিলাম। শিলিগুড়ি হইতে হিমালয় রেল রোড আরম্ভ হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান গাড়ির অপেক্ষা ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলগাড়ি ছোট। হিমালয় রেলগাড়ী আবার তাহার অপেক্ষাও ছোট, ক্ষুদ্র গাড়িগুলি খেলনা গাড়ির মত বেশ সুন্দর দেখায়। আর গাড়িগুলো খুব নিচু।—যাত্রীগণ ইচ্ছা করিলে চলিবার সময়ও অনায়াসে উঠিতে নামিতে পারেন।

আমাদের ট্রেন অনেক আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল—গাড়ীগুলি "কটাটটা"—শব্দ করিতে করিতে কখনও দক্ষিণে কখনও উত্তরে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিল। পথের দুই ধারে মনোরম দৃশ্য—কোথাও অতিউচ্চ (Steep) চূড়া, কোথাও নিবিড় অরণ্য।

মাঝে মাঝে কয়েকটি Refreshment Room এবং ষ্টেশন দেখিলাম। প্রায় সব ষ্টেশনে Ladie's waiting room আছে। ঘরগুলি বেশ furnished, আমাদের সহযাত্রী ইউরোপীয় ভগ্নীগণ প্রায় প্রত্যেক ষ্টেশনেই এক একবার নামিয়া বিশ্রাম করিয়াছেন। Waiting room-এ মুখ ধুইবার পেয়ালাও অনেক—একসঙ্গে চারিজন হাত-মুখ ধুইতে পারে। ভগ্নীরা আর কিছু সঙ্গে রাখুন বা না রাখুন, চিরুনী ব্রাশ পাউডার ত রাখেন। বাঙ্গালী মেয়েরা এত ঘন ঘন চুল বিন্যাস করিতে পারে না। যাহা হউক ইউরোপীয় ভগ্নীদের স্ফূর্ত্তি খুব প্রশংসনীয়। ওয়েটিং রুমে "ভুটিয়ানী" আয়া উপস্থিত থাকে।

ক্রমে আমরা সমুদ্র (Sea level) হইতে তিন হাজার ফীট উচ্চে উঠিয়াছি, এখনও শীত বোধ হয় না, কিন্তু মেঘের ভেতর দিয়া চলিয়াছি। নিম্ন উপত্যকায় নির্ম্মল শ্বেত কুঞ্ঝটিকা দেখিয়া সহসা নদী বলিয়া ভ্রম জন্মে। তরু, লতা, ঘাস, পাতা—সকলই মনোহর। এত বড় বড় ঘাস আমি পূর্বে দেখি নাই। হরিদ্বর্ণ চায়ের ক্ষেত্রগুলি প্রাকৃতিক শোভা আরও শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। দূর হইতে সারি সারি চারাগুলি বড় সুন্দর বোধ হয়। মাঝে মাঝে মানুষের চলিবার সঙ্কীর্ণ পথগুলি ধরণীর সীমান্তের ন্যায় দেখায়। নিবিড় শ্যামল বন বসুমতীর ঘন কেশপাশ, আর পথগুলি আঁকাবাঁকা সিঁথি!!

রেলপথে অনেকগুলি জলপ্রপাত বা নির্ঝর দৃষ্টিগোচর হইল—ইহার সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত। কোথা হইতে আসিয়া ভীমবেগে হিমাদ্রির পাষাণ হৃদয়বিদীর্ণ করিতে করিতে ইহারা কোথায় চলিয়াছে। ইহাদেরই কোন একটি বিশালকায় জাহ্নবীর উৎস, একথা সহসা বিশ্বাস হয় কি? একটি বড় ঝর্ণার নিকট ট্রেন থামিল, আমরা ভাবিলাম,

যাহাতে আমরা প্রাণ ভরিয়া জলপ্রবাহ দেখিতে পাই, সেই জন্য বোধহয় গাড়ি থামিয়াছে। (বাস্তবিক সেজন্য কিন্তু ট্রেন থামে নাই—অন্য কারণ ছিল। সেইখানে জল পরিবর্তন করা হইতেছিল) যে কারণেই ট্রেন থামুক—আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইল।

এখন আমরা চারি হাজার ফীট ঊর্ধ্বে উঠিয়াছি, তবু শীত অনুভব করি না, কিন্তু গরমের জ্বালায় যে এতক্ষণ প্রাণ কণ্ঠাগত ছিল—সে জুলুম হইতে রক্ষা পাইলাম। অল্প অল্প বাতাস মৃদু গতিতে বহিতেছে। এইখানে ৪১২০ ফীট উচ্চে "মহানদী" ষ্টেশন। ষ্টেশনের নামটা খুব ভাল্লমত পড়িতে পারি নাই, যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে বোধহয় "মহানদী"ই নাম। যাহা হউক, যদি ষ্টেশনের নাম ভুল হইয়া থাকে, তাহা আমার দোষ নহে,—ষ্টেশন হইতে আমার গাড়ির দূরত্বের সে দোষ।

অবশেষে কারসিয়ং ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম, এখানকার উচ্চতা ৪৮৬৪ ফীট। ষ্টেশনে অত্যন্ত ভীড় দেখিয়া আমি Ladie's waiting room-এ একটু বসিলাম্। ইউরোপীয় ভগ্নীদের মুখ ধোয়া এবং কেশ বিন্যাস দেখিলাম। একজনের সঙ্গে কচি ছেলে ছিল, তিনি আমাকে ছেলের মুখ ধোয়াইতে হুকুম দিয়া গাড়িতে উঠিতে গেলেন। আমার কি গরজ, যে ছেলের মুখ ধোয়াইব? সে তাহার পরিত্যক্ত তোয়ালে দ্বারা ছেলের মুখ মুছাইয়া অনুমান দশ সেকেণ্ড দেরি করিয়া গাড়ি অভিমুখে ছুটিল। চাকরের উপর নির্ভর করিলে ঐ রূপ হয়ই। ট্রেন ছুটিলে ভীড় কম হইল, তখন আমরা ওয়েটিং রুম ছাড়িয়া উঠিলাম।

ষ্টেশন হইতে আমাদের বাসা অধিক দূরে নহে, শ্রীঘই আসিয়া পহুঁছিলাম। আমাদের ট্রাঙ্ক কয়টা ভ্রমক্রমে দার্জ্জিলীঙ্গের ঠিকানায় book করা হইয়াছিল। জিনিষপত্রের অভাবে বাসায় আসিয়াও (সন্ধ্যার পূর্বে) গৃহসুখ at home অনুভব করিতে পারি নাই। সন্ধ্যার ট্রেনে আমাদের ট্রাঙ্কগুলি ফিরিয়া আসিল। আমাদের দার্জ্জিলীং যাবার পূর্বে আমাদের জিনিষপত্র তথাকার বায়ু সেবন করিয়া চরিতার্থ হইল। পরদিন হইতে আমরা সম্পূর্ণ গৃহসুখে আছি। তাই বলি, কেবল আশ্রয় পাইলে সুখে গৃহে থাকা হয় না, আবশ্যকীয় আসবাব-সরঞ্জামও চাই।

এখানে এখনও শীতের বৃদ্ধি হয় নাই, গ্রীষ্মও নাই। এ সময়কে পার্ব্বত্য বসন্তকাল বলিলে কেমন হয়? সূর্যকিরণ প্রখর বোধ হয়। আমাদের আসিবার পর একদিন মাত্র সামান্য বৃষ্টি হইয়াছিল। বায়ু ত খুবই স্বাস্থ্যকর, জল নাকি খুব ভাল নহে। আমরা পানীয় জল ফিল্টারে ছাঁকিয়া ব্যবহার করি। জল কিন্তু দেখিতে খুব পরিষ্কার স্বচ্ছ। কূপ নাই, নদী পুষ্করিণীও নাই—সবে ধন নির্ঝরের জল। ঝরণার সুবিমল, শীতল জলদর্শনে চক্ষু জুড়ায়, দর্শনে হস্ত জুড়ায় এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত শীতল বাতাসে, না ঘন কুয়াশায় প্রাণ জুড়ায়।

এখানকার বায়ু পরিষ্কার ও হাল্কা। বায়ু এবং মেঘের লুকোচুরি খেলা দেখিতে চমৎকার। এই মেঘ এদিকে আছে, ওদিক হইতে বাতাস আসিল, মেঘখণ্ডকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। প্রতিদিন অস্তমান রবি বায়ু এবং মেঘ লইয়া মনোহর সৌন্দর্য্যের রাজ্য রচনা করে। পশ্চিম গগনে পাহাড়ের গায় তরল স্বর্ণ ঢালিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর খণ্ড খণ্ড সুকুমার মেঘগুলি সুকোমল অঙ্গে সুবর্ণ মাখিয়া বায়ুভরে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে

থাকে। ইহাদের এই তামাসা দেখিতেই আমার সময় অতিবাহিত হয়, আত্মহার হইয়া থাকি, আমি কোন কাজ করিতে পারি না।

মনে পড়ে একবার "মহিলা"য় ঢেঁকির শাকের কথা পাঠ করিয়াছি। ঢেঁকি শাককে আমি ক্ষুদ্র গুল্ম বলিয়াই জানিতাম। কেবল ভূ-তত্ত্ব (Geology) গ্রন্থে পাঠ করিয়াছিলাম যে কারবনিফেয়াস যুগে বড় বড় ঢেঁকিতরু ছিল। এখন সেই ঢেঁকিতরু স্বচক্ষে দেখিলাম—ভারী আনন্দ হইল। একটা ডাল ভাঙ্গিয়া মাপিলাম ১১ ফীট লম্বা। স্বয়ং তরুবর ২০/২৫ ফীট উচ্চ হইবে।

কোন কেন স্থানে খুব নিবিড় বন। সুখের বিষয় বাঘ নাই, তাই নির্ভয়ে বেড়াইতে পারি, আমরা নির্জন বন্য পথেই বেড়াইতে ভালবাসি। সর্প এবং ছিনে জোঁক আছে। এ পর্যন্ত সর্পের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। কেবল দুই তিনবার জোঁকে রক্ত শোষণ করিয়াছে।

এদেশে স্ত্রীলোকরা জোঁক দেখিলে ভয় পায় না। আমাদের ভুটিয়া চাকরাণী "ভালু" বলে, জোঁকে কি ক্ষতি করে? রক্ত শোষণ শেষ হইলে আপনিই চলিয়া যায়। ভুটিয়ারীরা সাত গজ লম্বা কাপড় ঘাঘরার মত করিয়া পরে, কোমরে একখণ্ড কাপড় জড়ানো থাকে, গায় জ্যাকেট এবং বিলাতী শাল দ্বারা মাথা ঢাকে, পৃষ্ঠে দুই এক মণ বোঝা লইয়া অনায়াসে প্রস্তরাঙ্কুল অবুড়াখাবুড়া পথ বহিয়া উচ্চে উঠে। ঐ রূপ নিচেও যায়। যে পথ দেখিয়াই আমাদের সাহস "গায়েব" হয়—সেই পথে উহারা বোঝা লইয়া অবলীলাক্রমে উঠে।

মহিলার সম্পাদক মহাশয় আমদের সম্বন্ধে একবার লিখিয়াছিলেন, "রমণীজাতি দুর্ব্বল বলিয়া তাঁহাদের নাম অবলা"। জিজ্ঞাসা করি, এই ভুটিয়ানীরাও ঐ অবলা জাতির অর্ন্তগত না কি? ইহারা উদরান্নের জন্য পুরুষের প্রত্যাশী নহে, সমভাবে উপার্জ্জন করে। বরং অধিকাংশ স্ত্রীলোকদিগকেই পাথর বহিতে দেখি—পুরুষেরা বেশি বোঝা বহন করে না। অবলারা প্রস্তর বহিয়া লইয়া যায়। "সবলেরা" পথে পাথর বিছাইয়া রাস্তা প্রস্তুত করে, সে কাজে বালক বালিকারাও যোগদান করে। এখানে সবলেরা বালক বালিকার দলভুক্ত বলিয়া বোধহয়।

ভুটিয়ানীরা "পাহাড়নী" বলিয়া আপন পরিচয় দেয়, এবং আমাদিগকে "নীচেকা আদমী" বলে। যেন ইহাদের মতে "নীচেকা আদমী"ই অসভ্য। স্বভাবতঃ ইহারা শ্রমশীলা, কার্য্যপ্রিয়, সাহসী ও সত্যবাদী। কিন্তু "নীচেকা আদমীর" সংস্রবে থাকিয়া ইহারা ক্রমশঃ সদগুণরাজী হারাইতেছে। বাজারের পয়সা অল্পস্বল্প চুরি করা, দুধে জল মিশানো ইত্যাদি দোষ শিখিতেছে। আবার "নীচেকা আদমীর" সঙ্গে বিবাহও হয়। ঐরূপে উহারা অন্যান্য জাতির সহিত মিশিতিছে।

মুসলমান ধর্ম্মে শাস্ত্রানুমোদিত পর্দ্দা রক্ষা করিয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ করা যায়, একথা অনেকেই বুঝে না। তাই তাহারা বাড়ি ছাড়িয়া কোথাও যাইতে হইলে মহাবিপদ ভাবে। শাস্ত্রে পর্দ্দা সম্বন্ধে যতটুকু কঠোর ব্যবস্থা আছে, প্রচলিত পর্দ্দা প্রথা তদপেক্ষাও কঠোর। যাহা হউক কেবল শাস্ত্র মানিয়া চলিলে অধিক অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। আমার বিবেচনায় প্রকৃত পর্দ্দা সে-ই রক্ষা করে, যে সমস্ত জাতিকে সহোদর ও সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করে।

আমাদের বাসা হইতে প্রায় এক মাইল দূরে বড় একটা ঝরণা বহিতেছে, এখান হইতে ঐ দুগ্ধফেননিভ জলের স্রোত দেখা যায়। দিবানিশি তাহার কল্লোল গীতি শুনিয়া ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির উচ্ছ্বাস দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হয়। বলি, প্রাণটাও কেন ঐ নির্ঝরের ন্যায় বহিয়া গিয়া পরমেশ্বরের চরণ প্রান্তে লুটিয়া পড়ে না?

অধিক কি বলিব, আমি পাহাড়ে আসিয়া অত্যন্ত সুখী এবং ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছি। সমুদ্রের সামান্য নমুনা, অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর দেখিয়াছি, বাকি ছিল পর্ব্বতের একটি নমুনা দেখা। এখন সে সাধও পূর্ণ হইল।

না, সাধ ত মিটে নাই যত দেখি, ততই দর্শন পিপাসা শতগুণে বাড়ে। কিন্তু কেবল দুটি চক্ষু দিয়াছেন, তাহা দ্বারা কত দেখিব? প্রভু অনেকগুলি চক্ষু দেন নাই কেন? যত দেখি যত ভাবি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। প্রত্যেকটি উচ্চশৃঙ্গ, প্রত্যেকটি ঝরণা প্রথমে যেন বলে, আমায় দেখ। আমায় দেখ। যখন তাহাকে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে দেখি তখন তাহারা ঈষৎ হাস্যে ভ্রূকুটি করিয়া বলে, আমাকে কি দেখ? আমার স্রষ্টাকে স্মরণ কর। ঠিক কথা। চিত্র দেখিয়া চিত্রকরের নৈপুণ্য বুঝা যায়। নতুবা নাম শুনিয়া কে কাহাকে চিনে? আমাদের জন্য হিমালয়ের এই পাদদেশটুকু কত বৃহৎ, কত বিস্তৃত, কি মহান! আর সেই মহাশিল্পীর সৃষ্ট জগতে হিমালয় কত ক্ষুদ্র। বালুকাকণা বলিলেও বড় বলা হয়।

আমাদের এমন সুন্দর চক্ষু, কর্ণ, মন লইয়া যদি আমরা স্রষ্টার গুণকীর্ত্তন না করি, তবে কি কৃতজ্ঞতা হয় না? মন, মস্তিষ্ক, প্রাণ সব লইয়া উপাসনা করিলে তবে তৃপ্তি হয়। কেবল টিয়া পাখির মত কণ্ঠস্থ কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিলে (অন্ততঃ আমার মতে) উপাসনা হয় না। তদ্রূপ উপাসনায় প্রাণের আবেগ থাকে কই? প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন কালে মন প্রাণ স্বতঃই সমস্বরে বলিয়া উঠে, "ঈশ্বরই প্রশংসার যোগ্য। তিনিই ধন্য।" তখন এসব কথা মুখে উচ্চারণ প্রয়োজনও হয় না।

কূপমণ্ডূকের হিমালয় বর্ণনা আজি এইখানে সমাপ্ত।

মহিলা, কার্তিক ১৩১১

নারী-পূজা

"হিন্দুর নারীমর্যাদা অবশ্য প্রশংসনীয়", একখানি পুরাতন "ভারতী" পত্রিকার পাতা উল্টাতেই উল্টাতেই আমি বলিলাম, "হিন্দুর নারীমর্যাদা অবশ্য প্রশংসনীয়। অন্য কোন দেশে রমণীর প্রতি এরূপ সম্মান প্রদর্শন হয় না। হিন্দুর আরাধ্য দেবতা নারী।"

আমার কথা শুনিয়া উপস্থিত মহিলাবৃন্দ হাসিয়া উঠিলেন। আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম। জমিলা বেগম প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"মাফ করুন মিসেস চ্যাটার্জ্জি! এদেশে ললনারা পদ দাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে!"

জমিলা একজন বিখ্যাত উকিলের পত্নী; কুসুমকুমারী রায়ের সহিত ইহার খুব বন্ধুত্ব। অপর কামিনী আমেনা বেগম বিধবা; ইনি দশ বৎসর পশ্চিমে ছিলেন; খুব ভাল

উর্দ্দু জানেন। ইনিও কুসুমের প্রিয় বন্ধু। মিসেস রায়ের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠতা এত অধিক যে, ইহারা পরস্পরের নাম ধরিয়া ডাকেন। উক্ত মোসলেম রমণীদের সহিত আমার পরিচয় মাত্র দুই তিন মাস হইল হইয়াছে; কিন্তু কুসুম আমার সমবয়স্কা বাল্য-সখী।

কুসুমের বসিবার কক্ষে বসিয়াই আমি "ভারতী" দেখিতেছিলাম। আমি তর্কের জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিলাম না; তথাপি আমার ঐ উক্তি লইয়া যথেষ্ট বাদানুবাদ চলিল। আমেনা বেগম ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"এ দেশে রমণী জাতি পুরুষের নিজস্ব সম্পত্তিবিশেষ!"

আমি : ও ভাই কুসুম! তুমি আমায় সাহায্য কর। আন ত তোমার মহাভারতখানা, ইঁহাদিগকে আমরা ঐতিহাসিক ঘটনা দেখাই।

কুসুম : ইহা আপনাদের ভ্রম। হিন্দু নারীকে শ্রদ্ধা না করিলে, তাহাকে দেবীরূপে কল্পনা করিত না। অধিকাংশ দেবতাই নারী।

আমেনা : আমরা কিন্তু ফল দেখিয়া বিচার করিতে চাই! দেবী কল্পনার কথা ছাড়িয়া সত্য ঘটনা দেখান।

আমি : তোমরা তিনজনেই আমার সমান শ্রদ্ধার পাত্রী, আমি কাহারও পক্ষপাতিতা করিতে পারি না। মহাভারত বা ইতিহাসে কাজ কি? বর্ত্তমান সামাজিক ঘটনার আলোচনা করিতে পার।

আমি : (মোসলেম কামিনীদ্বয়ের প্রতি) আপনারা কি দময়ন্তী, সীতা, সাবিত্রী প্রমুখ-ভারত ললনাকে দাসী বলিতে চান?

জমিলা : না। সতী সাবিত্রী প্রভৃতি নিজগুণে ধন্য হইয়াছেন। সীতা নিজে ভাল লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় সমাজ তাঁহাকে কি রূপে পূজা করিয়াছিল?

আমি : (ও কথার উত্তর না দিয়া) পুরাকালে অনেক দেবী ছিলেন। লীলাবতী, খনা প্রভৃতি বিদুষী ললনা ভূতলে অতুল।

আমেনা : তাঁহারা বিদুষী ছিলেন, সে গুণ তাঁহাদের নিজের। এখানে কথা হইতেছে, নারীর প্রতি সমাজের ব্যবহারের। খনা জ্যোতিষশাস্ত্রের অসাধারণ ব্যুৎপন্না ছিলেন। আজিও পল্লীগ্রামে এমন কৃষক নাই যে, দুই চারিটি খনার বচন না জানে। কিন্তু—

আমি : কিন্তু আর কি? গ্রামে গ্রামে খনার বচন আবৃত্তি করা হয়, ইহাতেই বুঝা যায়, খনা সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইতেছেন!—

আমেনা : ক্ষমা করুন, মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি। আমার কথাটুকু শেষ হইতে দিন! খনা এখন পূজিতা হইতেছেন, কিন্তু তিনি মরিয়াছেন কি প্রকারে তাহা কি আপনি বিদিত নহেন? তাঁহার যে রসনা ঐ বচনগুলির জনয়িত্রী, সেই রসনা ছেদন করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে।

আমি : হত্যা ত করা হয় নাই;—তবে হ্যাঁ,—খনার রসনা কর্ত্তিত হইয়াছিল।

জমিলা : 'হত্যা' কি গাছে ধরে? খনার স্বামী তাঁহার জিহ্বাচ্ছেদন করিলে পর খনা নীরবে স্বামীর মুখখানে চাহিয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন!

কুসুম : আপনারা পুরাতন কথা ছাড়ুন। বর্ত্তমান শতাব্দীর দ্বারা জয় পরাজয় দেখা যাউক।

আমি : বেগম সাহেবেরা দুইজন, আর আমি একা। জোর যার, মুলুক তার, সুতরাং আমি বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করি।

কুসুম : সে কি! তুমি এত শীঘ্র তর্ক ছাড়িবে কেন? যত দূর পার অগ্রসর হও।

আমেনা : আমরা দুইজন হইলেও মোটের উপর আপনার তুলনায় দুর্ব্বল। কারণ আপনি উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত;—(ঈষৎ হাস্যে) যদিও এফ, এ, ফেল! আপনি অনেক দেখিয়া শুনিয়া এবং নানা পুস্তক পাঠে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। আর আমরা কঠোর অবরোধে থাকি,—আমরা কেবল কুসুমদিদিকে জানি, আর চিনি আপনাকে।

আমি : বেশ, বেশ, চলুন; আপনারা নাছোড়বান্দা! কুসুমদিদি! 'বর্ত্তমান শতাব্দী' মানে বাঙ্গালার ১৩১২ সন, না? খ্রীষ্টাব্দের ২০শ শতাব্দী?

কুসুম : ত্রয়োদশও নয়, বিংশও নয়;—এই শেষ একশত বৎসরের ভিতরের ঘটনা ধর না।

আমি : বেশ! ইদানীং ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি হওয়ায় রমণী জাতি কল্পিত দেবত্বের পদ হইতে ক্রমে সত্যকার দেবী পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জমিলা : তাহা কতক পরিমাণে সত্য। আপনি আর একটি কথা শুনিয়া রাখুন,—আপনারা যখন হিন্দু সমাজের দেবী লইয়া গৌরব ও গর্ব্ব করেন, তখন উক্ত সমাজের দোষকেও আপনাদের নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকুন।

আমি : এ বড় শক্ত condition!

কুসুম : শক্ত হইলেও পণটা ন্যায়সঙ্গত বটে। উঁহারা পূর্ব্বেই তোমার ফাঁকির পথ বন্ধ করিলেন! বুঝিলে, প্রভা দিদি?

আমি : কি রকম ফাঁকি?

কুসুম : উঁহারা কোন হিন্দু পরিবারের অবলার দুর্দ্দশার কথা বলিলে তুমি বলিতে পারিতে, "আমাদের ব্রাহ্মসমাজে কিন্তু ওরূপ হয় না!"

আমি : তাহা ত ঠিক। ব্রাহ্মসমাজে অবলাপীড়ন হয়, ইহা কেহ বলিতে পারে কি?

আমেনা : যদি কেবল নববিধান সমাজ লইয়া থাকেন, তবে আপনারা হিন্দুসমাজে দেবী হইয়া টানাটানি করেন কেন? কেবল গুণের প্রশংসার ভোগ লইতে অগ্রসর হইবেন, আর দোষের নিন্দা গ্রহণ করিবেন না, ইহা ত বড় অবিচার!

জমিলা : এই জন্য আপনি বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিতেছিলেন, এখন বুঝিলাম। তবে থাক নারী পূজার আলোচনায় কাজ নাই অন্য কথা পাড়ুন।

আমি প্রথমে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলাম, একটু পরে ভাবিলাম, "আমি এতই ভীরু যে বিনা তর্কে হারিব?" প্রকাশ্যে বলিলাম :

"না বেগম সাহেবা! আপনাদের ভয় নাই! আমি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিব না,—চলুন!"

সকলে হাসিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদিগকে হাসানই আমার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা কিন্তু শিষ্টাচারের অনুরোধে আর সামাজিক কথা বলিতেছিলেন না। তাহা আমার অসহ্য হইল, আমি জেদ ধরিয়া বলিলাম,—

"কই বেগম সাহেবা, আপনি ত একটাও প্রপীড়িতা ললনার কাহিনী বলিতে পারিলেন না।

জমিলা : বলিলেন, "একটি কেন, অনেক বলা যায়",—"সে বহ্নির শিখা কে করিবে গণনা?"

আমি : আপাততঃ একটী শিখাও দেখান দেখি!

জমিলা : বেশ। যে সকল হিন্দু রমণী পূজিতা হন, সেই হিন্দু কুলকামিনীর ভাষায় ত আমরা শুনিতে পাই।

"সাবাসি সাবাসি বটে হিন্দু সন্তানে,
গড়া কি তোদের বুক নিরেট পাষাণে?

*

বালিকা বধিতে তোর শাস্ত্র টানাটানি

*

নাই দয়া নাই ধর্ম্ম, বোঝে না'ক কম্মাকর্ম্ম
শাস্ত্রের রেহাই দিয়া বালিকা চিবায়।"

কি বলেন ভাই! ঐ কয় ছত্রপদ্যকে ব্যথিত হৃদয়ের "আর্ত্তনাদ" না পূজা প্রাপ্তিতে হর্ষে 'আশীর্ব্বাদ' বলিব?

আমি : উহা ত করিব রচনা—কল্পিত বেদনা।

জমিলা :—আপনি বাল্যবিধবার যন্ত্রণাকে কল্পিত বেদনা বলিবেন?

আমিনা : একেবারে কল্পিত নহে, অনেক পরিমাণে সত্য,—

কুসুম : ধ্রুব সত্য।

আমিনা : কিন্তু উহা ত সামাজিক নিয়ম, কাজেই সহিতে বাধ্য হওয়া যায়।

আমেনা : কবি কল্পনার কথা ছাড়িয়া আমি সদ্য দেখাই, ভারতবর্ষ কি কি উপাদানে নারী পূজা করে, তাহার দৃষ্টান্তের জন্য আমাদিগকে অধিক দূর যাইতে হইবে না। শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রণীত "Heart Beats" গ্রন্থখানি দেখিয়াছেন?

আমি প্রথমে ভাবিয়া দেখিলাম, উক্ত গ্রন্থে কেবল পারমার্থিক কথা আছে। একটু চিন্তা করিয়া শেষে সাহসের সহিত বলিলাম, "হাঁ দেখিয়াছি। তাহাতে কোন ললনাদলনতত্ত্ব নাই।"

আমেনা : মূল গ্রন্থে নাই বটে, কিন্তু মোঃ এস.জে. ব্যারোস্ কর্ত্তৃক লিখিত মজুমদার মহাশয়ের জবানীতে একটি নমুনা পাওয়া যায়।

আমি : অবলাপীড়নের নমুনা?—আচর্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে?

আমেনা স্থির স্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ, তাঁহার মাতার মৃত্যু ঘটনা। যৎকালে মজুমদার মহোদয়ের জননী ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিলেন, তখন গৃহস্বামী নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতেছিলেন! বাড়ীর গাভীটার কোন রূপ পীড়া হইলেও বোধহয় কর্ত্তা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। বিধবার প্রতি সমাজের ব্যবহার কিরূপ হয়, তাহা মজুমদার মহোদয়ের ভাষায় চমৎকার শুনায়! আপনারা তাঁহার জীবনীর ১৪শ হইতে ১৬শ পৃষ্ঠা পুনরায় পাঠ করিয়া দেখুন। তাহা পাঠ করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

গৃহপালিত কুকুর বিড়ালও বোধহয় বিনা চিকিৎসায় মারা যায় না; আর ঈশ্বরের সৃষ্টজগতের শ্রেষ্ঠতমা জীব, পরিবারের একজন বধূ রোগের যন্ত্রণায় অধীরা, কেহ তাঁহার প্রতি ফিরিয়া চাহে নাই! বিধবার জন্য চিকিৎসক ডাকিতে হইবে, একথাও কেহ ভাবে নাই! মজুমদার স্বযং তাঁহার পিতৃব্যদের সুখনিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্য যাইতেছিলেন, কিন্তু কর্ত্তাদের কক্ষে তিনি প্রবেশ করিতে পারে নাই![১] চাকরটা পর্য্যন্ত চিকিৎসক ডাকিতে যাইবে না—না যাউক। কিন্তু পুত্র নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না! যাঁহার জননী জন্মের মত বিদায় লইতেছে, তিনি কি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন? না! তিনি পাগলের ন্যায় পথে ছুটিলেন;—(স্বর্গীয়) কেশবচন্দ্র সেন এবং অপর কয়েকজন বন্ধুকে ডাকিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রাত্রিকালে সকলের গৃহদ্বার রুদ্ধ ছিল। তিনি জনৈক ডাক্তারের বাড়ি গেলেন; ডাক্তারের চাকর হতভাগ্যকে তাড়াইয়া দিল! সে ভৃত্যটি তো ভারতবর্ষেরই পুরুষ, সে অবশ্যই জানিত, কিরূপে নারী-পূজা করিতে হয়। তাই বিধবার জন্য প্রভুকে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে, ভাবিয়া সে মাতৃশোকাতুর পুত্রকে তাড়াইয়া দিল!!

"আমরা মানসচক্ষে স্পষ্ট দেখিতে পাই, সেই ঊনবিংশ বর্ষীয় বালক মাতৃশোকে পাগল প্রায় হইয়া পথে ছুটাছুটি করিতেছেন। আর তাঁহার হৃদয়ে কি আকুলতা, কি মর্ম্মান্তিক যাতনা ছিল,তাহা আমরা বেশ অনুভব করিতে পারি। আমরা ঈশ্বরের যত প্রকার আশীর্ব্বাদ ভোগ করি, তন্মধ্যে মার্তৃচরণ শ্রেষ্ঠতম আশীর্ব্বাদ। সব সুখসমৃদ্ধি তুলাদণ্ডের একদিকে, আর মা একদিকে!!

"ইহাকে—বিধবার প্রতি এইরূপ নির্ম্মম নির্দ্দয় ব্যবহারকে যদি আপনারা 'নারী-পূজা' বলেন, তবে আর আমার বলিবার কিছু নাই।"

আমি : ইদৃশী ঘটনা বিরল। কেবল একটি বিধবার প্রতি যত্ন হয় নাই বলিয়া সকলে দোষী হইতে পারে না।

কুসুম : না প্রভা দিদি! ওরূপ ঘটনা বিরল নহে—তবে এই কথা যে, আর কেহ মজুমদার মহাশয়ের মত ঐ প্রকার কলঙ্ককাহিনী লিখিয়া রাখে না, তাই আমরা সে সব ঘটনা জানিতে পারি না। আমিও দুই চারিটি পরিবারের ঐ রূপ অবস্থা জানি।

আমি : (জমিলা বেগমের প্রতি) আর আপনি? আপনি কোন লোমহর্ষক ব্যাপারে অবগত আছেন?

জমিলা : একটি ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; সে অনেক কথা!

আমি : বলুন, শুনি।

জমিলা বলিলেন,—"একজন বড় লোকের শিশুকন্যা পীড়িত ছিল। বাড়িতে দাস দাসী, ঘে ড়া গাড়ি, যত প্রকার বিলাসদ্রব্য হইতে পারে সবই প্রচুর ছিল। কেবল কন্যা জাতিকে অভিশাপ মনে করা হয় বলিয়া খুকীর চিকিৎসা হইতেছিল না।

"কোন অভাব নাই—অপর শিশুরা টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলা করে, অথচ দুগ্ধপোষ্য শিশুটি বিনা চিকিৎসায় মরিতেছে, এ চিন্তা গৃহিণীর সহ্য হইল না! তিনি বারম্বার সবিনয়ে সজল নয়নে কর্ত্তাকে চিকিৎসক ডাকিতে অনুরোধ করিলেন,—কর্ত্তা শুনিলেন না! এমন-কি কর্ত্তা একদিন নিজের প্রয়োজনবশতঃ ডাক্তারের নিকট

যাইতেছিলেন, সেই সময় কর্ত্রী সকাতরে বলিলেন, 'খুকীর অবস্থাও ডাক্তারকে জানাইও।' 'মেয়ে কি কখনও মরে?' এই বলিয়া কর্ত্তা প্রস্থান করিলেন।

"অতঃপর অসহায়া গৃহিণী উপায়ন্তর না দেখিয়া মুমূর্ষু শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া নীরবে অবিরল ধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন! পুংশাবককে যখন পিতা হনুমান বধ করিতে চেষ্টা করে, তখন শাবকটীকে বক্ষে লইয়া হনুমানমাতা বনে জঙ্গলে পলায়ন করিয়া শিশুর প্রাণ রক্ষা করে! কিন্তু পর্দ্দানশীল মহিলা পিতৃ-অত্যাচার হইতে শিশুকন্যাকে রক্ষা করিবার জন্য কোথায় যাইবেন? নগরে অসংখ্য ডাক্তার আছেন,—থাকুন; তাহাতে অন্তঃপুরিকার লাভ কি?"

আমি : "ঈস! মানুষ এমন পাষণ্ড পশু! শেষে কি হইল ভাই? শিশুটি বাঁচিল, না অযত্নে মারা গেল?"

জমিলা : "শিশুটি শেষে বাঁচিল। যৎকালে কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া মাতা রোদন করিতেছিলেন, সেই সময় দৈবাৎ উক্ত পরিবারের ভাগ্যবান জ্যেষ্ঠ পুত্র তথায় গিয়াছিল। সে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, তাই মাতার ক্রন্দনে তাহার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল, সে নিজে ডাক্তারের নিকট গিয়া কয়েক মাত্রা ঔষধ আনিয়া দিল। সে ঔষধ আনিয়াছিল কেবল জননীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য! ঈশ্বরকৃপায় সেই সামান্য ঔষধে খুকী বাঁচিল। সেই ধনী পরিবার অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে! সেই শিশু, সেই পিতা, মাতা, ভ্রাতা—সকলেই জীবিত আছেন!"

আমি : "পরিবারটি হিন্দু, না মুসলমান?"

জমিলা : "তাহা আমি বলিব না,—তাঁহাদের মুখে মসীলেপন করিয়া কাজ কি? এই পর্য্যন্ত বলাই যথেষ্ট—তাঁহারা বঙ্গবাসী!"

আমি : "দেখুন, এদেশে যে জঘন্য অবরোধ প্রথা প্রচলিত আছে, ইহাই সব অনিষ্টের মূল। মুসলমান সমাজ এ বিষয়ে অগ্রণী। তাঁহারা চাকরের সম্মুখেও বাহির হন না, এই জন্য মোসলেম রমণী একেবারে নিরুপায়। ঐ পর্দা তাঁহাদিগকে পশু-হনুমানমাতা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, অসহায় করিয়াছে।"

আমেনা : অবরোধ প্রথা জঘন্য হইলেও উহা আমাদের হাড়ে-মাংসে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে। পুরুষেরা যতদিন ভদ্র শিষ্ট হইতে না শিখেন, ততদিন এ পর্দ্দা ছাড়া সহজ নহে। পুরুষ সমাজ যদি ললনাদের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে শিখিতেন, তবে আর দুঃখ ছিল কি?

কুসুম : আমি শুনিয়াছি যে, অন্যান্য মুসলমানপ্রধান দেশে নাকি ঈদৃশ অন্তঃপুরপ্রথা নাই! তবে ভারতবর্ষে মুসলমানেরা কেন এরূপ পর্দার সৃষ্টি করিয়া নিজেদের স্ত্রীকন্যার সহিত আমাদিগকেও বন্দিনী করিলেন?

জমিলা : পর্দার আদিস্রষ্টা কে? তাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই। কোন মোসলেম ভ্রাতা যখন অবরোধের অনুকূলে কিছু লিখেন, তিনি বলেন, "আমরাই পর্দ্দার স্রষ্টা, হিন্দুভ্রাতৃগণ যে পর্দ্দার আবিষ্কারক বলিয়া দাবী করেন, তাহা ঠিক নহে।" আবার যে মুসলমান ভাইটি পর্দ্দার প্রতিকূল কিছু লিখেন, তিনি নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন, "পর্দ্দার প্রথা মুসলমানেরা বিধর্ম্মীদের নিকট শিখিয়াছে।" যাহা হউক এই প্রথার স্রষ্টা যিনি হউন, ভোগটা আমাদিগকে ভুগিতে হইতেছে!

আমি : আপনারা ধীরে ধীরে পর্দ্দা ছাড়েন না কেন? আমরা ত ছাড়িয়াছি।

জমিলা : আপনারা পর্দ্দাত্যাগে খুব ভাল আদর্শ দেখাইতে পারিয়াছেন কই? যে ভাবে পর্দ্দা ছাড়িয়াছেন, তাহাতে আপনাদিগকে অনেক নিন্দা সহিতে হইতেছে।

আমি : নিন্দাকে ভয় করিবার প্রয়োজন?

আমেনা : ভয় না করুন, কিন্তু অনেকে প্রকৃত পর্দ্দার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন, এবং অনেক স্থলে পবিত্রতাভ্রষ্ট—

আমি : থামিলেন কেন? বলুন,—

আমেনা : আমি একটা অপ্রিয় কথা বলিতে যাইতেছিলাম, যাহা হউক, সমাজের প্রতিও আমাদের কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে, কেবল ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার জন্য আমরা সে কর্ত্তব্য অবহেলা করিতে পারি না।

আমি : হিন্দুরা ব্রাহ্ম সমাজের অযথা নিন্দা করিয়া থাকে, তাহাতে কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন দেখি না।

কুসুম : কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ যে পরিমাণে পর্দ্দাত্যাগে নিন্দা করেন, তাহা শুনিয়া সাবধান হওয়া উচিত। আমেনা দিদি হয়ত ব্রাহ্মসমাজে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই বলিতে যাইতেছিলেন।

আমেনা : আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন।

আমি : কিন্তু মোটের উপর মোসলেম সমাজে যেরূপ রমণী-পীড়ন হয়, সেরূপ আর কোথাও হয় না। আপনারা খনার মৃত্যুর কথা বলিলেন, কিন্তু লাহোরের "আনারকলি"র সমাধি মন্দিরের ইতিহাস জানেন? সম্রাট আকবরের আদেশে আনারকলিকে জীবন্ত প্রোথিত করা হইয়াছিল!! পরে সম্রাট জাঁহাগীর আনারকলির শবের উপর সেই সুন্দর সমাধিভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পরন্তু তাজমহলের অভ্যন্তরেও কোন বিষাদের ইতিহাস লুক্কায়িত আছে কি না কে জানে?

জমিলা : মুসলমানেরা রমণীদলন করে সত্য, কিন্তু তাহারা প্রকাশ্যে "নারীপূজা করি" বলিয়া ছলনা করে না। বরং এ দেশের কাট-মোল্লারা মনে করে যে, অবলাপীড়ন করাই তাহাদের ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য!

আমেনা : আমার মনে হয়, হিন্দুরা আমাদের নিকট অবরোধপ্রথা শিক্ষা করিয়াছেন, এবং কাট-মোল্লারা হিন্দুর নিকট নারীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন। নতুবা কোরান শরীফের বিধান মানিলে অবলা-পীড়নও চলে না; অন্যায় অন্তঃপুরপ্রথাও চলে না।

আমি : আপনারা কি মনে করেন, কাট-মোল্লারা অন্যায় পর্দ্দার পক্ষপাতী?

জমিলা : দেখ ভাই আমেনা! এখন আবার মোল্লাদের মৌচাকে ঢিল ছুড়িও না!

আমেনা : হাঁ, ঠিক বলিলেন। এখন আমি মোল্লাদের মৌচাকে লোষ্ট্র নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত নহি। মোল্লাদের কথা ছাড়ুন, মিসেস চ্যাটার্জ্জি!

আমি : মৌমাছিকে ভয় করিলে আপনারা মধু আহরণ করিবনে কিরূপে?

জমিলা : মধু লুণ্ঠন করিবার সময় ত পূর্ব্বেই সাবধানে যথেষ্ট ধূম অগ্নি লইয়া যাওয়া হয়; এবং সে সময় দুই একটা মৌমাছির দংশন বরং সহ্য হয়! কিন্তু মধু লইতে

প্রস্তুত না থাকিয়া অনর্থক মৌচাকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা বালকোচিত মূর্খতা হইবে। এখানে কথা হইতেছে—অবলাপীড়নের, তাহাই বলুন।

আমি : তাহা ত আপনারা বলিবেন, আমি শুনিব।

আমেনা : বলিবার ত অনেক ছিল; সে সব মর্ম্মভেদী কাহিনী কি বলিয়া শেষ করা যায়? তবে, আজি আর সময় নাই; এখন উঠি কুসুম দিদি!

অতঃপর আমরা স্ব স্ব ভবনে ফিরিলাম।

মহিলা, পৌষ-ফাল্গুন ১৩১২

নূতন পুস্তক ধর্ম্মসাধননীতি

অদ্য আমার সমালোচনা পাঠাইলাম। আপনার লেখার সমালোচনা আমি কি করিব? "সমালোচনা" বলিতে যেন একটা মুরুব্বীয়ানা ভাব থাকে; যেন সমালোচক নিজে একজন মান্যগণ্য লোক। তাই আমি আপনাকেই সম্বোধন করিয়া নিজ মন্তব্য ব্যক্ত করিলাম। আশা করি, ইহা মহিলায় প্রকাশিত করিবেন।

"ধর্ম্মসাধননীতি"তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে,—"ধর্ম্মসাধনা", "অন্ধ্বানুরাগ", "অনুতাপ", "চিত্তসংযমের উপায়", "বাহ্যিক উপাসনা", "আন্তরিক উপাসনা", "জীবন্ত উপাসনা", "নামসাধন", "ধর্ম্মসঙ্গীত", "যোগ ও প্রেমাবেশ", "রোজা" (সংযমব্রত), "নির্ভয়স্থাপন", "সাংসারিক সুখের অসারতা", "কৃতজ্ঞতাতত্ত্ব", 'কামনা ও ক্রিয়া", "সাধুচরিত্র", "পরিশিষ্ট—অনুতাপতত্ত্ব", ইহার প্রত্যেকটি বিষয় কিরূপ মূল্যবান, তাহা সূচীপত্র দেখিলেই বুঝা যায়। আমরা এই উপাদেয় পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি।

পুস্তকের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে, "সেই মহাগ্রন্থে (অর্থাৎ কিমিয়ায় সাদতে) রাশি রাশি সমুজ্জ্বল সত্যরত্ন শোভা পাইতেছে।" আমি বলি, আমাদের ধর্ম্মসংক্রান্ত সত্যসমূহ "রত্ন"-ই বটে—তাই তাহা অতি যত্নে আরব্য ও পারস্য ভাষারূপ লৌহ সিন্দুকে আবদ্ধ; আর সমাজের কাটমোল্লাগণ উন্মুক্ত করবালহস্তে ঐ সিন্দুক রক্ষা করিতেছেন!—যেন একটি রত্নও ভাষান্তরিত হইতে না পারে। যেন আরব্য ও পারস্য ভাষানভিজ্ঞ লোকে সেই জ্ঞানরত্ন লাভ করিতে না পারে!

যখন কোন উদারচেতা মোসলেম ভ্রাতা ঐ গ্রন্থের কোন এক অংশ উর্দ্দু বা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া সাধারণের সমক্ষে ধরেন, তখন আমাদের মনে হয়, যেন সেই রত্নভাণ্ডারের একটি গবাক্ষ খুলিয়া গিয়াছে, দর্শকেরা বাহির হইতে তৃষিত নয়নে তাহার শোভা কিছু কিছু দেখিতে পাইতেছে।

কিন্তু আপনি এ কি করিয়াছেন! রত্নভাণ্ডারের অনেকগুলি বাতায়ন মুক্ত করিয়াছেন!—মোল্লাদের প্রতি যত্নে রক্ষিত লৌহসিন্দুকও খুলিয়া ফেলিয়াছেন! সহজ সরল বঙ্গ ভাষারূপ ডালায় রত্ন বিতরণ করিতেছেন! "যতই করিবে দান তত যবে বেড়ে", এই নীতিবাক্যের মর্ম্ম আপনি বুঝিযাছেন, আপনি বেশ জানেন, বঙ্গের দীনতম

ব্যক্তিকেও থালাভরা মানিক দান করিলেও মহামূল্য "কিমিয়ায় সাদতের" ভাণ্ডার শূন্য হইবে না! তাহা অন্নছত্র খুলিয়াছেন, দেখি।

"মহাপুরুষ মোহাম্মদ এবং তৎপ্রবর্ত্তিত এসলামধর্ম্ম" গ্রন্থে " আত্মমন্তব্যে" লিখিত হইয়াছে, "একজন (মোসলমান) বন্ধু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছেন, 'আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ একজন কাফের করিয়াছে, তাহাকে পাইলে তাহার শিরশ্চেদন করিব'।" তাই ত আপনার হাতে লৌহসিন্দুকের চাবি আছে দেখিয়া যে, মোল্লাগণ ক্রুদ্ধ হইবেন, ইহা বিচিত্র নয়। আপনার কথা দূরে থাকুক, একজন মোসলমানও (বিখ্যাত "বানাতন্ নাশ" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা) উর্দ্দু ভাষায় কোরান শরীফের অনুবাদ করায় মোল্লাদের কোপে পতিত হইয়াছিলেন।

"মোসলেম জাতীয় ব্রাহ্মবন্ধু" কথাটা ভালমতে বুঝিতে পারিলাম না। জাতিতে মোসলমান, অথচ ধর্ম্ম বিশ্বাসে "ব্রাহ্ম" এরূপ লোকও আছে না কি?

"ধর্ম্মসাধননীতি"র "জীবন্ত উপাসনা" পাঠকালে আমাদের মনে পড়ে হজরত আলীর কথা। তাঁহার ন্যায় একাগ্রচিত্তে উপাসনা আর কে করিতে পারে? অহোদের যুদ্ধের সময় তাঁহার পায়ে শরবিদ্ধ হইয়াছিল। সেই শরটা বাহির করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার অত্যন্ত যন্ত্রণাবোধ হইত, এমন-কি তিনি কাহাকেও সেই আহত পদ স্পর্শ করিতে দিতেন না। তাঁহার বন্ধুরা পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলেন যে আলী মোর্ত্তজা যখন উপাসনা করিবেন, সেই সময় শরমোচন করা হইবে। কার্য্যত তাহাই করা হইয়াছিল। হজরত আলী উপাসনায় এমনই গভীর মগ্ন ছিলেন যে, শরমোচনের বিষয় জানিতেই পান নাই। ধন্য সেই উপাসনা। আর ধন্য সেই ভক্ত উপাসক।

গ্রন্থখানি এমন সর্বাঙ্গীণ সুন্দর যে ইহার কোন্ অংশের উল্লেখ করিব, কোন অংশ ছাড়িব—ঠিক করা দুঃসাধ্য। আমরা আপনার বিষয়ে ততোধিক চমৎকৃত হই অর্থাৎ আপনি মোসলমান ধর্ম্মসংকান্ত বিষয়গুলি যে ভাষায় লিখেন, তাহা ভক্তের ভাষা—কূট সমালোচকের ভাষা নহে। সহজেই বুঝা যায় যে, আপনি পাদ্রীদের ন্যায় আমাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিধি বিধানের ছিদ্রান্বেষণে বদ্ধপরিকর নহেন। এজন্য আমরা আপনার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। সে দিন আমার জনৈকা বন্ধুকে আমি এই গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছি—"মাননীয় বাবু গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুবাদিত অনেকগুলি পুস্তক আমার নিকট আছে। তাঁহার প্রেরিত 'ধর্ম্মসাধননীতি' পাঠকালে আমার মনে হয়, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক, না ইসলামধর্ম্ম প্রচারক?"

"ধর্ম্মসঙ্গীত" সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। "যে সকল সঙ্গীতে লোকের চরিত্র কলুষিত হইতে পারে, তাহা গান বা শ্রবণ করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। কিন্তু সাধকদিগের সাধনার প্রধান অনুকূল বলিয়া ধর্ম্মসঙ্গীত মোহাম্মদীর শাস্ত্রে সাধনার জন্য সমাদৃত হইয়াছে।" এই কথা লিখিয়া আপনি আমাদিগকে "সঙ্গীত বিরোধী" দুর্নাম হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সাধারণের বিশ্বাস যে "মোসলমান ধর্ম্মটা বড় 'কট খটে'—কারণ সঙ্গীত হেন মধুর বস্তুটি উহাতে নিষিদ্ধ।" এখন আর বোধ হয় কেহ আমাদিগকে সঙ্গীতবিরোধী মনে করিবেন না।

মোসলমান-শাস্ত্র সঙ্গীতকে সুনীতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া উহাকে অশ্লীলতা দোষ হইতে রক্ষা করিয়াছে।

সঙ্গীতশ্রবণে লোকের মন কি বিচলিত (distrubed) হয়? না, বরং উহাতে এমন একটি মোহিনী শক্তি আছে যে, শ্রোতা একাগ্রচিত্ত হইয়া পড়ে। প্রায় সকল দেশেই শিশুকে ঘুম পাড়াইবার জন্য শিশুরঞ্জক সুমধুর ছড়া গীত হইয়া থাকে। ইউরোপে রোগীর নিদ্রাকর্ষণের নিমিত্ত সেবিকাগণ গান করিয়া থাকেন। দুই জন মান্য মোসলমান স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা সঙ্গীতশ্রবণকালে অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে উপাসনা করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাতে একজন অশীতিপর বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, একদা তিনি প্রাতঃকালীন নমাজের সময় গায়কদের ভৈরবী আলাপ শুনিতে শুনিতে যেমন একাগ্রমনে নমাজ পড়িতে পারিয়াছিলেন, সেরূপ আত্মহারা নমাজ জীবনে আর কখনও পড়েন নাই! তবে ঢাকের চড়চড়ি বা আনাড়ী গায়কদের গর্দ্দভ-গর্জ্জনের কথা ভিন্ন! তাহাতে ত জলস্থল কম্পিত হয়—আর মানুষের মন চঞ্চল না হইবে কেন?

"কৃতজ্ঞতাতত্ত্বে" শিখিবার বিষয় অনেক আছে। যাহারা আপন অবস্থায় সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকে, তাহাদের পক্ষে এ অধ্যায়টি ঔষধরূপ।

"ধর্ম্মসাধননীতি" হিন্দু মোসলমান সকলেরই পাঠ্য হইয়াছে। যিনি একবার ইহা পাঠ করিবেন, তিনি মোহিত হইবেন।

মহিলা, ভাদ্র ১৩১৩

সিসেম ফাঁক

আলিবাবার নিকট দস্যুদের গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান পাইয়া কাসেম তথায় গেল। "সিসেম ফাঁক" বলিবা মাত্র ধনাগারের দ্বার খুলিয়া গেল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া সে বিস্ময়মুগ্ধ হইল। যক্ষের ধন দেখিয়া কাসেমের চক্ষুস্থির। সে দুই হস্তে প্রবাল, মুক্তা, মরকত, পদ্মরাগ, হীরক প্রভৃতি মূল্যবান প্রস্তর সংগ্রহ করিতে লাগিল। থলিয়া ভরিয়া আশরফী লইল। সে জীবনে এত ধন এখনও দেখে নাই; আজি তাহার ভারি আনন্দ। সে বহুমূল্য সাটিন, কিঙ্খাপ ইত্যাদি রেশমী বস্ত্রে বস্তা বোঝাই করিয়া রাখিল। অদ্য সে উষ্ট্র-পৃষ্ঠে ধন বহিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু সবই ত হইল; এখন বাহির হইবার উপায় কি? কাসেম ত মূলমন্ত্র—অর্থাৎ উক্ত চারি শব্দ; 'সিসেম ফাঁক", ভুলিয়া গিয়াছে! রাশীকৃত ধন লইয়া, ধনস্তূপে থাকিয়া, মণিমুক্তায় পরিবেষ্টিত হইয়া সে যে বন্দী-মুক্তির উপায় নাই। পরিশেষে কাসেম উন্মাত্তের ন্যায় দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া "গোধূম ফাঁক" "উচ্ছে ফাঁক" ইত্যাদি অনেক শব্দ উচ্চারণ করিল; কিন্তু সকল বৃথা—আসল কথা, "সিসেম ফাঁক" সে ভুলিয়া গিয়াছে; সুতরাং তাহার মুক্তির পথ রুদ্ধ।

আজি ১০/১২ বৎসর হইতে দেখিতেছি, আমাদের মুসলমান সমাজে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে—চারিদিকে বেশ জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; নানা প্রকার সভা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা কাসেমের ন্যায় "অল ইন্ডিয়া মোসলেম লীগ", "সেন্ট্রাল মহামেডান এসোসিয়েশন", অল ইন্ডিয়া এডুকেশনাল কনফারেন্স", অমুক ইনসটিটিউশন অমুক এসোসিয়েশন ইত্যাদি বহুবিধ ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু

প্রকৃত মুক্তির দ্বার উদঘাটনের মন্ত্রটি, অর্থাৎ স্ত্রীশিক্ষার বিষয় ভুলিয়া ছিলেন দেখিয়া আমি মৃদুহাস্য করিতাম। মনে মনে বলিতাম, ভ্রাতঃ! যাহাই করুন না কেন,—এ রত্ন-সম্ভার লইয়া সওগাত দিতে যাইবেন কোথায়? দ্বার যে বন্ধ। গৃহে যে গৃহিণী ধর্মে যে সহধর্মিনী, ভাবী বংশধরের যে জননী, ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার যে রক্ষয়িত্রী ও পালনকর্ত্রী তাহাকে সঙ্গে না লইলে আপনি গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিবেন না! গরিবের কথা বাসি হইলে ফলে; আমার কথাও (১০/১২ বৎসরের) বাসি হইয়া ফলিয়াছে।

এখন মুসলমান সমাজ বুঝিয়াছেন, স্ত্রীশিক্ষা ব্যতীত ও অধঃপতিত সমাজের উন্নতির আশা নাই। তাই তাঁহারা আর শুধু ভ্রাতৃসমাজ লইয়াই ব্যস্ত নহেন। চতুর্দিকে স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা হইতেছে ও জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। এখানে মুলসমান মহিলা সমিতি, সেখানে মহিলা ক্লাব প্রভৃতি নানাবিধ সদনুষ্ঠান আমাদের শ্রুতিগোচর ও নয়নগোচর হইতেছে। এমনকি, গতবর্ষের "অল ইন্ডিয়া এডুকেশনাল কনফারেন্সের" অধিবেশনে পর্দা নশীন মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান রাখিয়া তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, ভ্রাতৃগণ এখন ভগিনীদের চিনিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখন তাঁহারা বুঝিয়াছেন, "না জাগিলে সব ভারত-ললনা" এ ভারত আর জাগিবে না।

'সওগাত', অগ্রহায়ণ ১৩২৫

চাষার দুক্ষু

"ক্ষেতে ক্ষেত্রে পুইড়া মরি, রে ভাই
পাছায় জোটে না ত্যানা।
বৌ-এর পৈছা বিকায় তবু
ছেইলা পায় না দানা।"

শুনিতে পাই, দেড় শত বৎসর পূর্বে ভারতবাসী অসভ্য বর্বর ছিল,—এই দেড় শত বৎসর হইতে আমরা ক্রমশ সভ্য হইতে সভ্যতর হইতেছি। শিক্ষায়, সম্পদে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও জাতির সমকক্ষ হইতে চলিয়াছি। এখন আমাদের সভ্যতা ও ঐশ্বর্য রাখিবার স্থান নাই। সত্যই ত, এই যে অভ্রভেদী পাঁচতলা পাকা বাড়ি, রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, ষ্টীমার, এরোপ্লেন, মোটর লরী, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, পোস্টাফিস, চিঠিপত্রের সুনিয়মিত ডেলিভারি, এখানে পাটকল, সেখানে চটকল, অট্টালিকার চূড়ায় বড় বড় ঘড়ি, সামান্য অসুখ হইলে আট দশ জন ডাক্তারে টেপে নাড়ি, চিকিৎসা, ঔষধ, অপারেশন, ইনজেকশন, ব্যবস্থা-পত্রের ছড়াছড়ি, থিয়েটার, বায়স্কোপ, ঘৌড়দৌড় জনতার হুড়াহুড়ি, লেমলেন্ড জিঞ্জারেন্ড, বরফের গাড়ি, ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান, অনারেবলের গড়াগড়ি (বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের বাড়াবাড়ি)—এ সব কি সভ্যতার নির্দশন নহে? নিশ্চয়! যে বলে, "নহে", সে ডাহা নিমকহারামক। কিন্তু ইহার অপর পৃষ্ঠাও আছে—কেবল কলিকাতাটুকু আমাদের গোটা ভারতবর্ষ নহে এবং

মুষ্টিমেয়, সৌভাগ্যশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি সমস্ত ভারতের অধিবাসী নহে। অদ্য আমাদের আলোচ্য বিষয়, চাষার দারিদ্র। চাষাই সমাজের মেরুদণ্ড। তবে আমার "ধান ভানিতে শিবের গান" কেন? অবশ্যই ইহার কারণ আছে। আমি যদি প্রথমেই পল্লীবাসী কৃষকের দুঃখ-দুর্দশার কান্না কাঁদিতে বসিতাম, তবে কেহ চট করিয়া আমার চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দিয়া দেখাইতেন যে, আমাদের মোটরকার আছে, গ্রামোফোন আছে ইত্যাদি। ভালর ভাগ ছাড়িয়া কেবল মন্দের দিকটা দেখা কেন? সেইজন্য ভালর দিকটা আগে দেখাইলাম। এখন মন্দর দিকে দেখা যাউক।

ঐ যে চটকল আর পাটকল;—এক একটা জুটমিলের কর্মচারীগণ মাসিক ৫০০.০০-৭০০.০০ (পাঁচ কিম্বা সাত শত) টাকা বেতন পাইয়া নবাবী হালে থাকে, নবাবী চালে চলে, কিন্তু সেই জুট (পাট) যাহারা উৎপাদন করে, তাহাদের অবস্থা এই যে-"পাছায় জোটে না ত্যানা!" ইহা ভাবিবার বিষয় নহে কি? আল্লাহ তালা এত অবিচার কিরূপে সহ্য করিতেছেন?

সমগ্র ভারতের বিষয় ছাড়িয়া কেবল বঙ্গদেশের আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে। একটি চাউল পরীক্ষা করিলেই হাঁড়িভরা ভাতের অবস্থা জানা যায়। আমাদের বঙ্গভূমি সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা, তবু চাষার উদরে অন্ন নাই কেন? ইহার উত্তর শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়াছেন ত "ধান্য তার বসুন্ধরা যার"। তাই ত, অভাগা চাষা কে? সে কেবল "ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড় মরিবে", হাল বহন করিবে, আর পাট উৎপাদন করিবে। তাহা হইলে চাষার ঘরে যে, "মরাই ভরা ধান ছিল, গোয়াল ভরা গরু ছিল, উঠান ভরা মুরগি ছিল", এ কথার অর্থ কি? ইহা কি শুধুই কবির কল্পনা? না, কবির কল্পনা নহে, কাব্য উপন্যাসও নহে, সত্য কথা। পূর্বে ওসব ছিল, এখন নাই। আরে! এখন যে আমরা সভ্য হইয়াছি! ইহাই কি সভ্যতা? সভ্যতা কি করিবে, ইউরোপের মহাযুদ্ধ সমস্ত পৃথিবীকে সর্বস্বান্ত করিয়াছে, তা বঙ্গীয় কৃষকের কথা কি?

আমি উপযুক্ত উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারি না, কারণ ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ ত এই সাত বৎসরের ঘটনা। ৫০ বৎসর পূর্বেও কি চাষার অবস্থা ভাল ছিল, দুই-একটি উদাহরণ দেখাই—বাল্যকালে শুনিতাম, টাকায় ৮ সের সরিষার তৈল ছিল, আর টাকায় ৪ সের ঘৃত। যখন টাকায় ৮ সের সরিষার তৈল ছিল, তখনকার একটা গল্প এই :

"কৃষক কন্যা জমিরনের মাথায় বেশ ঘন ও লম্বা চুল ছিল, তার মাথায় প্রায় আধ পোয়াটাক তেল লাগিত। সেইজন্য যেদিন জমিরন মাথা ঘষিত, সেদিন তার মা তাকে রাজবাড়ি লইয়া আসিত, আমরা তাকে তৈল দিতাম।" হা অদৃষ্ট! যখন দুই গণ্ডা পয়সায় এক সের তৈল পাওয়া যাইত, তখনও জমিরনের মাতা কন্যার জন্য এক পয়সার তৈল জুটাইতে পারিত না।

এই ত ৩০/৩৫ বৎসর পূর্বে বেহার অঞ্চলে দুই সের খেসারি বিনিময়ে কৃষক-পত্নী, কন্যা বিক্রয় করিত! পঁচিশ বৎসর পূর্বে উড়িষ্যার অন্তর্গত কণিকা রাজ্যের অবস্থা এই ছিল যে, কৃষকেরা "পখাল" (পান্তা) ভাতের সহিত লবণ ব্যতীত অন্য কোন উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিত না। সুটকি মাছ পরম উপাদেয় ব্যঞ্জন বলিয়া পরিগণিত হইত। তখন সেখানে টাকায় ২৫/২৬ সের চাউল ছিল। সাত ভায়া নামক সমুদ্র-

তীরবর্ত্তী গ্রামের লোকেরা পখাল ভাতের সহিত লবণও জুটাইতে পারিত না। তাহারা সমুদ্র-জলে চাউল ধুইয়া ভাত রাঁধিয়া খাইত। রংপুর জেলার কোন কোন গ্রামের কৃষক এত দরিদ্র যে, টাকায় ২৫ সের চাউল পাওয়া সত্ত্বেও ভাত না পাইয়া লাউ, কুমড়া প্রভৃতি তরকারি ও পাট-শাক, লাউ শাক ইত্যাদি সিদ্ধ করিয়া খাইত! আর পরিধান করিত কি, শুনিবেন? পুরুষেরা বহু কষ্টে স্ত্রীলোকদের জন্য ৮ হাত কিম্বা ৯ হাত কাপড় সংগ্রহ করিয়া দিয়া নিজেরা কৌপিন ধারণ করিত! শীতকালে দিবাভাগে মাঠে মাঠে রৌদ্রে যাপন করিত; রাত্রিকালে শীত অসহ্য বোধ হইলে মাঝে মাঝে উঠিয়া পাটখড়ি জ্বালিয়া আগুন পোহাইত। বিচালী (বা পোয়াল খড়) শয্যায় শয়ন করিত। অথচ এই রংপুর ধান্য ও পাটের জন্য প্রসিদ্ধ। সুতরাং দেখা যায়, ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সহিত চাষার দারিদ্রের সম্পর্ক অতি অল্পই। যখনই টাকায় ২৫ সের চাউল ছিল, তখনও তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই—এখন টাকায় ৩/৪ সের চাউল হওয়ায়ও তাহারা অর্ধানশনে থাকে :

এ কঠোর মহীতে
চাষা এসেছে শুধু সহিতে;
আর মরমের ব্যথা লুকায়ে মরমে
জঠর-অনলে দহিতে!

পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বের চিত্র ত এই, তবে "মরাই ভরা ধান ছিল, গোয়াল ভরা গরু ছিল, ঢাকা-মসলিন কাপড় ছিল" ইত্যাদি কোন সময়ের অবস্থা? মনে হয়, অন্তত শতাধিক বৎসর পূর্বের অবস্থা। যখন—

কৃষক রমণী স্বহস্তে চরকায় সূতা কাটিয়া বাড়িশুদ্ধ সকলের জন্য কাপড় প্রস্তুত করিত। আসাম এবং রংপুর জেলায় এক প্রকার রেশম হয়, স্থানীয় ভাষায় তাহাকে "এণ্ডি" বলে। এণ্ডি রেশমের পোকা প্রতিপালন ও তাহার গুটি হইতে সূতা কাটা অতি সহজসাধ্য কার্য। এই শিল্প তদ্দেশবাসিনী রমণীদের একচেটিয়া ছিল। তাহারা এ উহার বাড়ি দেখা করিতে যাইবার সময় টেকো হাতে লইয়া সূতা কাটিতে কাটিতে বেড়াইতে যাইত। এণ্ডি কাপড় বেশ গরম এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। ইহা ফ্লানেল হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে, অথচ ফ্লানেল অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী। একখানি এণ্ডি কাপড় অবাধে ৪০ (চল্লিশ) বৎসর টেকে। ৪/৫ খানি এণ্ডি চাদর থাকিলে লেপ, কম্বল, কাঁথা কিছুরই প্রয়োজন হয় না। ফল কথা, সেকালে রমণীগণ হাসিয়া খেলিয়া বস্ত্র সমস্যা পূরণ করিত। সুতরাং তখন চাষা অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল ছিল না। তখন কিন্তু সে অসভ্য বর্বর ছিল। এখন তাহারা সভ্য হইয়াছে, তাই —

শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ
ঢেকে রাখে টাক।

কিন্তু তাহাদের পেটে নাই ভাত। প্রশ্ন হইতে পারে—সভ্যতার সহিত দারিদ্র্য বৃদ্ধি হইবার কারণ কি? কারণ—যেহেতু আপাত সুলভ মূল্যে বিবিধ রঙিন ও মিহি কাপড় পাওয়া যায়, তবে আর চরকা লইয়া ঘর্ঘর করিবে কেন? বিচিত্র বর্ণের জুট ফ্লানেল থাকিতে বর্ণহীন এণ্ডি বস্ত্র ব্যবহার করিবে কেন? পূর্বে পল্লীবাসিনীগণ ক্ষার প্রস্তুত করিয়া

কাপড় কাচিত, এখন তাহাদের কাপড় ধুইবার জন্য হয় ধোপার প্রয়োজন, নয় সোডা। চারি পয়সার সোডায় যে কার্য সিদ্ধ হয়, তাহার জন্য আর কষ্ট করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে কেন? এইরূপে বিলাসিতা শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে বিষে জর্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে। ঐ যে "পাছায় জোটে না ত্যানা" কিন্তু মাথায় ছাতা এবং সম্ভবত পায়ে জুতা আছে ত! "বৌ-এর পৈছা বিকায়" কিন্তু তবু "বেলোয়ারের চুড়ি" থাকে ত! মুটে মজুর ট্রাম না হইলে দুই পদ নড়িতে পারে না। প্রথম দৃষ্টিতে ট্রামের ভাড়া পাঁচটা পয়সা অতি সামান্য বোধ হয়—কিন্তু ঐ যাঃ, যাইতে আসিতে দশ পয়সা লাগিয়া গেল! এই রূপে দুইটি পয়সা, চারি পয়সা করিয়া—ধীরে ধীরে সর্বস্বহারা হইয়া পড়িতেছে।

নিজ অন্ন পর কর পণ্যে দিলে,
পরিবর্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে!

বিলাসিতা ওরফে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে 'অনুকরণপ্রিয়তা' নামক আর একটা ভূত তাহাদের স্কন্ধে চাপিয়া আছে। তাহাদের আর্থিক অবস্থা সামান্য একটু সচ্ছল হইলেই তাহারা প্রতিবেশী বড়লোকদের অনুকরণ করিয়া থাকে। তখন চাষার বৌ-ঝির যাতায়াতের জন্য সওয়ারি চাই; ধান ভানিবার জন্য ভারানি চাই ইত্যাদি। এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে :

সর্ব অঙ্গেই ব্যথা,
ঔষধ দিব কোথা?
এ বহ্নির শত শিখা
কে করিবে গণনা?

অতঃপর শিবিকাবাহকগণ পালকি স্কন্ধে লইয়া ট্রামে যাতায়াত করিলেই সভ্যতার চূড়ান্ত হইবে।

আবার মজা দেখুন, আমরা ত সুসভ্য হইয়া এণ্ডি কাপড় পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু ঐ এণ্ডি কাপড়ই "আসাম সিল্ক" নামে অভিহিত হইয়া কোট, প্যান্ট ও স্কার্ট রূপে ইউরোপীয় নর-নারীদের-বর-অঙ্গে শোভা পাইতে লাগিল। ক্রমে পল্লীবাসিনীর সভ্যতার মাত্রাধিক্য হওয়ায় (অর্থাৎ আর এণ্ডি পোকা প্রতিপালন করা হয় না বলিয়া) এখন আর হোয়াইট-এ্যাওয়ে লেডলর দোকানে "আসাম সিল্ক" পাওয়া যায় না। কেবল ইহাই নহে, আসাম হইতে এণ্ডি গুটি বিদেশে চালান যায়-তথা হইতে সূত্ররূপে আবার আসামে ফিরিয়া আইসে। এই ত সেদিনের কথা—বঙ্গের গভর্নর লর্ড কার্মাইকেল একখানি দেশী রেশমী রুমালের জন্মস্থানের অনুসন্ধান করেন, কেহই বলিতে পারিল না, সেরূপ রুমাল কোথায় প্রস্তুত হয়। কিন্তু লর্ড কার্মাইকেল ইংরাজ বাচ্চা—সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন; তিনি রুমালটার জন্মভূমি আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। পূর্বে মুর্শিদাবাদের কোন গ্রামে ঐরূপ রেশমী রুমাল প্রস্তুত হইত, এখন আর হয় না, কারণ সে গ্রামের লোকেরা সুসভ্য হইয়াছে! ফল কথা, সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশি শিল্পসমূহ ক্রমশ বিলুপ্ত হইয়াছে।

সুখের বিষয়, সম্প্রতি পল্লীগ্রামের দুর্গতির প্রতি দেশবন্ধু নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কেবল দৃষ্টিপাতই যথেষ্ট নহে; চাষার দুক্ষু যাহাতে দূর হয়, সেজন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ চেষ্টা যত্ন করিতে হইবে। আবার সেই "মরাই-ভরা ধান, ঢাকা মসলিন" ইত্যাদি লাভ করিবার একমাত্র উপায় দেশী শিল্প—বিশেষত নারী শিল্পসমূহের পুনরুদ্ধার। জেলায় জেলায় পাটের চাষ কম করিয়া তৎপরিবর্তে কার্পাষের চাষ প্রচুর পরিমাণে হওয়া চাই এবং চরকা ও এণ্ডি সুতার প্রচলন বহুল পরিমাণে হওয়া বাঞ্ছনীয়। আসাম এবং রংপুরবাসিনী ললনাগণ এণ্ডি পোকা প্রতিপালনে তৎপর হইলে সমগ্র বঙ্গদেশের বস্ত্র-ক্লেশ লাঘব হইবে। পল্লীগ্রামে সুশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হওয়া চাই। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা আর ঘরে চরকা ও টেকো হইলে চাষার দারিদ্র্য ঘুচিবে।

'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য পত্রিকা', বৈশাখ ১৩২৮

এণ্ডি শিল্প

ধন-ধান্যে-পুষ্পে ভরা রত্ন-প্রসবিনী ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে নানা রেশম কীট জন্মিয়া থাকে, তাহা অবশ্য অনেকেই অবগত আছেন। কোন প্রকার কীট কূলপত্র, কোন কীট তুতপত্র ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহাদের কোষ বা গুটী দ্বারা বিবিধ রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হয়। অদ্য আমরা 'এণ্ডি' নামক এক প্রকার রেশমের জন্ম এবং ইতিহাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এণ্ডি গুটী প্রধানতঃ আসাম অঞ্চলে এবং রংপুর জেলায় আবাদ হয়।

এণ্ডি গুটী আবাদ করিতে অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয় না, পরিশ্রমও নগণ্য বলিলেই হয়। ইহার খাদ্য এরণ্ড পত্র। রংপুরে এরণ্ড গাছের কোন মূল্য নাই, যত্রতত্র প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া জঙ্গল হয়। সম্ভবতঃ এরণ্ড-পত্র খায় বলিয়া এ রেশমের নাম "এণ্ডি" ("এরণ্ডি", ক্রমে মধ্যস্থলের "র" লুপ্ত হইয় যাওয়ায় "এণ্ডি") হইয়াছে। সুতরাং রংপুরে এণ্ডি পোকার খাদ্য সংগ্রহ কিছুমাত্র আয়াসসাধ্য ব্যাপার নহে। সম্ভবতঃ চারি আনার ডিম ক্রয় করিয়া যে পরিমাণ পোকার গুটী লাভ হয়, তদ্দ্বারা স্বচ্ছন্দে একখানা ১১ হাত লম্বা ও ৪৪ ইঞ্চি বহরের কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রকার একখানা কাপড়ের মূল্য ৬ ছয় টাকা ছিল; এখন (যদি পাওয়া যায়) তাহার মূল্য ন্যূনাধিক ১৬/১৭ টাকা। যে গুটী সুতা পূর্ব্বে এক পয়সায় পাওয়া যাইত, এখন তাহার মূল্য ছয় পয়সা! অতএব এণ্ডি ধূতির মূল্য এখন ৩৬ হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় হইত না। ঠিক চারি আনার ডিমে ৫/৬ কাহন (অর্থাৎ একখানি ১১ হাতি ধুতির উপযোগী) গুটী লাভ হয় কিনা তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না। কারণ এখন রংপুর জেলায় এণ্ডি শিল্প বিলুপ্ত হওয়ায় আমি বহু চেষ্টা করিয়াও এ সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারি নাই। এণ্ডি সম্বন্ধে বঙ্গের প্রসিদ্ধ লেখক কবিবর মৌলবী শেখ ফজলুল করিম সাহেব লিখিয়াছেন :

"এণ্ডির তুলির জন্য এখানে (রঙ্গপুরে) ২/৪ জনের কাছে অনুসন্ধান লইলাম, যাঁহারা সখের জন্যে পোকা পুষিয়া থাকেন, এমন ২/১ জনকেও জিজ্ঞাসা করিলাম,

কিন্তু দর জানা ব্যতীত আর কোনই উপকার হইল না। ২০ গণ্ডা গুটীর দাম ১৫ পয়সা মাত্র। এখানে কাহারো ঘরে উহা বিক্রয়ের জন্য মৌজুদ নাই।"

গুটীর হিসাবে এই প্রকার ২০ গণ্ডায় এক পণ; ১৬ পণে এক কাহন। তাহা হইলে দেখা যায়, এক কাহন গুটীর মূল্য মাত্র চারি আনা। তিন কাহন গুটীতে যে পরিমাণ সুতা প্রস্তুত হয় তদ্দ্বারা ৬ হাত লম্বা ও তিন হাত চওড়া একখানি চাদর প্রস্তুত হইতে পারে। এইরূপ একখানি চাদরের মূল্য পূর্ব্বে ৩.০০/৪.০০ ছিল, এখন ৯.০০ হইতে ১৩.০০ পর্য্যন্ত।

আমাদের বাল্যকালে যখন এণ্ডি কাপড় দেখিতাম, তখন শুনিতাম যে উহা ভদ্রলোকের ব্যবহার্য্য নহে; উহা কেবল চাষারা ব্যবহার করে। সুতরাং এণ্ডি বস্ত্রকে হেয় দৃষ্টিতে দেখিতাম। দরিদ্র চাষী স্ত্রীলোকেরাই এণ্ডি পোকা পোষণ করিত, এণ্ডি সুতা কাটিত এবং ইহার কাপড় ব্যবহার করিত। তাহারা স্বহস্তে কাপড়ের তানা পর্য্যন্ত করিয়া দিত, বাকী কার্য্য অন্তুবায়গণ করিত। আমরা ত এইরূপে লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিলাম, কিন্তু ইহার আদর কদর করিল কাহারা? আমরা যাঁহাদের পদলেহন—না, জুতার ধূলি লেহন করিয়া ধন্য হই।

আসাম অঞ্চলে এই এণ্ডি বস্ত্র বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হয় বলিয়া আমাদের গুরুর—দেড় শত বৎসরের গুরু ইউরোপীয়গণ ইহাকে "আসাম সিল্ক" বলিযা অতি আদরের সহিত ইহা দ্বারা কোট, স্কার্ট প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দেখাদেখি, আমরাও হোয়াইট এ্যাওয়ে, লেডলর দোকান হইতে "আসাম সিল্ক"-এর "সুট" ক্রয় করিয়া পরিধান করা ফ্যাশন মনে করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমরা এই মূল্যবান শিল্পের উন্নতির কোন চেষ্টা করিলাম না। ক্রমে রংপুরের চাষা ও আসামের বন্য পাহাড়ী স্ত্রীলোকেরা এণ্ডি সুতা কাটা ভুলিয়া গেল। ফলে এখন আসাম হইতে গুটী বিদেশে রপ্তানী হয়, তথা হইতে কলে সুতা প্রস্তুত হইয়া পুনরায় আসামে আইসে। স্থানীয় তন্তুবায়গণ সেই সূত্রে বস্ত্র প্রস্তুত করে, পরে সেই "আসাম সিল্ক" কলিকাতার কোন কোন দোকানে বিক্রীত হয়। কিন্তু এখন সে অবস্থাও নাই, অর্থাৎ "আসাম সিল্ক" আর সহজে (অন্ততঃ লেডলর দোকানে) পাওয়া যায় না! সংবাদপত্রে যে আসামী এণ্ডির বিজ্ঞাপন দেখা যায় তাহা খাঁটি বস্তু কিনা সন্দেহ। কারণ "কাশী সিল্ক" নামে যে রেশমী কাপড় বাজারে দেখা যায়, তাহা জার্ম্মানী হইতে আমদানী করা খোঁটা মাল।

বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে খদ্দর কাপড়ের কি মূল্য ছিল? তাহা কেবল পশ্চিম অঞ্চলের কোল, সাঁওতাল, জোলা, ধুনিয়া প্রভৃতি লোকেরা ব্যবহার করিত। এখন ত খদ্দর আমাদের মাথায় উঠিয়াছে। এই সুবর্ণ সুযোগে খদ্দর, এণ্ডি ও অপরাপর রেশমী বস্ত্রের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। শুনিতেছি, একা খদ্দর আমাদের দেশের ষোল আনা অভাব পূরণ করিতে পারিবে না। তাহা হইলে ভারতের বিবিধ পট্টবস্ত্র অগ্রসর হউক। এণ্ডি খদ্দরের তুলনায় কয়েকটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ; (১) দীর্ঘকাল স্থায়ী (১০ বৎসর-এর পূর্ব্বে ছিন্ন হইবার আশঙ্কা নাই); (২) খদ্দর অপেক্ষা ওজনে হাল্কা; (৩) ফ্লানেলের ন্যায় গরম; (৪) ইহাতে কোন প্রকার ভেজালের আশঙ্কা নাই। খদ্দরের তানায় মিলের সুতা ব্যবহৃত হয় বলিয়া তাহাকে খাঁটি স্বদেশী বা হস্তনির্ম্মিত বলা যায় না। তাহা ছাড়া

"জাপানী খদ্দর" নাকি বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। এণ্ডি বস্ত্রের এসব বালাই নাই। আরও এক মজার কথা এই যে, যাবতীয় কাপড় নূতন অবস্থায় নয়ন রঞ্জন চকচকে থাকে,—দুই তিন বার ধুইলে বিশ্রী হয়, পুরাতন হইলে একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়। এণ্ডি কাপড় ইহার বিপরীত—নূতন অবস্থায় বিশ্রী থাকে, প্রথম দর্শনে গ্রাহক বা ক্রেতাকে উহার প্রতি আকৃষ্ট করিবার মত মনোহর গুণ উহার নাই। কিন্তু এ কাপড় যতই ধোয়া যায়, যতই পুরাতন হয়, ততই সুশ্রী এবং ব্যবহারে আরামদায়ক, মসৃণ ও দেখিতে চিকচিকে হয়।

দুঃখের বিষয়, রংপুরের এণ্ডি শিল্প বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সময় সময় সংবাদপত্রে "আসাম-জাত এণ্ডি" কাপড়ের বিজ্ঞাপন দেখা যায়, কিন্তু রংপুরের সহিত এণ্ডির কোন সম্পর্ক আছে বা ছিল কেহ জানে না। ঝাড়া ছয় মাস পর্য্যন্ত রংপুরের কতিপয় ভদ্রলোককে পত্র লিখিয়া বিরক্ত করিয়া আমি মাত্র একটি গ্রাম আবিষ্কার করিয়াছি, যেখানে এখন এণ্ডি শিল্পের শেষ নিঃশ্বাসটুকু বহিতেছে। কিন্তু এই সবে ধন নীলমণি বেলকা গ্রামের স্ত্রীলোকরাও এখন এণ্ডি পোকা পোষণ করে না। কেহ কেহ নিতান্ত দারিদ্র্য-পেষণে অনন্যোপায় হইলে পোকা পুষিয়া কিছু উপার্জ্জনের চেষ্টা করে। এ সময় এই নাভিশ্বাসটুকু রক্ষা না করিলে ইহারই অস্তিত্ব লোপ পাইবে।

বেলকা হাই ইংলিশ স্কুলের হেডমাস্টার মহাশয় অতিশয় দেশ-হিতৈষী উৎসাহী লোক। তিনি ঐ স্কুলের ছাত্রদের জন্য একটি বয়ন ক্লাশ খুলিয়াছেন। তাঁহার বয়ন যন্ত্রে এণ্ডি বস্ত্র বয়ন করা হয়। সুতা লাভের সহজ উপায় স্কুলে পোকা-পোষণ করা। কিন্তু উৎসাহ, সহায় ও সহকর্ম্মীর অভাবে তিনি পোকা প্রতিপালন করিতে অক্ষম।

এণ্ডি গুটী আবাদের প্রণালী এই :

(১) হাট হইতে কতকগুলি পোকার বীজ ক্রয় করিয়া আনিতে হয়। বীজ অর্থে, কতকগুলি ডিমোলা প্রজাপতি ও ডিম বুঝিতে হইবে।

(২) ডিমগুলি এক খণ্ড পরিষ্কার নেকড়ায় বাঁধিয়া একটা ডালাতে শিকায় তুলিয়া রাখা হয়।

(৩) সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ কাল পরে ডিম ফুটিয়া পোকা বাহির হইলে এরণ্ডের খুব কচি পাতা ছিঁড়িয়া উহাদের খাইতে দিতে হইবে।

(৪) প্রত্যহ পোকার বাসস্থান একবার পরিষ্কার করিতে হইবে; পিপীলিকা ও মাছি উহার পরম শত্রু। সেজন্য কেহ কেহ নেটের ন্যায় পাতলা কাপড় দ্বারা পোকা ঢাকিয়া রাখে।

(৫) দুই চারি দিন কচি পাতা খাইয়া পোকাগুলি একটু বড় হয়, ইহার পর একদিন দেখিবেন, পোকাগুলি অসাড়ভাবে পড়িয়া আছে, নড়েও না, পাতাও খায় না। তখন উহাদের মৃত জ্ঞানে ফেলিযা দিবেন না। এই অবস্থাকে স্থানীয় ভাষায় "পোকার ঘুম" বলে। এক অহোরাত্রি কিম্বা ততোধিক কাল ঘুমাইবার পর পোকাগুলি একটু বড় পাতা অধিক পরিমাণে খাইতে আরম্ভ করে, এখন আর পাতা ছিঁড়িয়া দিতে হয় না।

(৬) কিছুদিন পরে পোকা আবার ঘুমাইবে। এইরূপ পোকা তিন কিম্বা চারি বার ঘুমায়।

(৭) শেষবারে ঘুমের পর পোকাগুলি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩ ইঞ্চি হয়, রংটাও এরণ্ড পত্রের অনুরূপ হয়। এখন ইহারা রাক্ষসের মত পাতা খাইতে আরম্ভ করে। সে সময় ইহাদের পাতা খাওয়ার খস্ খস্ শব্দ শোনা যায়। এখন বড় বড় পাতা গোছা বাঁধিয়া পোকার মাচার উপর একটা বাঁশের আড়ে ঝুলাইয়া দিতে হয়। দিনে তিন চারিবার প্রচুর পরিমাণে পাতা দিতে হইবে এবং দুইবার পোকার বাসস্থান মাচা পরিষ্কার করিতে হইবে।

(৮) ইহার ৩/৪ দিন পরেই পোকা গুটী প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে, এ অবস্থাকে স্থানীয় ভাষায় "জরা" বলে। পোকা জরিতে আরম্ভ করিলে আর খায় না, বরং পাতার গাছে যেখানে সেখানে জরিয়া থাকে।

(৯) অতঃপর এই জরিত গুটীর যেগুলি বীজের জন্য রাখা হইবে, সেইগুলি ব্যতীত অপর গুটীগুলিকে গরম ক্ষারের জলে ডুবাইয়া তাহাদের ভিতরকার পোকা মারিয়া ফেলা হয়। ঐরূপ না করিলে কিছুদিনের পর পোকাগুলি গুটি কাটিয়া প্রজাপতি রূপে বাহির হইয়া পড়ে। তখন ঐ ছিদ্রযুক্ত গুটী হইতে ভাল সুতা হয় না—হইলেও সে সুতা মজবুত হয় না।

(১০) ক্ষারে সিদ্ধ করিবার পর গুটীগুলিকে উল্টাইয়া আভ্যন্তরীণ মৃত কীট ফেলিয়া দিয়া ধুইয়া লওয়া হয়।

এর ফসল গুটী—অর্থাৎ ডিম ফুটা হইতে আরম্ভ করিয়া পোকা জরা পর্য্যন্ত যাবতীয় ক্রিয়া ২/৩ মাসে সম্পন্ন হয়। তাহা হইলে দেখা যায়, বৎসরে অন্ততঃ তিন ফসল গুটী আবাদ করা যাইতে পারে।

(১১) এণ্ডি সুতা প্রসুত করিবার প্রণালী, চরকা দ্বারা তুলার সুতা, এবং অন্যান্য রেশমী গুটী হইতে সুতা প্রস্তুত করার পদ্ধতি হইতে অনুরূপ। ক্ষারে সিদ্ধ করা গুটীর ৫টি হইতে ১০টি পর্য্যন্ত অঙ্গুলীর অগ্রভাগে কিম্বা এক খণ্ড কাঠির উপর পরে পরে সাজাইয়া রাখা হয়; ইহাকে তুলি বলে। এই তুলিগুলিকে রৌদ্রে শুকাইয়া তুলিয়া রাখা হয়। সুতা কাটিবার সময় ইচ্ছামত দুই তিনটি তুলি শীতল জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া পরে একটি কাঠিতে একটা তুলি রাখিয়া লোহার কিম্বা বাঁশের টোকোর সাহায্যে সুতা কাটা হয়। টোকোর অগ্রভাগ দেখিতে কতকটা ক্রুশের সুচের মত। টোকোর নিম্ন দিকে একটা পাথরের চাক্তি। এই চাকতির উপর টোতোতে সুতা জড়াইতে হয়। মাঝে মাঝে তুলিটা জলে ভিজাইয়া লইতে হয়। বাস্, বাম হস্তে তুলির কাঠি, দক্ষিণ হস্তে টেকো—বসিয়া, দাঁড়াইয়া হাঁটিয়া বেড়াইয়া—যেরূপে ইচ্ছা সূতা কাটা যায়।

পূর্ব্বে পল্লীগ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যাবধূগণ সখ করিয়া স্বহস্তে অতি সূক্ষ্ম সুতা কাটিতেন। সে এণ্ডি সুতা, রেশমী সুতার সহিত প্রতিযোগিতা করিত। এখন আর

সেদিন নাই, সুতরাং এখন কুলবালা দূরে থাকুক, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বউ-ঝিও আর টেকো হাতে লয় না।

পূর্ব্বে নিষ্ঠাবতী হিন্দু মহিলা পূজা করিবার সময় পট্ট বস্ত্র পরিধান করিতেন, এখন তাঁহাদের পুরোহিতের জন্য পৈতা আইসে জার্ম্মানী হইতে! অধঃপতনের চূড়ান্ত আর কাহাকে বলে?

রংপুরে বামনডাঙ্গা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী যে দুই একটি পল্লীতে এণ্ডি শিল্পের নাভিশ্বাস বহিতেছে, তথাকার অধিবাসীগণ সামান্য চেষ্টা করিলে এই ব্যবসায় দ্বারা বেশ দু'পয়সা অর্জ্জন করিতে পারেন। একখানা ৬ হাত ও ৩ হাত চওড়া চাদরের জন্য মূলধন ও লাভের একটা মোটহিসাব দেখুন :

মূলধন	
১। তিন কাহন গুটী—	.৭৫
২। সুতা কাটার মজুরী (৩ কাহন গুটিতে বোধ হয় ১ সের সুতা হয়)	
১ সের সুতার জন্য—	.৫০
৩। বেলকা বয়ন বিদ্যালয়ে বয়ন করাইলে মজুরী	৩.০০
	৪.২৫
কিম্বা	
১। হাট হইতে ১ সের সরু সুতা কিনিলে—	৫.০০
২। বয়ন ব্যয়	৩.০০
	৮.০০
লাভ—	
ঐরূপ চাদরের মূল্য ন্যূনাধিক—	১২.০০

এত অল্প মূলধনে যে ব্যবসায় পরিচালনা করা যায়, তাহার প্রতিও আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না, ইহার অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? আর একটি উপায় বিনা পয়সা ও বিনা পরিশ্রমে এণ্ডিগুটী লাভ করা যায়। তাহা এই : যদি কেহ কেবল এরণ্ড পত্র কৃষক-বধূদের পোকার খাদ্যের জন্য দান করেন, তবে তিনি সে ফসলের অর্ধেক গুটী পাতার বিনিময়ে পাইবেন! দুঃখের বিষয়, কৃষক-রমণীদের পোকা-পোষণ করিতে উৎসাহ দিবার লোক পর্য্যন্ত নাই।

খোদার ফজলে এখন দেশে যে স্বদেশীয় সঞ্জীবনী বাতাস বহিয়াছে, এ শুভক্ষণে ভারতের নানাবিধ সুপ্ত শিল্পের জাগরণ অনিবার্য্য! ৫০/৬০ বৎসরের পরিত্যক্ত—মৃত চরকা পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছে; মৃতপ্রায় এণ্ডি শিল্পও নব জীন লাভ করিবে। এখন আমাদের পরিধেয় খদ্দর, এণ্ডি ও অন্যান্য রেশমী বস্ত্র না হইয়া উপায় নাই। এই স্বদেশীয় মাহেন্দ্রক্ষণে খোদার ফজলে রংপুর ও আসামের এণ্ডি জাগিবে; ভাগলপুর ও মুর্শিদাবাদের রেশমী শিল্প জাগিবে, জাগিবে নিশ্চয়!

এখন কথা এই যে, রংপুরের এণ্ডির পুনরুদ্ধার সাধন কে করিবে?

১. স্থানীয় জমিদারগণ? তাহা হইলে ত আর কথা-ই নাই। তাঁহারা উপাধান হইতে মস্তক কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়া সহানুভূতিসূচক ঈষৎ হাস্য করিলে—একটু উৎসাহ আজ্ঞা প্রচার করিলে এণ্ডি শিল্পের সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হইবে—মৃত এণ্ডি প্রাণলাভ করিবে। গ্রামে গ্রামে কৃষক-বধূ পরস্পরে বলাবলি করিবে—"আমাদের জমিদার সাহেব, রাজা মহাশয়, মহারাজা এণ্ডি কাপড় চাহিয়াছেন; ওরে, আমি আজকেই জমিদার সাহেব, রাজা মহাশয়, মহারাজা এণ্ডি কাপড় চাহিয়াছেন; ওরে, আমি আজকেই পোকা পোষা আরম্ভ করিব।" এ বলিবে, "আমি আগে", ও বলিবে, "আমি আগে!" কিন্তু না, জমিদার মহোদয়গণ সুখনিদ্রা, মোহনিদ্রা, আলস্য-নিদ্রা, আফিম-খাওয়া নিদ্রা, সর্পদৃষ্ট প্রাণঘাতিনী নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহা করিবেন না!

২. স্থানীয় সম্ভ্রান্ত বড়লোকেরা? তাহা হইলেও অধিক কাঁদিতে হইত না। তাঁহারা আরাম-কেদারা হইতে নবনীত দেহখানিকে ঈষৎ দোলাইয়া, চক্ষু হইতে রঙ্গীন চশমা জোড়া একটু সরাইয়া, গ্রামের দুই চারি জন মাতব্বর শ্রেণীর লোককে ডাকিয়া দুই চারিটা মিষ্ট বাক্য ব্যয় করিলে এণ্ডির শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে জীবনী-প্রবাহ বলিয়া যাইবে। কিন্তু না, তাঁহারা "ঝোঁপড়ি মঁ রহনা ও মহল কা খাব দেখ না।" বংশ-গৌরব মান-মর্যাদা গৌরব ইত্যাদির অনুরোধে প্রতিবেশী রাজা, মহারাজা, খাঁ বাহাদুরদের সহিত টেক্কা দিবার খেয়ালে ভুলিয়া তাহা করিবেন না।

৩. মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকেরা? তাহা হইলেও বেশ হইত। তাঁহারা গ্রামের কৃষকদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া, হাতে-কলমে উৎসাহ দিয়া, নিজেরা সখের জন্য পোকা প্রতিপালন করিলে একাধারে কিছু উপার্জ্জন এবং দেশের বস্ত্রক্লেশ মোচন—উভয়ই করিতে পারিবেন। কিন্তু না, তাঁহারা :

"চাকুরী, চাকুরী, চাকুরী!
চাকুরী মাথার মাণিক!
চাকুরী বিনে বঙ্গবাসীর
জীবন ধারণে ধিক্!
মশ্‌ক করে হাত পাকিয়ে
লিখে, 'এ, বি, সি, ডী';
চাকুরী হলো—ডাক-পিয়াদা,
গ্রামে প'লো টী টী!"

অথবা—

"চাকুরী মা! তোর চরণ দু'টি
নিত্য পূজা করি,
এই অফিসে চাকুরী যেন
বজায় রেখে মরি!"

এহেন চাকুরীর মায়া ত্যাগ করিয়া এণ্ডি শিল্প উদ্ধার করিবেন না।

(৪) তবে অপর কোন জেলার দেশ-হিতৈষী লোক? তাহারও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাঁহারা এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। তাহারা মনে করিবেন, বাবা!

নিজের ঘর-দ্বার ছাড়িয়া কেউ জঙ্গলা দেশে যাইবে? রংপুরের জলবায়ু ভাল নয়—প্লীহা ও ম্যালেরিয়ার লীলাভূমি।

তবে?—নীলকর, চা-কর প্রভৃতির ন্যায় কোন শ্বেতাঙ্গ কৃষক (Planter) রংপুরে গিয়া এণ্ডি গুটী আবাদ করিবেন। তখন সেই এণ্ডিকর সাহেবের এণ্ডি বাগানে ঐ রংপুরের দরিদ্র নরনারী কুলীরূপে খাটিবে। আর ভদ্রলোকেরা গুটি মাচার পরিদর্শক, বাজার সরকার কিম্বা অন্ততঃ কুলীর সরদার পদলাভ করিয়া ধন্য হইবেন! হইতে পারে শ্বেতাঙ্গ এণ্ডিকরেরা সুঁতা প্রস্তুত করিবার জন্য কোন সহজসাধ্য যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবেন। অতঃপর রংপুরের অধিবাসীগণ ত্রিগুণ, চতুর্গুণ মূল্যে "রংপুর রিফাইণ্ড সিল্ক" কলিকাতা হইতে ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিবেন।

প্রথমে "আসাম সিল্ক" নাম শুনিয়া আমাদের চমক লাগিয়াছিল; পরে যখন দেখিলাম, ত দেখিলাম, সেই নগণ্য এণ্ডি!

ফল কথা, অপর জেলার লোকে গুটী আবাদ করিতে গেলে, তাঁহাকে মূলধন স্বরূপ অন্ততঃ ২০০.০০ দুইশত টাকা সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে। আর স্থানীয় লোকে ঐ কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে তাঁহাকে মাত্র ১০.০০০ দশটি টাকা মূলধন স্বরূপ ব্যয় করিতে হইবে।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, বৈশাখ ১৩২৮

"কাটা মুণ্ড কথা কয়"

"বঙ্গলক্ষ্মী"র পাঠিকা ভগিনীগণ জানেন, ভারতের বিবিধ সম্প্রদায়ের নারীদের মধ্যে মুসলিম-ললনা কিরূপ পশ্চাৎপদ এবং মৃতপ্রায় নির্জ্জীব। এখন তাঁহারা এ-কথা শুনিয়া সুখী হইবেন যে, মুসলিম-নারীও সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সামাজিক কুপ্রথা আমাদের মাথা কাটিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় এখন সেই কাটামুণ্ড কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত সত্য ঘটনা পাঠিকা ভগিনীদের উপহার দিতেছি।

প্রায় দুইমাস হইতে সংবাদপত্রে প্রচার করা হইতেছিল যে, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চাশৎ বার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে সভা-সমিতির বিরাট আয়োজন হইতেছে। মুসলিম পর্দানশীল মহিলাদের জন্য মণ্ডপে বিশেষ পর্দার ব্যবস্থা থাকিবে। ২৬শে ডিসেম্বর "অল ইণ্ডিয়া মহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্সের" অধিবেশন হইবে, এবং ২৮শে তারিখে জুবিলী অধিবেশন হইবে। তদনুসারে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মুসলিম মহিলাগণ আলিগড়ে সমবেত হইয়াছিলেন।

২৬শে ডিসেম্বর বেলা ৯টার সময় যখন সমাগত মহিলাবৃন্দ তত্রত্য বালিকা কলেজের সেক্রেটারী শেখ আবদুল্লাহ সাহেবের পত্নীকে সভামণ্ডপে যাওয়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি বিষণ্নমুখে বলিলেন, "হ্যাঁ সব প্রস্তুত; কিন্তু দেখুন না, মহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্সের সেক্রেটারী প্রফেসার শিরওয়ানী কি গোলযোগ

করিতেছেন। তিনি স্ত্রীলোকদিগকে সভামণ্ডপে যাইয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে দিবেন না।" অতঃপর মিসেস আবদুল্লাহ সকলকে শিরওয়ানীর স্বহস্তলিখিত আদেশ-লিপি দেখাইলেন। তাহাতে লেখা ছিল, "এডুকেশন্যাল কন্‌ফারেন্সের সেক্রেটারীরূপে আমার হুকুম এই যে, মেয়েরা মণ্ডপে আসিতে পারিবেন না। তাঁহারা হুকুম অমান্য করিয়া যদি আসেন, তবে কোন অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য আমি দায়ী হইব না।"

মহিলাগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন যে, তাঁহারা স্ব স্ব দায়িত্বে বোরকায় (বিশেষ প্রকার অবগুণ্ঠনে) আবৃত হইয়া যাইবেন। পরে মিসেস আবদুল্লাহর সহায়তায় বালিকা কলেজের মোটরবাসে আমরা প্রায় ২৫ জন স্ত্রীলোক রওনা হইলাম। আমরা পুলিশ প্রহরীর রেগুলেশন লাঠির জন্য প্রস্তুত ছিলাম। বিনা দ্বিধায় সকলে মণ্ডপে গিয়া উঠিলাম। তথায় বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা আতিয়া বেগম সাহেবা উপস্থিত ছিলেন। তিনি সকলকে যথাস্থানে বসাইলেন। আমরা দেখিলাম, চিক এবং কাপড় ঘিরিয়া যে পর্দার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহা সব খুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। চিক ও কাপড়ের পর্দাগুলি পদদলিত ও ভুলুণ্ঠিত হইয়া প্রোফেসার শিরওয়ানীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের অক্ষয় ঘোষণা করিতেছিল।

মহিলাগণ আসন গ্রহণ করিলে আতিয়া বেগম সাহেবা ভলান্টিয়ার দ্বারা চিকগুলি বাঁধাইয়া দিলেন। কর্ত্তাগণ আতিয়া বেগমকে প্লাটফর্মে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে দিবেন না বলিয়া কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। আর আতিয়া বেগম রাগে কাঁপিতেছিলেন।

যথাসময়ে আতিয়া বেগম একটা চেয়ারে দাঁড়াইয়া দুই চিকের ফাঁক হইতে মুখ বাড়াইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন; তখন সমস্ত শ্রোতামণ্ডলী ফিরিয়া বসিলেন। অনেকে চেয়ার বেঞ্চ ইত্যাদি ডিঙ্গাইয়া চিকের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন প্রোফেসার শিরওয়ানী বেগতিক দেখিয়া রণে বঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। পরে আতিয়া বেগম প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া প্রায় ১০ মিনিট বক্তৃতা করিলেন।

২৮শে ডিসেম্বর জুবিলী অধিবেশন ছিল; সে দিন মহিলাগণ বিনা বাধায় মণ্ডপে গিয়াছিলেন। যথাবিধি চিক পর্দার ব্যবস্থা ছিল। সে দিন আতিয়া বেগম আমাদের নিকট না বসিয়া প্লাটফরমের পার্শ্বে বসিয়া মাঝে মাঝে ভদ্রলোকদের বক্তৃতায় টিট্‌কারী দিতেছিলেন। একবার তিনি বলিলেন, "যে ভদ্রলোক মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চাঁদা দিতে অস্বীকার করেন, তিনি চুড়ি পরিয়া অন্তঃপুরে বসুন।" চিকের অন্তরাল হইতে জনৈক মহিলা দুইগাছি চুড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

উপরোক্ত প্রকারে পর্দানশীন নির্জ্জীব মুসলিম মহিলাগণ রণাঙ্গন হইতে প্রোফেসার শিরওয়ানীকে বিতাড়িত করিয়া নিজেরা বিজয়গর্ব্বে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং দেখিলেন, ভগিনি! এখন কাটা মুণ্ড কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে! অতএব "বঙ্গলক্ষ্মী"র জয়।

বঙ্গলক্ষ্মী, মাঘ ১৩৩২

রাঙ্ ও সোনা

ভাদ্র মাসের "সওগাত" পত্রিকায় মোহাম্মদ আবদুল হাকীম বিক্রমপুরী সাহেবের লিখিত "বঙ্গ-সাহিত্যে মুসলমান মহিলা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে মোহিত ও বিস্মিত হইলাম। তিনি যে কতিপয় বঙ্গ-লেখিকাকে উদার সার্টিফিকেট দান করিয়াছেন, সেজন্য আমি "আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইসলাম কলিকাতা"র সেক্রেটারীরূপে নারীদিগের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কিন্তু বিক্রমপুরী সাহেবের অত্যধিক উদারতায় আমার ভারী আপত্তি আছে। তাহা এই যে, তিনি মাদৃশ নগণ্যাকে কয়েকজন উপাধিধারিণী বঙ্গ-বিখ্যাত লেখিকার তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে আমি নিজেকে অবমানিতা বোধ করিতেছি।

"নিখিল ভারত সাহিত্য-সঙ্ঘ" আমার নিকট "বিদ্যা-বিনোদিনী" ও "সাহিত্য-সরস্বতী" উপাধি চৌদ্দ টাকায় বিক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন। আমি তাহা গ্রহণ করি নাই। ফেরিওয়ালার নিকট জিনিস কিনিলে সস্তায় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আমার প্রয়োজন নাই।

আজি-কালি যখন বাজারে সামান্য নিকেলের "আনি" পর্য্যন্ত মেকী হইতেছে, এরূপ ক্ষেত্রে বিক্রমপুরী সাহেব সার্টিফিকেট দানের পূর্ব্বে মেকী "লেখিকা" ও আসল লেখিকাদের বিষয়, এমনকি, কোন লেখিকা মৃতা কি জীবিতা—তাহা একটু অনুসন্ধান করিয়া লইলে ভাল হইত না কি? তিনি একই নিক্তিতে রাঙ্ ও সোনা ওজন করিয়া ফেলিয়াছেন।

বিক্রমপুরী সাহেবের মতে "পরলোকগতা" আফজালুন্নেছা সাহেবাকে আমি অদ্য (১৯শে ভাদ্র, ১৩৩৩ সনে) এই মাত্র (১২টার সময়) দেখিয়া আসিলাম। অবশ্য তাঁহার সাক্ষাৎ লাভের জন্য আমাকে "পরলোকের" দ্বার পর্য্যন্ত যাইতে হয় নাই!! আফজালুন্নেছা সাহেবার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতা আছে; তাই তাঁহার "মৃত্যু" সংবাদে কাঁদিবার পূর্ব্বে তাঁহার সংবাদ লওয়া আবশ্যক বোধ করিয়াছিলাম। তিনি তখন সুস্থ শরীরে মধ্যাহ্নভোজন করিতেছিলেন।—বেহেশতের ফলমূল নয়—আমাদের এই মৃন্ময় পৃথিবীর ভাত খাইতেছিলেন।

আশাকরি, অতঃপর বিক্রমপুরী সাহেব অতিমাত্রায় সার্টিফিকেট বিতরণের নেশায় বেচারী বঙ্গ "লেখিকা"দিগকে আগে-ভাগে সশরীরে বেহেশ্‌তে পৌঁছাইয়া দিবেন না। আপাততঃ তাঁহাদের জন্য বেহেশ্‌তে সীট রিজার্ভ করিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে।

সওগাত, আশ্বিন ১৩৩৩

বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি

[সভানেত্রীর অভিভাষণ]

মাননীয় উপস্থিত ভগিনীবৃন্দ!

আপনার আমার ন্যায় তুচ্ছ নগণ্য ব্যক্তিকে এ সময়ের জন্য সভানেত্রী পদে বরণ করিয়া আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু আমি অবশ্যই বলিব যে, আপনাদের নির্বাচন ঠিক হয় নাই। কারণ আমি আজীবন কঠোর সামাজিক "পর্দার" অত্যাচারে লোহার সিন্দুকে বন্ধ আছি—ভালরূপে সমাজে মিশিতে পাই নাই—এমনকি সভানেত্রীকে হাসিতে হয়, না কাঁদিতে হয়, তাহাও আমি জানি না। সুতরাং আমার ভাষায় কথায় অনেক ভুল-ভ্রান্তি থাকিবে তজ্জন্য আপনারা প্রস্তুত থাকুন।

শ্রদ্ধাস্পদা ভগিনী মিসিস্ লিন্ডসে আমাকে মুসলমান বালিকাদের শিক্ষা সম্বন্ধীয় অভাব অভিযোগের কথা বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সমবেত সুশিক্ষিতা গ্রাজুয়েট মহিলাদের সম্মুখে এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি, এমন যোগ্যতা আমার নাই। তবে ২০/২১ বৎসর হইতে সাহিত্য ও সমাজসেবা করিয়া,—বিশেষত ১৬ বৎসর যাবৎ সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল পরিচালনা করিয়া যতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি, তাহাই আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহস করিতেছি।

স্ত্রীশিক্ষার কথা বলিতে গেলেই আমাদের সামাজিক অবস্থার আলোচনা অনিবার্য হইয়া পড়ে। আর সামাজিক অবস্থার কথা বলিতে গেলে, নারীর প্রতি মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের অবহেলা, ঔদাস্য এবং অনুদার ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষপাত অনিবার্য হয়। প্রবাদ আছে, "বলিতে আপন দুঃখ পরনিন্দা হয়।"

এখন প্রশ্ন এই যে, মুসলমান বালিকাদের সুশিক্ষার উপায় কি? উপায় ত আল্লাহর কৃপায় অনেকই আছে, কিন্তু অভাগিনীগণ তাহার ফলভোগ করিতে পায় কই? আপনারা হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন যে, আমি আজ ২২ বৎসর হইতে ভারতের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবের জন্য রোদন করিতেছি। ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব কাহারা, জানেন? সে জীব ভারত-নারী! এই জীবগুলির জন্য কখনও কাহারও প্রাণ কাঁদে নাই। মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্য জাতির দুঃখে বিচলিত হইয়াছেন; স্বয়ং থার্ড ক্লাস গাড়িতে ভ্রমণ করিয়া দরিদ্র রেল-পথিকদের কষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। পশুর জন্য চিন্তা করিবারও লোক আছে, তাই যত্রতত্র "পশুক্লেশ-নিবারণী সমিতি" দেখিতে পাই। পথে কুকুরটা মোটর চাপা পড়িলে তাহার জন্য এংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকাগুলিতে ক্রন্দনের রোল দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের ন্যায় অবরোধ-বন্দিনী নারীজাতির জন্য কাঁদিবার একটি লোকও এ ভূ-ভারতে নাই।

নারী ও পুরুষ বিরাট সমাজ—দেহের দুইটি বিভিন্ন অংশ। বহুকাল হইতে পুরুষ নারীকে প্রতারণা করিয়া আসিতেছে, আর নারী কেবল নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছে। পুরুষের পক্ষে নারায়ণী সেনা আছেন বলিয়া তাঁহারা এ যাবৎ নারীর উপর জয়লাভ করিয়া আসিতেছে। সুখের বিষয়, এত কাল পরে "শ্রীকৃষ্ণ" স্বয়ং আমার হিন্দু

ভগিনীদের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিয়াছেন। তাই চারিদিকে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অবরোধ-বন্দিনী মহিলাদের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহারা, বিশেষতঃ মাদ্রাজের মহিলাবৃন্দ সর্ব-বিষয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। এবার মাদ্রাজের লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের ডেপুটি প্রেসিডেন্টের পদে একজন মহিলা নির্বাচিত হইয়াছেন। সম্প্রতি রেঙ্গুনে একজন ব্যারিস্টার হইয়াছেন। লেডী ব্যারিস্টার মিস ঘোরাবজীর নামও সুপরিচিত; কিন্তু মুসলিম নারীর কথা কি বলিব?—তাহারা যে তিমিরে সে তিমিরে আছে।

"মাতা যদি বিষ দেন আপন সন্তানে
বিক্রয়েন পিতা যদি অর্থ প্রতিদানে"—

তাহাকে আর কে রক্ষা করিবে? আলীগড়ের প্রসিদ্ধ উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি শেখ মহম্মদ আবদুল্লাহ সাহেব এক সময় তাঁহার কোন বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "এ দেশে বালক ও বালিকার শিক্ষায় পার্থক্য রাখার ফলে আমাদের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে আমাদের দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদে! বালিকাদের শিক্ষা না দেওয়া আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে, বরং ইহা আমাদের দুরপনেয় কলঙ্ক ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ ২০ বৎসর পূর্বে আমি হেন নগণ্য যাহা ১ম খণ্ড "মতিচূরে" বলিয়াছি, সেই কথা এখন শেখ সাহেবের ন্যায় জ্ঞানবৃদ্ধ লোকের মুখেও শুনিতেছি। যাঁহারা ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, মূর্খতার অন্ধকার যুগে আরবগণ কন্যা বধ করিত। যদিও ইসলাম ধর্ম কন্যাদের শারীরিক হত্যা নিবারণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলিমগণ অম্লান বদনে কন্যাদের মন, মস্তিষ্ক এবং বুদ্ধিবৃত্তি অদ্যাপি অবাধে বধ করিতেছেন। কন্যাকে মূর্খ রাখা এবং চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখিয়া জ্ঞান ও বিবেক হইতে বঞ্চিত রাখা অনেকে কৌলিন্যের লক্ষণ মনে করেন। কিছুকাল পর্যন্ত মিশর এবং তুরস্ক স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ঠকিয়া ঠকিয়া নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া এখন সুপথে আসিয়াছেন।

সম্প্রতি তুরস্ক এবং মিসর, ইউরোপ ও আমেরিকার ন্যায় পুত্র ও কন্যাকে সমভাবে শিক্ষা দিবার জন্য বাধ্যতামূলক আইন করিয়াছেন। কিন্তু তুরস্ক আমেরিকার পদাঙ্ক অনুসরণে সোজা পথ অবলম্বন করে নাই, বরং আমাদের ধর্ম-শাস্ত্রের একটি অলঙ্ঘনীয় আদেশ পালন করিয়াছেন। যেহেতু পৃথিবীতে যিনি সর্বপ্রথমে পুরুষ স্ত্রীলোককে সমভাবে সুশিক্ষা দান করা কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তিনি আমাদের রসুল মকবুল (অর্থাৎ পয়গম্বর সাহেব)। তিনি আদেশ করিয়াছেন যে, শিক্ষা লাভ করা সমস্ত নরনারীর অবশ্য কর্তব্য। তের শত বৎসর পূর্বেই আমাদের জন্য এই শিক্ষাদানের বাধ্যতামূলক আইন পাশ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের সমাজ তাহা পালন করে নাই, পরন্তু ঐ আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে এবং তদ্রুপ বিরুদ্ধাচরণকেই বংশ-গৌরব মনে করিতেছে। এখনও আমার সম্মুখে আমাদের স্কুলের কয়েকটি ছাত্রীর অভিভাবকের পত্র মজুত আছে—যাহাতে তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, তাহাদের মেয়েদের যেন সামান্য উর্দু ও কোরান শরীফ পাঠ ছাড়া আর কিছু—বিশেষত ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া না হয়। এই ত আমাদের সামাজিক অবস্থা।

যে পর্যন্ত পুরুষগণ শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য অধিকার দিতে স্বীকৃত না হয়, সে পর্যন্ত তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষাও দিবে না। যাহারা নিজের সমাজকে উদ্ধার করিতে পারিতেছে না, তাহারা আর দেশোদ্ধার কিরূপে করিবে? অর্দ্ধাঙ্গীকে বন্দিনী রাখিয়া নিজে স্বাধীনতা চাহে, এরূপ আকাঙ্ক্ষা পাগলের শোভা পায়! সদাশয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যেমন ভারতবাসীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা চাহে, এরূপ আকাঙ্ক্ষা পাগলেরই শোভা পায়! সদাশয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যেমন ভারতবাসীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা সহ্য করিতে চাহেন না—আমার মনে পড়ে প্রায় ২১ বৎসর পূর্বে মিস্টার মর্লি বলিয়াছিলেন, "যদি তাঁহারা চাঁদের জন্য আবদার করে (If they cry for the Moon), তাহা আমরা দিতে পারি না" ইত্যাদি এবং আমাদের অমুসলমান প্রতিবেশীগণ এখন সাধারণত যেরূপ মুসলমানদের দাবি দাওয়া সহ্য করিতে পারেন না, সেইরূপ মুসলমান পুরুষগণও নারীজাতির কোন প্রকার উন্নতির অভিলাষ স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু আল্লাহ কুদরত বা প্রকৃতির নিয়ম অতি চমৎকার! তিনি এ বিশ্ব জগৎকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন—আমরা পরস্পরের সহিত এরূপভাবে জড়িত আছি যে, একে অপরকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারি না। মুসলিম ভ্রাতৃগণ যতদিন আমাদের দুঃখ-সুখের প্রতি মনোযোগ না করিবেন, ততদিন তাঁহাদের কথাও ভারতের অপর ২২ কোটি লোকে শুনিবে না, আর যত দিন ঐ ২২ কোটি লোকে ৮ কোটি মুসলমানকে উপেক্ষা করিবে ততদিন পর্যন্ত তাঁহাদের রোদনও ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে না!! বহুদিন হইল একটি বটতলার পুঁথিতে পড়িয়াছিলাম:

"আপনি যেমন মার খাইতে পারিবে,
বুঝিয়া তেয়ছাই মার আমাকে মারিবে।"

হযরত ঈসা (আ) বলিয়াছেন, "তুমি নিজে অপরের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, অপরের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিও।" এস্থলে আমি শেখ সাহেবের আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না, তাহা এই :

"ভারতবর্ষের অবরোধ-প্রথা স্ত্রীলোকদের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। অবরোধ-প্রথা আমাদের সমাজের সর্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত। ভ্রাতৃগণ! পর্দা র নাম শুনিবা মাত্র আপনারা হয়ত এক যোগে বলিয়া উঠিবেন, 'তবে কি আমরা ইংরাজদের অনুকরণে বিবিদের রাজপথে বেড়াইতে দিব?' তদুত্তরে বলি, আমি মুসলমান শাস্ত্রের সীমার মধ্যে থাকিয়া আপনাদের সহিত কথা বলিতে চাই। ভারতীয় পর্দা র সহিত শাস্ত্রীয় পর্দার কোন সম্বন্ধ নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।"

পর্দা সম্বন্ধে আমি নিজের কোন মত প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহি—কেবল এইটুকু বলি যে, শেখ সাহেব পর্দা কে "সর্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত" বলিয়াছেন, আমি তাহা মনে করি না। "যন্ত্রণাদায়ক" হইলে অবলাগণ "বাবারে! মারে! মলুম রে! গেলুম রে!" বলিয়া আর্তনাদে গগন বিদীর্ণ করিতেন। অবরোধ প্রথাকে প্রাণঘাতক কার্বনিক এসিড গ্যাসের সহিত তুলনা করা যায়। যেহেতু তাহাতে বিনা যন্ত্রণায় মৃত্যু হয় বলিয়া লোকে কার্বনিক গ্যাসের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিবার অবসর পায় না! অন্তঃপুরবাসিনী নারী এই অবরোধ গ্যাসে বিনা ক্লেশে তিল তিল করিয়া নীরবে মরিতেছে।

মুসলমান বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কোরান শিক্ষাদান করা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। কোরান শিক্ষা অর্থে শুধু টিয়া পাখির মত আরবি শব্দ আবৃত্তি করা আমার উদ্দেশ্য নহে। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় কোরানের অনুবাদ শিক্ষা দিতে হইবে। সম্ভবত এজন্য গভর্নমেন্ট বাধ্যতামূলক আইন পাস না করিলে আমাদের সমাজ মেয়েদের কোরান শিক্ষাও দিবে না! যদি কেহ ডাক্তার ডাকিয়া ব্যবস্থা-পত্র (Prescription) লয়, কিন্তু তাহাতে লিখিত ঔষধ-পথ্য ব্যবহার না করিয়া সে ব্যবস্থা-পত্রখানাকে মাদুলী রূপে গলায় পরিয়া থাকে, আর দৈনিক তিনবার করিয়া পাঠ করে, তাহাতে কি সে উপকার পাইবে? আমরা পবিত্র কোরান শরীফের লিখিত ব্যবস্থা অনুযায়ী কোন কার্য করি না, শুধু তাহা পাখির মত পাঠ করি আর কাপড়ের থলিতে (জুযদানে) পুরিয়া অতি যত্নে উচ্চ স্থানে রাখি। কিছুদিন হইল, মিশর হইতে আগতা বিদুষী মহিলা মিস যাকিয়া সুলেমান এলাহাবাদে এক বিরাট মুসলিম সভায় বক্তৃতাদানকালে বলিয়াছিলেন, "উপস্থিত যে যে ভদ্রলোক কোরানের অর্থ বুঝেন, তাঁহাদের হাত তুলুন।" তাহাতে মাত্র তিনজন ভদ্রলোক হাত তুলিয়াছিলেন। কোরান জ্ঞানে যখন পুরুষদের এইরূপ দৈন্য, তখন আমাদের দৈন্য যে কত ভীষণ, তাহা না বলাই ভাল। সুতরাং কোরানের বিধিব্যবস্থা কিছুই আমরা অবগত নহি। স্থানীয় ভাষা বলিতে অন্য স্থানের ভাষা যাহাই হউক, কলিকাতার ভাষা কি হইবে? ষোল বৎসর যাবৎ এই সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল পরিচালনার ফলে আমি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, এখানকার মুসলমানেরা মাতৃহীন—অর্থাৎ তাহাদের মাতৃভাষা নাই। তাহারা উর্দুকে মাতৃভাষা বলিয়া দাবি করে বটে, কিন্তু এমন বিকৃত উর্দু বলে যে, তাহা শুনিলে শ্রবণবিবর ক্ষত-বিক্ষত হয়! যাহা হউক,তথাপি উর্দু এবং বাঙ্গালা উভয় অনুবাদই শিক্ষা দিতে হইবে। আমার অমুসলমান ভগিনীগণ! আপনারা কেহ মনে করিবেন না যে, প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কোরান শিক্ষা দিতে বলিয়া আমি গোঁড়ামীর পরিচয় দিলাম। তাহা নহে, আমি গোঁড়ামী হইতে বহুদূরে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সমস্ত ব্যবস্থাই কোরানে পাওয়া যায়। আমাদের ধর্ম ও সমাজ অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য কোরান শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।

মুসলমানদের যাবতীয় দৈন্য-দুর্দশার একমাত্র কারণ স্ত্রীশিক্ষায় ঔদাস্য। ভ্রাতৃগন মনে করেন, তাঁহারা গোটাকতক আলীগড় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর করিয়াই পুলসিরাত (পারলৌকিক সেতু বিশেষ) পার হইবেন—আর পার হইবার সময় স্ত্রী ও কন্যাকে হ্যান্ড ব্যাগে পুরিয়া লইয়া যাইবেন।

কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতার বিধান যে অন্যরূপ—যে বিধি অনুসারে প্রত্যেককেই স্ব-স্ব কর্মফল ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং স্ত্রীলোকদের উচিত যে, তাঁহারা বাক্স-বন্দী হইয়া মালগাড়িতে বসিয়া সশরীরে স্বর্গলাভের আশায় না থাকিয়া স্বীয় কন্যাদের সুশিক্ষায় মনোযোগী হন। কন্যার বিবাহের সময় যে টাকা অলঙ্কার ও যৌতুক ক্রয়ে ব্যয় করেন, তাহারই কিয়দংশ তাহাদের সুশিক্ষায় ও স্বাস্থ্য রক্ষায় ব্যয় করুন। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য শারীরিক ব্যায়াম চর্চা করা প্রয়োজন; আর প্রয়োজন বিশুদ্ধ বাতাসের। আল্লাহর দান বিশুদ্ধ বাতাস বিনা পয়সায় গ্রহণ করিতে মহিলাগণ কেন অনিচ্ছুক, আমি

তাহা বুঝিতে পারি না। শীতকালে তাঁহারা এরূপভাবে জানালা-দ্বার, বিশেষত সার্সী বন্ধ করিয়া রাখেন যে, আমার মনে হয় গভর্নমেন্ট কেন আইন করিয়া দ্বার-জানালার সার্সী ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করেন না! পাঁচ-ছয় বৎসর হইল, ডাক্তার মিস কোহেন বালিকা বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমাদের স্কুলের কতিপয় বালিকার স্বাস্থ্যের রিপোর্ট যখন তাহাদের মাতার নিকট এই অনুরোধ-সহ গেল যে, "আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক শীঘ্র ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করুন", তাহাতে তাঁহারা চটিয়া এই উত্তর দিলেন,—"স্কুলমেঁ লাড়কী পড়নে কো দিয়া হায়, না বিচার করনে, কো, কে, আঁখ কমজোর, দাঁত কম-জোর, হলক মে ঘাও হায়, ফেঁফ্‌ড়া খাবার হ্যায়! ইয়ে সব বোলনে সে হামারী লাড়কী কা শাদি ক্যায়সে হোগা? ইয়ে সব বাৎ রহনে দেঁ, হামারী লাড়কী কো ডাক্তারনীসে না দেখায়েঁ!" ইয়া আল্লাহ! মেয়ের প্রাণ লইয়া টানাটানি, অথচ শাদির চিন্তায় মায়ের চোখে ঘুম ধরে নাই। ফল কথা, অশিক্ষিতা মাতার নিকট ইহাপেক্ষা আর কি আশা করা যাইতে পারে?

আমাদের স্কুলের ছাত্রীগণ পরীক্ষার সময় প্রায়শ ভূগোল, ইতিহাস এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিষয়ে অকৃতকার্য (ফেল) হয় ইহার কারণ এই যে, তাহারা নিজেদের বাসভবন এবং স্কুল-গৃহ ব্যতীত দুনিয়ার আর কিছুই দেখিতে পায় না, এই দুনিয়ায় তাহাদের পিতা ও ভ্রাতা ছাড়া আরও কেহ আছে কিনা তাহা তাহারা জানে না; রুদ্ধ বায়ুপূর্ণ কক্ষে আবদ্ধ থাকিয়া মা-মাসীকে অনবরত রোগ-ভোগ ও স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে দেখে। তাহারা কেবল জানে, অসুখ হইলে ডাক্তার ডাকিতে হয়। এই সকল কু-রোগের একমাত্র ঔষধ সুশিক্ষা।

উপসংহারে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল এবং আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইস্‌লামের উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কলিকাতার মুসলিম সমাজের উন্নতির নিমিত্ত এই উভয় প্রতিষ্ঠানই প্রাণপণে যত্ন করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহারা এখনও পূর্ণ মাত্রায় সফলতা লাভ করে নাই। স্কুলটিকে হাই স্কুলে উন্নীত করা এবং ইহার জন্য একটা নিজের বাড়ি হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন এবং আঞ্জুমানটি মহিলা সমাজে সর্বজনপ্রিয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আজ আপনাদের অনেকখানি সময় নষ্ট করিলাম, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এখন আমি ইতি করি।

'সওগাত', চৈত্র ১৩৩৩ প্রকাশিত এবং বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশনে পঠিত।

লুকানো রতন

সাগরের সুগভীর আঁধার গহ্বরে
উজ্জ্বল রতন কত রয়েছে লুকা'য়ে;
ফুটিয়া কুসুম কত বিজন প্রান্তরে
শুকায় সৌরভ তার বায়ুতে মিশা'য়ে।

অভাগিনী বঙ্গদেশের নিভৃত অন্তঃপুর-উদ্যানে কত ফুল নীরবে ফুটিয়া লোক-চক্ষুর অন্তরালে ঝরিয়া পড়ে, কে তাহার হিসাব রাখে? অন্তঃপুরের সুরক্ষিত লৌহ সিন্দুকেও না জানি কত উজ্জ্বল রত্ন লুক্কায়িত আছে, তাহার সন্ধানও অনেকেই জানে না। অদ্য আমরা মাত্র একটি রত্নের উল্লেখ করিয়া দেখাইতে চাই যে, আমাদের মুসলিম সমাজ নিতান্ত দীন নহে—তাহাতে এমন অমূল্য রত্নরাজিও আছে।

করিমুন্নেসা খানম সাহেবা

গত ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে এপ্রিল মাসে রঙ্গপুরের অন্তর্গত পায়রাবন্দ গ্রামের কোন উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত অন্তঃপুরে অর্থাৎ তত্রত্য প্রসিদ্ধ জমিদার মরহুম মৌলভী জহীর মোহাম্মদ আবু আলী সাবের সাহেবের গৃহে ঐরূপ একটি রত্ন (করিমুন্নেসা খানম) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে তাঁহাকে টীয়া পাখির মত কোরান শরীফ ব্যতীত আর কিছু পড়িতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তাহাতে তাঁহার আত্মার তৃপ্তি হইত না। তাঁহার ছোট ভাইয়েরা বাহিরে মুন্সী সাহেবের নিকট ফার্সী পড়িয়া আসিতেন—ভগিনীকে শুনাইয়া আবৃত্তি করিতেন,—

"কে বে-ইলমে না-তওয়াঁ খোদারা শেনাখ্‌ত"

তখন বালিকা করিমুন্নেসাও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বয়েতগুলি মুখস্থ করিতেন। ভাইদের বাঙ্গলা পড়া শুনিয়াও তিনি মুখে মুখে আবৃত্তি করিতেন,—'ক'য়ে আকার দিলে 'কা', ইকার দিলে 'কি', দীর্ঘ ঈকার দিলে 'কী' কৃ খৃ গৃ ঘৃ নৃ—ইত্যাদি। আর তিনি প্রাঙ্গণে মাটিতে আঁক কাটিয়া বাঙ্গালা লিখিতে শিখিয়াছিলেন।

একদিন করিমুন্নেসা গোপনে একটা বটতলার পুঁথি লইয়া অস্ফুটস্বরে পড়িতেছিলেন,—

"কোরানেতে আল্লাতালা কয়েছে এমতি,
ফাদ খুলী ফী ইবাদী ওয়াদ খুলী জান্নাতী"

সেই সময় হঠাৎ তাঁহার পিতা আসিয়া পড়েন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত ভয় পাইয়া ভাবিলেন যে, "আজ আমার সর্ব্বনাশ,—বুঝি এখনই আমাকে যমালয়ে যাইতে হইবে!" কিন্তু না, শোকর আল্‌হামদোলিল্লাহ্‌! পিতা কন্যার হাতে পুঁথি দেখিয়া রাগ করিলেন না,—বরং ভয়ে মূর্চ্ছিতা-প্রায় বালিকাকে কোলে লইয়া আদর করিলেন এবং সেই দিন হইতেই একটু একটু "সাধুভাষা"র বাঙ্গালা পড়াইতে লাগিলেন। বাস্‌! আর যায় কোথা? যত মোল্লা মুরুব্বি দল একযোগে চটিয়া উঠিলেন—"হেঁ—মেয়েকে বাঙ্গলা

পড়ান হইতেছে!" তাঁহাদের নিন্দা ও বাক্য-জ্বালায় অধীর হইয়া পিতা তাঁহার পড়া বন্ধ করিয়া দিলেন।

শুধু পড়াই বন্ধ হইল না,—এখন করিমুন্নেসাকে অন্ধকার কারাগৃহে (অর্থাৎ বলিয়াদীতে মাতামহের প্রাসাদে) পাঠাইয়া দিয়া বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। তাঁহার বয়স ১৪ বৎসর অতিক্রান্ত হইতে না হইতে বিবাহ হইয়া গেল। শাশেই বর;—শ্বশুরালয় দেলদুয়ারে আসিয়া তিনি কয়েকজন দেবর-সম্পর্কীয় ছাত্রের সাহায্যে যথাবিধি বাঙ্গলা ভাষা শিখিয়া ফেলিলেন। লেখাপড়া শিক্ষার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। সেজন্য তিনি সমাজের অনেক লাঞ্ছনা সহিয়াছেন। কেবল নিজের লেখাপড়া শিক্ষার জন্যই লাঞ্ছনার শেষ হয় নাই। বিবাহের ৯ বৎসর পরেই তিনি বিধবা হইয়াছিলেন। বৈধব্যের পর তাঁহার শিশু পুত্রদ্বয়ের সুশিক্ষার জন্যও তাঁহাকে পদে পদে বিড়ম্বনা ও উপদ্রব সহিতে হইয়াছে।

দেলদুয়ারে ছেলেদের উচ্চশিক্ষা লাভ অসম্ভব দেখিয়া করিমুন্নেসা খানম কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বড় ছেলেকে (হাজী এ. কে. গজনবী সাহেবকে) সেন্টজেভিয়ার কলেজে ভর্ত্তি করিলেন। এত বড় পাপ কার্য্যের জন্য সমাজ তাঁহার প্রতি কি কি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিল, কত অকথ্য ভাষায় গালি দিয়াছিল, কত নিন্দা-কুৎসা করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত—পাঠিকা ভগিনী তাহা অনুমান করিয়া লইবেন।

করিমুন্নেসা খানম স্বভাব-কবি ছিলেন। পারিবারিক ঘটনা এবং সামাজিক বিষয়ে অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। কিন্তু সে কবিতাগুলি দিনের আলোক দেখিতে পায় নাই। আজি-কালি দেখি, লোকে ভালমতে বর্ণজ্ঞানের সহিত ভালমতে পরিচিত না হইয়াও ভাড়া-করা লেখকের দ্বারা প্রবন্ধ ও পুস্তক লেখাইয়া নিজের নামে প্রকাশ করে। কিন্তু করিমুন্নেসা সাহেবা নিজের রচনা কখনও স্বনামে সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন নাই। কালে-ভদ্রে কোন রচনা বা পুস্তক বে-নামীতে ছাপা হইত। অধিকাংশ রচনাই, বিশেষতঃ কবিতার বাঁধানো খাতাগুলি তাঁহার বাক্সের মধ্যেই লুক্কায়িত থাকিত। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কয়েকটি কবিতা আমি জোর করিয়া কোন হিন্দু সংবাদপত্রে দিয়াছিলাম—তাহাতে নাম প্রকাশ হয় নাই। আমি অনেক পীড়াপীড়ি করায় কবিতার নিম্নে "সাবের বংশের জনৈকা কন্যা" নাম দেওয়া হইয়াছিল। সে পত্রিকার সম্পাদক আমাকে লিখিয়াছিলেন, "সাবের বংশের কন্যার কবিতাগুলি বড় চমৎকার; আমাদের বেশ লাগিয়াছে। দয়া করিয়া আরও পাঠাইবেন।"

তিনি ইংরেজি ভাষা শিখিবার জন্য সাধনাও কম করেন নাই। তিনি যাহা শিখিয়াছিলেন, তাহা আধুনিক কোন ম্যাট্রিক পাশ করা লোকের তুলনায় উৎকৃষ্ট বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ স্থলে ১৬ বৎসর পূর্ব্বের একটি ঘটনা মনে পড়িল। একদিন তিনি ও আমি প্ল্যানচেটে হাত রাখিয়া নানা লোকের আত্মার দ্বারা লিখাইতেছিলাম। আমার খেলাইয়ের আত্মা ইংরাজীতে নাম লিখিল দেখিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "খেলাই মৃত্যুর পর ইংরেজি শিখিয়াছে দেখিয়া আমার মরিতে ইচ্ছা করে—তাহা হইলে অনায়াসে ইংরেজি শিখিতে পারিব।"

তিনি ৬৭ বৎসর বয়সে রীতিমত আরবী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমাকে লিখিয়াছিলেন, "মন্ত্রপাঠের মত কোরানের বুলি আবৃত্তি করিয়া তৃপ্তি হয় না, তাই আমি যথাবিধি আরবী পড়িতেছি।" তিনি পারস্য ভাষাও জানিতেন।

সমাজ তাঁহাকে গলা-টেপা করিয়া না রাখিলে করিমুন্নেসা সাহেবা দেশের একটি উজ্জ্বল রত্ন হইতে পারিতেন। ইলেকট্রিকবাতিকে স্তরের পর স্তর—অনেক কাপড়ের আবরণে ঢাকিলে যেরূপ অন্ধকার দেখায়, আমার বর্ণিতা মহিলাটিও সেইরূপ কাপড়-চাপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি জ্ঞানলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রজ্বলিত শিখা অন্তরে ঢাকিয়া রাখিয়া নরিবে দগ্ধ হইয়াছেন। তিনি নিজের শিক্ষালাভের জন্য কষ্ট সহিয়াছেন; পুত্রদ্বয়কে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্যে লাঞ্ছনা সহিয়াছেন—শেষে আমাকে দু'হরফ বাঙ্গলা পড়াইবার জন্যও নিন্দা ও ভ্রূকুটি সহিয়াছেন। ধন্য সমাজ! তবু তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। আমাকে সাহিত্য-চর্চ্চায় তিনিই উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। বলিতে কি, তিনি উৎসাহ না দিলে এবং আমার শ্রদ্ধেয় স্বামী অনুকূল না হইলে আমি কখনই প্রকাশ্য সংবাদপত্রে লিখিতে সাহসী হইতাম না। করিমুন্নেসা সাহেবা লক্ষাধিক সংখ্যক বাংলা পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন। অনেক পারস্য-গজল তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।

গত ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে ৬ই সেপ্টেম্বর এই রত্নটি ৭১ বৎসর ৫ মাস বয়সে হৃদযন্ত্র অচল হওয়ায় (হার্ট ফেল করিয়া) চির-লুক্কায়িত হইয়াছেন। তাঁহার দেহত্যাগকে "অকাল-মৃত্যু" বলা যায় না বটে; তবু কিন্তু আমার মনে হয়, তিনি আরও দশ বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া আমাদিগকে সাহিত্য-চর্চ্চায় উৎসাহ দিলে ভাল হইত। এখন আর আমার কিছুই ভাল লাগে না; মনে হয়—আর কে পড়িবে?

সওগাত, ১৩৩৪

রানী ভিখারিনী

আমেরিকাবাসিনী মিস্ মেয়ো "ভারত মাতা" নামক পুস্তকে হিন্দু নারীদের দুঃখ-দৈন্য সম্বন্ধে অতি চমৎকার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই নির্ম্মম সত্য কথা বলার জন্য হিন্দুগণ মিস্ মেয়োকে যত ইচ্ছা গালাগালি করুন; কিন্তু গালির চোটে কাকের কালো রঙ বকেরমত সাদা হইবে না, পরিত্যক্ত জাজক শিশু পুনর্জ্জীবন লাভ করিবে না, দ্বাদশ বর্ষীয়া প্রসূতিদের বিবিধ রোগ বিরাময় হইবে না; হাসপাতালে রোগিনীদের সংখ্যাও হ্রাস হইবে না। এ দেশীয় কর্ত্তারা বলেন, "ভারত মাতা" পুস্তকে ভারতের কেবল নিকৃষ্ট অংশ দেখানো হইয়াছে, উৎকৃষ্ট অংশের উল্লেখ করা হয় নাই; কিন্তু কথা এই যে, যাহা ভাল, তাহা ত ভালই; তাহার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই। যাহা মন্দ তাহাই সংশোধন করা আবশ্যক।

ডাক্তারের দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইলে, তিনি রোগীর রোগসমূহেরই উল্লেখ করেন এবং রোগ দূর করিবারই ব্যবস্থা দেন। আপনারা চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমার ব্যবস্থা দিবার সময় ডাক্তার আপনার পরিপাক শক্তির প্রশংসা-পত্র লিখিতে বসেন না। তারপর ভারতবর্ষের উৎকৃষ্ট অংশের প্রশংসাগীতি গাহিবার জন্য ভারতের গড়পড়তা ১৬ কোটি

পুরুষ ত আছেই। সে-জায়ঢাকে কাটি ঠুকিবার জন্য মিস মেয়োর দরকার কি? মিস্ মেয়োর প্রয়োজন সেই কহিতে—যাহা এ যাবৎ আর কেহ বলে নাই,—যাহা এ যাবৎ আর কেহ বলিতে সাহস পায় নাই। সেই কথা আমিও আজ কুড়ি বৎসর হইতে বলিয়া আসিতেছি, কিন্তু আমার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কাহারও শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করে নাই—আজ মিস্ মেয়োর গর্জ্জনে সকলের টনক নড়িয়াছে।

"ভারত মাতা"—লেখিকার সহিত ভারত-পিতাগণ "চুলোচুলি" করিতেছেন, এই সুযোগে, মুসলিম-সমাজ! আপনার ঐ দর্পণে নিজের মুখ দেখিয়া লউন। দেখুন ত আপনারা নিজ সমাজের রাণীকে কিরূপ ভিখারিনী সাজাইয়াছেন। এই বিশাল জগতে কোন দেশ, কোন জাতি, কোন ধর্ম্ম নারীকে কিছুমাত্র অধিকার দান করা দূরে থাকুক, নারীর আত্মাকেও স্বীকার করে নাই। একমাত্র ইসলাম ধর্ম্মই নারীকে তাহার প্রাপ্য অধিকার দান করিয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষে সেই মুসলিম—নারীর দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে।

কোন জাতি কন্যাকেও সম্পত্তির ভাগ দেয় নাই, ইসলাম কন্যাকে পৈত্রিক সম্পত্তিতে ভ্রাতার অর্ধেক অংশভাগিনী করিয়াছে। অন্যান্য জাতির স্ত্রীর সম্পত্তি রাখিবার অধিকার নাই। স্ত্রী যদি কিছু টাকা-কড়ি পিত্রালয় হইতে আনে, তাহা স্বামীর কবলে পড়ে—স্ত্রী ভোগ করিতে পায় না। মুসলিম স্ত্রী নিজের সম্পত্তি স্বচ্ছন্দে ভোগ করিবার অধিকারিণী। কেবল তাহাই নহে, সে বিবাহের সময় স্বামীর অবস্থা-অনুসারে "দেন-মোহর" বাবদ নগদ টাকা বা বিষয়ের অধিকারিণী হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র-কন্যা প্রভৃতি অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের অংশ-বিভাগের পূর্ব্বে স্ত্রী "মোহর" (স্ত্রীধন) এবং তাহার প্রাপ্য অষ্টমাংশ আদায় করিবার ব্যবস্থা আছে। অতঃপর সম্পত্তির যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই অপর সকলে পায়।

হিন্দু স্ত্রীকে মৃত স্বামীর সহিত পোড়াইয়া মারিবার ব্যবস্থা আছে। বিধবাগণ এখন সহমৃতা না হইলেও জীবন্মৃতা হইয়া থাকে। তাহাদের গাড়ী বোঝাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা এই যে, "বিধবা শুধু দ্বিতীয়বার বিবাহ হইতে বিরত থাকিলেই চলিবে না। নারীর উচিত যে, স্বামীর মৃত্যুর পর সর্বপ্রকার সুখাদ্য ত্যাগ করিয়া মাত্র ফল-মূল খাইয়া কোনরূপে বাঁচিয়া থাকে।" কিন্তু ইসলাম নারীকে পুনর্বিবাহের অনুমতি দিয়াছে, বিধবার প্রতি কোন অত্যাচার নাই; তাহার বসন, ভূষণ, আহার সম্বন্ধে কোন বাঁধা নিয়ম নাই।

হিন্দুগণ শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীলোকের প্রতি গৃহপালিত পশু কিম্বা দাসীর ন্যায় ব্যবহার করিতে বাধ্য। অষ্টম বর্ষে কন্যা বিবাহ দিলে তাঁহারা গৌরীদানের ফল প্রাপ্ত হন। ইসলাম ধর্ম্মে স্ত্রীলোককে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করা গিয়াছে। "মাতার পদতলে স্বর্গ" বলা হইয়াছে। স্বেচ্ছাকৃত সম্মতি ব্যতীত কোন নারীর বিবাহ হইতে পারে না, ইহাতে পরোক্ষভাবে বাল্যবিবাহ রহিত করা হইয়াছে।

হিন্দু শাস্ত্র বলে, "স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়।" আর আমাদের রসুলুল্লাহ বলিয়াছেন, "তালাবুল 'ইল্‌মি ফরীজাতুন, 'আলা কুল্লি, মুসলিমীন ওয়া মুসলিমাতিন" (অর্থাৎ সমভাবে শিক্ষালাভ করা সমস্ত মুসলিম, নর ও নারীর অবশ্য কর্ত্তব্য)।

কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা কি দেখিতে পাই? হিন্দুগণ কন্যাকে অংশ দিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার "উইল" করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন।

উইল দ্বারা স্ত্রী কিম্বা কন্যাকে যথাসর্ব্বস্ব দান করিতে পারেন। আর মুসলমানেরা কন্যার দ্বারা সম্পত্তিতে লা-দাবী লিখাইয়া লইয়া কন্যাকে বিষয়ের অংশ হইতে বঞ্চিত করেন। নানাবিধ জঘন্য উপায়ে নারীকে পিতা ও স্বামীর সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হয়।

হিন্দুগণ প্রাণপণে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন। আর আমাদের তথাকথিত আশরাফগণ সপ্তম বর্ষীয়া বিধবা কন্যাকে চির-বিধবা রাখিয়া গৌরব বোধ করেন।

হিন্দুগণ বাল্যবিবাহ রহিত করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিতেছেন। কন্যার বিবাহের বয়স ১৬ বৎসর বলিয়া ধার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন (যদিও সেজন্য পণ্ডিতগণ উচ্চৈস্বরে তাঁহাদিগকে "অ-হিন্দু" বলিতেছেন।) আর আমাদের সমাজে দেখিতে পাই, টেলিগ্রাফযোগে কোন দূর দেশে অবস্থিত বরের সহিত অপ্রাপ্তবয়স্ক, ৯ বৎসরের বালিকার বিবাহ হইতেছে। অনেক সময় প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা, ৬০ বৎসরের বৃদ্ধের সহিত অথবা দুশ্চরিত্র পানাসক্ত পাত্রের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে বলিয়া, বুক-ভাঙ্গা রোদনে বক্ষ ভিজাইতে থাকে—সেই হৃদয়-বিদারী অশ্রু-প্রবাহের মধ্যেই বিবাহ-ক্রিয়া সমাপ্ত হয়। পাত্রী কিছুতেই "হুঁ" বলিবে না,—কিন্তু অভিভাবকও নাছোড়বান্দা—তাঁহারা বলপূর্বক "হুঁ" "হুঁ" বলাইয়া বিবাহের শ্রাদ্ধ করেন।

এখন হিন্দুগণ অতি উদারভাবে স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা দান করিতেছে। পুত্র ও কন্যাকে সমভাবে শিক্ষাদান করিতেছেন। এখন হিন্দু বালিকা চতুষ্পাঠী, পাঠশালা, স্কুল, হাই স্কুল ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় জয় করিয়াছে। আর আমাদের সমাজ আমাদিগকে শিক্ষার আলো কিছুতেই দেখিতে দিবেন না।

৬০/৭০ বৎসর পূর্ব্বে পুরুষের পক্ষেও ইংরেজি শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল। ইংরেজি পড়িলেই লোকে কাফের হইত। এখন কর্ত্তারা তাহার ফলভোগ করিতেছেন। স্বাস্থ্য, অর্থ, শক্তি, সামর্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিভাগের দ্বারই মুসলমানের জন্য "অযোগ্যতার" অজুহাতে রুদ্ধ হইয়া আছে। কলিকাতা করপোরেশনে শতকরা ৫০টি চাকুরী লাভের জন্য চেঁচামেচি করিয়া মুসলমানগণ ভারতের নিকৃষ্ট শ্রেণীর (Depressed class)-এর তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। আমি বলি, তাঁহারা নিশ্চয়ই "অযোগ্য"। মুসলমানেরা স্বীকার করুন বা না করুন,—তাঁহারা যে অযোগ্য, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, সুশিক্ষিতা-সুযোগ্যা মাতার গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষা মুসলমানের ন্যায় অশিক্ষিতা অযোগ্যা মাতার গর্ভজাত সন্তান যে নিকৃষ্ট হইবে, ইহা ত অতি স্বাভাবিক। "অযোগ্য" বলার জন্য রাগ না করিয়া "যোগ্য" হবার চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃ।

মাসিক মোহাম্মদী, পৌষ ১৩৩৪

উন্নতির পথে

আজকাল সবাই উন্নতি করেছে—যেদিকে তাকাই কেবল দেখি উন্নতি আর উন্নতি। কেবল আমি অথর্ব্ব বুড়ো অচল হয়ে বসে আছি। তাই ভাবি আর বেশী করে ভাত খাই, আর ভাবি যে কি ক'রে আমার উন্নতি হবে।

চশমাটা ভাল ক'রে মুছে নিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলুম। হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপনে নজর পড়লো—'ক্রুশেন সল্ট' খেলে সত্তর বছরের বুড়ো কুড়ি বছরের তরুণ হয়ে যায়। বাস্—এক শিশি কিনে খাওয়া আরম্ভ করলুম।

ভাই! কি বলবো—এক হপ্তা 'ক্রুশেন সল্ট্' খেতে না খেতে এক্কেবারে আঠারো বছরের তরুণের মতো গায়ে স্ফূর্তি হলো! তখন ভাবলুম, আর এ বুড়োদের সঙ্গে অথর্ব্ব হয়ে থাকা নয়—যাই তরুণদের সাথে মিশতে।

লাঠি ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে দেখি: মেলা তরুণ এক জায়গায় জড় হয়ে গান করছে—

"নগ্ন শির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে,
কাছা কোঁচা শত বার খসে খসে পড়ে—"

বাঃ আমার বড় ভালো লাগলো—বিশেষতঃ আমি বাষট্টি বছর এগিয়ে এসেছি কিনা—অর্থাৎ আমার বয়স আশি বছর; কিন্তু এক হপ্তা ওষুধ খেয়ে যে এক্কেবারে আঠারো বছরের তরুণ হয়ে গেছি—তাই প্রাণে আর স্ফূর্তি ধরে না।

তরুণকে বললুম, "ভাই, আমি দাড়ী গোঁফ চেঁচে ফেলে (শিং কাটিয়ে) তোমাদের সঙ্গে মিশতে এসেছি। আমায় তোমার সঙ্গে উন্নতির পথে নিয়ে চল।"

সে বললে, "বেশ এস।"

পরদিন আমি একটা মোটর নিয়ে তরুণের কাছে গেলুম। সে হেসে বল্‌লো, "এখন আর মোটর নয়। আমার এরোপ্লেনে চল। এরোপ্লেনটা ঘন্টায় ৬০,০০০ মাইল চলে।"

আমি অবাক হয়ে বললুম, "ভায়া। পৃথিবীর গতি ঘণ্টায় ৭২০ মাইল, আর তোমার এরোপ্লেনের গতি ঘণ্টায় ৬০,০০০ মাইল?"

তরুণ বলল, "কি জান দাদা। পৃথিবী বুড়ো হয়ে গেছে—সে আর আমাদের উন্নতির গতির সঙ্গে পেরে উঠছে না।"

যাক, আমাদের প্লেন বোঁ বোঁ করে রওয়ানা হলো। তাতে আরও অনেক যাত্রী ছিল—ইরানী, তুরানী তুর্কী, আল্‌বেনিয়ান, ইরাকী, কাকুলী ইত্যাদি ইত্যাদি। কেবল তরুণ নয়, তরুণীরাও ছিল। সবাই নওজোয়ান,—বুড়ো (আমি ছাড়া আর) একটাও না। আমার মাথার ভিতর কেবলই গুনগুন করছিল—

"নগ্ন শির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে,
কাছা কোঁচা শত বার খসে খসে পড়ে—"

কখনও ঐ গানটাই উলট—পালট হয়ে মনে ভেসে বেড়াচ্ছিল—

"পাগড়ী নাই, টুপি নাই, লজ্জা নাই ধড়ে—"ইত্যাদি।

ও বাবা! কতক্ষণ পরে দেখি সি, সত্য সত্যই তরুণদের কাছা কেঁচো একেবারে খসে পড়ে গেছে—আর—

"রোদ বৃষ্টি হিম হতে বাঁচাইতে কায়
একমাত্র হ্যাট তার রয়েছে মাথায়!!"

শেষে দেখি, সোবহান আল্লাহ! তরুণীরাও অর্ধ-দিগম্বরী!!

যাক হ্যাট দিয়ে লজ্জা যদি না-ও নিবারণ হয়, তবু রোদ বৃষ্টি হিম হতে মাথাটা বাঁচাবে। কিন্তু তরুণীদের মাথায় যে হ্যাটও নাই। আর চেপে থাকতে না পেরে বলে ফেললুম—"ভাই তরুণ, উন্নতির পথে চলেছ তা উলঙ্গ হয়ে কেন?

সে বললে, "আমরা এখন দেশোদ্ধার করতে চলেছি—আমাদের কি কাছা-কোঁচা জ্ঞান আছে? তুচ্ছ বেশ-ভূষা, তুচ্ছ বাস—সব বিসর্জ্জন দাও স্বাধীনতা পাবার আশায়। আমরা চাই কেবল উন্নতি আর উন্নতি।"

চুপ করে থাকা আমার ধাতে নেই—আমি মরণকালে যমের সঙ্গেও গল্প করবো। তুরানী তরুণকে বললুম, "তোমরা ত ভাই নিজের দেশেই আছ, তোমরা স্বাধীন, তবে কাপড় ছাড়লে কেন?"

সে বললে, "এ কোথাকার ওল্ড ফুল! পৃথিবী যে চক্রাকার পথে ভ্রমণ করে—অর্থাৎ যেখান থেকে যাত্রা করেছে, ঘুরে আবার সেইখানে পৌঁছবে—এ তাও জানে না!"

পরে আমি কাবুলী তরুণকে বললুম, "ভাই! তোমরা ত চিরস্বাধীন, তবে কাপড় ছাড়লে কেন?"

সে আমাকে বুঝিয়ে বলল যে, তাদের দেশ আবর্জনায় ভ'রে গেছে, এখন তা'রা দেশের পঙ্কোদ্ধার করছে। পাগড়ী ও প্রকাণ্ড কাবুলী পায়জামা, আর চুল দাড়ি—এসব নিয়ে কাজ করতে গেলে, কাদার ছিটায় (চুল, দাড়ি, পাগড়ী, পায়জামা) সব বিদিকিচ্ছি হ'য়ে যাবে যে! তাই কেবল হ্যাট ছাড়া দেহে আর কোনো আবরণই থাকবে না।

বোঁ বোঁ করে প্লেন উন্নতির পথে ছুটেছে! এখন দেখি কি, সেই তুরাণী তরুণের কথাই সত্য, অর্থাৎ প্লেনটা চক্রাকার পথে ঘুরে ক্রমে কালিদাসের বর্ণিত শকুন্তলার যুগে—যখন মুনি-কন্যারা গাছের বাকল পরতেন, তাও আবার সব সময় লম্বায় চওড়ায় যথেষ্ট হ'ত না বলে টেনে টুনে পরতে হ'ত—সেই যুগে এসে পড়েছে। তরুণীর দিকে আর চাওয়া যায় না।

আমি মিনতি করে বল্‌লুম, "ভায়া তরুণ! দয়া করে তোমার প্লেনটা থামাও, আমি এইখানে নেমে পড়ি।"

ইরানী তরুণ হাসতে হাসতে বললেন, "দাদা! এখনই কি হয়েছে—কোল ভীলের যুগ দেখেই ভয় পাচ্ছ? এখনও গায়ে রং মাখার যুগে এসে পৌঁছায়নি!"

আমি কাকুতি ক'রে বললুম, 'দোহাই ভায়া তরুণ! আর না। আমি বুঝতে পেরেছি: তোমরা এখন আদি-মাতা হজরত হাবা'র যুগে এসে পড়বে। আদি-পিতা অভিশপ্ত হয়ে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে গাছের তিনটা পাতা চেয়ে নিয়ে—একটায় তহবন্দ, একটা দিয়ে জামা আর একটা দিয়ে মাথা ঢাকবার টুপী করেছিলেন। আর

আদি মাতা তাঁর লম্বা চুল খুলে দিয়ে সমস্ত গা ঢেকেছিলেন। কিন্তু এখনকার তরুণীদের মাথায় ত চুলও নেই—এরা কি দিয়ে গা ঢাকবে?"

সুলতানার স্বপ্ন

একদা আমার শয়নকক্ষে আরাম কেদারায় বসিয়া ভারতললনার জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলাম—আমাদের দ্বারা কি দেশের কোন ভাল কাজ হইতে পারে না?—এই সব ভাবিতেছিলাম। সে সময় মেঘমুক্ত আকাশে শারদীয় পূর্ণিমার শশধর পূর্ণগৌরবে শোভমান ছিল; কোটিলক্ষ তারকা শশীকে বেষ্টন করিয়া হীরক-প্রভায় দেদীপ্যমান ছিল। মুক্ত বাতায়ন হইতে কৌমুদীস্নাত উদ্যানটি স্পষ্টই আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। এক একবার মৃদুস্নিগ্ধ সমীরণ শেফালিসৌরভ বহিয়া আনিয়া ঘরখানি আমোদিত করিয়া দিতেছিল। দেখিলাম, সুধাকরের পূর্ণ কান্তি, কুসুমের সুমিষ্ট সৌরভ, সমীরণের সুমন্দ হিল্লোল, রজতচন্দ্রিকা—ইহারা সকলে মিলিয়া আমার সাধের উদ্যানে এক অনির্বচনীয় স্বপ্নরাজ্য রচনা করিয়া ফেলিয়াছে। তদ্দর্শনে আমি আনন্দে আত্মহারা হইলাম,—যেন জাগিয়াই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম! ঠিক বলিতে পারি না আমি তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিলাম কি না;—কিন্তু যতদূর মনে পড়ে, আমার বিশ্বাস আমি জাগ্রত ছিলাম।

সহসা আমার পার্শ্বে একটি ইউরোপীয় রমণীকে দণ্ডায়মানা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তিনি কি প্রকারে আসিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহাকে আমার পরিচিতা "ভগিনী সারা' (Sister Sara) বলিয়া বোধ হইল। ভগিনী সারা "সুপ্রভাত" বলিয়া আমাকে অভিবাদন করিলেন!" আমি মনে মনে হাসিলাম,—এমন শুভ্র জ্যোৎস্না-প্লাবিত রজনীতে তিনি বলিলেন, "সুপ্রভাত!" তাঁহার দৃষ্টিশক্তি কেমন? যাহা হউক, প্রকাশ্যে আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম,—

"আপনি কেমন আছেন?"

"আমি ভাল আছি, ধন্যবাদ। আপনি একবার আমাদের বাগানে বেড়াইতে আসিবেন কি?"

আমি মুক্তবাতায়ন হইতে আবার পূর্ণিমা-চন্দ্রের প্রতি চাহিলাম,—ভাবিলাম, এসময় যাইতে আপত্তি কি? চাকরেরা এখন গভীর নিদ্রামগ্ন; এই অবসরে ভগিনী সারা সমভিব্যাহারে বেড়াইয়া বেশ একটু আনন্দ উপভোগ করা যাইবে।

দার্জিলিং অবস্থানকালে আমি সর্বদাই ভগিনী সারার সহিত ভ্রমণ করিতাম। কতদিন উদ্ভিদকাননে (বোটানিকাল গার্ডেনে) বেড়াইতে বেড়াইতে উভয়ে লতাপাতা সম্বন্ধে—ফুলের লিঙ্গনির্ণয় সম্বন্ধে কত তর্ক-বিতর্ক করিয়াছি, সে সব কথা মনে পড়িল। ভগিনী সারা সম্ভবত আমাকে তদ্রূপ কোন উদ্যানে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আসিয়াছেন; আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার সহিত বাহির হইলাম।

ভ্রমণকালে দেখি কি—এ ত সে জ্যোৎস্নাময়ী রজনী নহে!—এ দিব্য প্রভাত! নগরের লোকেরা জাগিয়া উঠিয়াছে, রাজপথে লোকে লোকারণ্য! কি বিপদ! আমি দিনেরবেলায় এভাবে পথে বেড়াইতেছি! ইহা ভাবিয়া লজ্জায় জড়সড় হইলাম—যদিও পথে একজনও পুরুষ দেখিতে পাই নাই।

পথিকা স্ত্রীলোকেরা আমার দিকে চাহিয়া হাস্য পরিহাস করিতেছিল। আমি তাহাদের ভাষা না বুঝিলেও ইহা স্পষ্ট বুঝিলাম, যে তাহাদের লক্ষ্য বেচারি আমিই। সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"উহারা কি বলিতেছে?"

উত্তর পাইলাম—"উহারা বলে, যে আপনি অনেকটা পুরুষভাবাপন্ন।"

"পুরুষভাবাপন্ন। ইহার মানে কি?"

"ইহার অর্থ এই, যে আপনাকে পুরুষের মত ভীরু ও লজ্জানম্র দেখায়!"

"পুরুষের মত লজ্জানম্র!" এমন ঠাট্টা! এরূপ উপহাস ত কখন শুনি নাই! ক্রমে বুঝিতে পারিলাম, আমার সঙ্গিনী সে দার্জিলিংবাসিনী ভগিনী সারা নহেন,—ইঁহাকে আর কখনও দেখি নাই! ওহো! আমি কেমন বোকা—একজন অপরিচিতার সহিত হঠাৎ চলিয়া আসিলাম! কেমন একটু বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূত হইলাম। আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত ও ঈষৎ কম্পিত হইল। তাঁহার হাত ধরিয়া চলিতেছিলাম কি না, তিনি আমার হস্তকম্পন অনুভব করিয়া সস্নেহে বলিলেন,—

"আপনার কি হইয়াছে? আপনি কাঁপিতেছেন যে!"

এরূপে ধরা পড়ায় আমি লজ্জিত হইলাম। ইতস্তত করিয়া বলিলাম, "আমার কেমন একটু সঙ্কোচ বোধ হইতেছে; আমরা পর্দা নশীল স্ত্রীলোক, আমাদের বিনা অবগুণ্ঠনে বাহির হইবার অভ্যাস নাই।"

"আপনার ভয় নাই—এখানে আপনি কোন পুরুষের সম্মুখে পড়িবেন না। এ দেশের নাম 'নারীস্থান এখানে স্বয়ং পুণ্য নারীবেশে রাজত্ব করেন।"

ক্রমে নগরের দৃশ্যাবলি দেখিয়া আমি অন্যমনস্ক হইলাম। বাস্তবিক পথের উভয় পার্শ্বস্থিত দৃশ্য অতিশয় রমণীয় ছিল। সুনীল অম্বর দর্শনে মনে হইল যেন ইতঃপূর্বে আর কখন এত পরিষ্কার আকাশ দেখি নাই! একটি তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর দেখিয়া ভ্রম হইল, যেন হরিৎ মখ্‌মলের গালিচা পাতা রহিয়াছে। ভ্রমণ কালে আমার বোধ হইতেছিল, যেন কোমল মস্‌নদের উপর বেড়াইতেছি,—ভূমির দিকে দৃক্‌পাত করিয়া দেখি, পথটি শৈবাল ও বিবিধ পুষ্পে আবৃত! আমি তখন সানন্দে বলিয়া উঠিলাম, "আহা! কি সুন্দর!"

ভগিনী সারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এ সব পছন্দ করেন কি?" (আমি তাঁহাকে 'ভগিনী সারা'ই বলিতে থাকিলাম, এবং তিনিও আমার নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন।)

"হাঁ এসব দেখিতে বড়ই চমৎকার। কিন্তু আমি এ সুকুমার কুসুমস্তবক পদদলিত করিতে চাই না।"

"সেজন্য ভাবিবেন না, প্রিয় সুলতানা! আপনার পদস্পর্শে এ ফুলের কোন ক্ষতি হইবে না। এগুলি বিশেষ এক জাতীয় ফুল, ইহা রাজপথেই রোপণ করা হয়।"

দুইধারে পুষ্পচূড়াধারী পাদপশ্রেণী সহাস্যে শাখা দোলাইয়া দোলাইয়া যেন আমার অভ্যর্থনা করিতেছিল। দূরাগত কেতকী-সৌরভে দিক্ পরিপূরিত ছিল। সে সৌন্দর্য ভাষায় ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য—আমি মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে বলিলাম, "সমস্ত

নগরখানি একটি কুঞ্জ ভবনের মত দেখায়! যেন ইহা প্রকৃতি-রানীর লীলাকানন! আপনাদের উদ্যানরচনা-নৈপুণ্য অত্যন্ত প্রশংসনীয়।"

"ভারতবাসী ইচ্ছা করিলে কলিকাতাকে ইহা অপেক্ষা অধিক সুন্দর পুষ্পোদ্যানে পরিণত করিতে পারেন!"

"তাঁহাদিগকে অনেক গুরুতর কার্য করিতে হয়, তাঁহারা কেবল উপবনের উন্নতি কল্পে অধিক সময় ব্যয় করা অনাবশ্যক মনে করিবেন!"

"ইহা ছাড়া তাঁহারা আর কি বলিতে পারেন? জানেন ত অলসেরা, অতিশয় বাক্‌পটু হয়!"

আমার বড় আশ্চর্যবোধ হইতেছিল, যে দেশের পুরুষেরা কোথায় থাকে? রাজপথে শতাধিক ললনা দেখিলাম, কিন্তু পুরুষ বলিতে একটি বালক পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইল না। শেষে কৌতূহল গোপন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "পুরুষেরা কোথায়?"

উত্তর পাইলাম, "যেখানে তাহাদের থাকা উচিত সেইখানে, অর্থাৎ তাহাদের উপযুক্ত স্থানে।"

ভাবিলাম, তাহাদের "উপযুক্ত স্থান" আবার কোথায়, আকাশে না পাতালে? পুনরায় বলিলাম, "মাফ করিবেন, আপনার কথা ভালমতে বুঝিতে পারিলাম না। তাহাদের 'উপযুক্ত স্থানের' অর্থ কি?

"ওহো! আমার কি ভ্রম!—আপনি আমাদের নিয়ম আচার জ্ঞাত নহেন, একথা আমার মনেই ছিল না। এ দেশে পুরুষজাতি গৃহাভ্যন্তরে অবরুদ্ধ থাকে।"

"কি! যেমন আমরা অন্তপুরে থাকি, সেইরূপ তাঁহারাও থাকেন না কি?"

"হাঁ, ঠিক তদ্রূপই।"

"বাঃ! কি আশ্চর্য ব্যাপার!" বলিয়া আমি উচ্চহাস্য করিলাম। ভগিনী সারাও হাসিলেন! আমি প্রাণে বড় আরাম পাইলাম;—পৃথিবীতে অন্তত এমন একটি দেশও আছে, যেখানে পুরুষজাতি অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকে! ইহা ভাবিয়া অনেকটা সান্ত্বনা অনুভব করা গেল!

তিনি বলিলেন, "ইহা কেমন অন্যায়, যে নিরীহ রমণী অন্তঃপুরে আবদ্ধা থাকে, আর পুরুষেরা মুক্ত স্বাধীনতা ভোগ করে। কি বলেন, সুলতানা, আপনি ইহা অন্যায় মনে করেন না?"

আমি আজন্ম অন্তঃপুরবাসিনী, আমি এ প্রথাকে অন্যায় মনে করিব কিরূপে? প্রকাশ্যে বলিলাম,— অন্যায় কিসের? রমণী স্বভাবত দুর্বলা, তাহাদের পক্ষে অন্তঃপুরের বাহিরে থাকা নিরাপদ নহে।"

"হাঁ, নিরাপদ নহে ততদিন,—যতদিন পুরুষজাতি বাহিরে থাকে! তা কোন বন্য জন্তু কোন একটা গ্রামে আসিয়া পড়িলেও ত সে গ্রামখানি নিরাপদ থাকে না। কি বলেন?"

"তাহা ঠিক; হিংস্রজন্তুটা ধরা না পড়া পর্যন্ত গ্রামটি নিরাপদ হইতে পারে না।"

"মনে করুন, কতকগুলি পাগল যদি বাতুলাশ্রম হইতে বাহির হইয়া পড়ে আর তাহারা অশ্ব, গবাদি—এমন কি ভাল মানুষের প্রতিও নানা প্রকার উপদ্রব উৎপীড়ন আরম্ভ করে, তবে ভারতবর্ষের লোকে কি করিবে?"

"তবে তাহারা পাগলগুলিকে ধরিয়া পুনরায় বাতুলাগারে আবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইবে।"

"বেশ! বুদ্ধিমান লোককে বাতুলালয়ে আবদ্ধ রাখিয়া দেশের সমস্ত পাগলকে মুক্তি দেওয়াটা বোধ হয় আপনি ন্যায়সঙ্গত মনে করেন না?"

"অবশ্যই না! শান্তশিষ্ট লোককে বন্দী করিয়া পাগলকে মুক্তি দিবে কে?"

"কিন্তু কার্যত আপনাদের দেশে আমরা ইহাই দেখিতে পাই! পুরুষেরা—যাহারা নানা প্রকার দুষ্টামী করে, বা অন্তত করিতে সক্ষম, তাহারা দিব্য স্বাধীনতা ভোগ করে, আর নিরীহ কোমলাঙ্গী অবলারা বন্দিনী থাকে! অশিক্ষিত অমার্জিতরুচি পুরুষেরা বিনা শৃঙ্খলে থাকিবার উপযুক্ত নহে। আপনারা কিরূপে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া নিশ্চিত থাকেন?"

"জানেন, ভগিনী সারা! সামাজিক বিধিব্যবস্থার উপর আমাদের কোন হাত নাই। ভারতে পুরুষজাতি প্রভু,—তাহারা সমুদয় সুখ সুবিধা ও প্রভুত্ব আপনাদের জন্য হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে, আর সরলা অবলাকে অন্তঃপুর পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়াছে! উড়িতে শিখিবার পূর্বেই আমাদের ডানা কাটিয়া দেওয়া হয়—তদ্ব্যতীত সামাজিক রীতিনীতির কত শত কঠিন শৃঙ্খল পদে পদে জড়াইয়া আছে।"

"তাই ত! আমার বলিতে ইচ্ছা হয়,—'দোষ কার, বন্দী হয় কে!' কিন্তু বলি, আপনারা ওসব নিগড় পরেন কেন?"

"না পরিয়া করি কি? 'জোর যার মুলুক তার'; যাহার বল বেশি, সেই স্বামিত্ব করিবে—ইহা অনিবার্য।"

"কেবল শারীরিক বল বেশি হইলেই কেহ প্রভুত্ব করিবে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। সিংহ কি বলে বিক্রমে মানবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। তাই বলিয়া কি কেশরী মানবজাতির উপর প্রভুত্ব করিবে? আপনাদের কর্তব্যের ত্রুটি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আপনারা সমাজের উপর কর্তৃত্ব ছাড়িয়া একাধারে নিজের প্রতি অত্যাচার এবং স্বদেশের অনিষ্ট দুই-ই করিয়াছেন। আপনাদের কল্যাণে সমাজ আরও উন্নত হইত—আপনাদের সাহায্য অভাবে সমাজ অর্ধেক শক্তি হারাইয়া দুর্বল ও অবনত হইয়া পড়িয়াছে।"

"শুনুন ভগিনী সারা! যদি আমরাই সংসারে সমুদয় কার্য করি, তবে পুরুষেরা কি করিবে?"

"তাহারা কিছুই করিবে না,—তাহারা কোন ভাল কাজের উপযুক্ত নহে। তাহাদিগকে ধরিয়া অন্তঃপুরে বন্দী করিয়া রাখুন।"

"কিন্তু ক্ষমতাশালী নরবরদিগকে চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে বন্দী করা কি সম্ভব, না সহজ ব্যাপার? আর তাহা যদিই সাধিত হয়, তবে দেশের যাবতীয় কার্য—যথা রাজকার্য, বাণিজ্য ইত্যাদি—সকল কাজই অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিবে যে!"

এবার ভগিনী সারা কিছু উত্তর দিলেন না; সম্ভবত আমার ন্যায় অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন অবলার সহিত তর্ক করা তিনি অনাবশ্যক মনে করিলেন!

ক্রমে আমরা ভগিনী সারার গৃহতোরণে উপনীত হইলাম। দেখিলাম, বাড়িখানি একটি বৃহৎ হৃদয়াকৃতি উদ্যানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এ ভাবটি কি চমৎকার!—ধরিত্রী জননীর হৃদয়ে মানবের বাসভবন! বাড়ি বলিতে, একটি টিনের বাঙ্গালা মাত্র, কিন্তু সৌন্দর্যে ও নৈপুণ্যে ইহার নিকট আমাদের দেশের বড় বড় রাজপ্রাসাদ পরাজিত! সাজসজ্জা কেমন নয়নাভিরাম ছিল, তাহা ভাষায় বর্ণনীয় নহে—তাহা কেবল দেখিবার জিনিস!

আমরা উভয়ে পাশাপাশি উপবেশন করিলাম। তিনি সেলাই করিতে আরম্ভ করিলেন; একটি খঞ্চিপোষে রেশমের কাজ করা হইতেছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমিও সেলাই জানি কি না। আমি বলিলাম—

"আমরা অন্তঃপুরে থাকি, সেলাই ব্যতীত অন্য কাজ জানি না।"

"কিন্তু এ দেশের অন্তঃপুরবাসীদের হাতে আমরা কারচোবের কাজ দিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না!" এই বলিয়া তিনি হাসিলেন; "পুরুষদের এতখানি সহিষ্ণুতা কই, যে তাহারা ধৈর্য্যের সহিত ছুঁচে সূতা পরাইবে?"

তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, "তবে কি কারচোবের কাজগুলি সব আপনিই করিয়াছেন?" তাঁহার ঘরে বিবিধ ত্রিপদীর উপর নানা প্রকার সলমা চুমকির কারুকার্যখচিত বস্ত্রাবরণ ছিল।

তিনি বলিলেন, "হাঁ, এ সব আমারই স্বহস্ত প্রস্তুত।"

"আপনি কিরূপে সময় পান? আপনাকে ত অফিসের কাজও করিতে হয়, না? কি বলেন?"

"হা। তা আমি সমস্ত দিন রসায়নাগারে আবদ্ধ থাকি না। আমি দুই ঘণ্টায় দৈনিক কর্তব্য শেষ করি।"

"দুই ঘণ্টায়! আপনি একি বলেন?—দুই ঘণ্টায় আপনার কার্য শেষ হয়! আমাদের দেশে রাজকর্মচারীগণ—যেমন ম্যাজিস্ট্রেট, মুন্সেফ, জজ প্রভৃতি প্রতিদিন ৭ ঘণ্টা কাজ করিয়া থাকেন।"

"আমি ভারতের রাজপুরুষদের কার্যপ্রণালী দেখিয়াছি। আপনি কি মনে করেন, যে তাঁহারা সাত-আট ঘণ্টাকাল অনবরত কাজ করেন?"

"নিশ্চয়! বরং এতদপেক্ষা অধিক পরিশ্রমই করেন।"

"না প্রিয় সুলতানা! ইহা আপনার ভ্রম! তাঁহারা অলসভাবে বেত্রাসনে বসিয়া ধূমপানে সময় অতিবাহিত করেন! কেহ আবার আফিসে থাকিয়া ক্রমাগত দুই তিনটি চুরুট ধ্বংস করেন। তাঁহারা মুখে যত বলেন, কার্যত তত করেন না। রাজপুরুষেরা যদি কিছু করেন ত তাহা এই, যে কেবল তাঁহাদের নিম্নতম কর্মচারীদের ছিদ্রান্বেষণ! মনে করুন একটি চুরুট ভস্মীভূত হইতে অর্ধঘণ্টা সময় লাগে, আর কেহ দৈনিক ১২টি চুরুট ধ্বংস করেন, তবে সে ভদ্রলোকটি প্রতিদিন ধূমপানে মাত্র ছয় ঘণ্টা ব্যয় করেন!"

তাই ত! অথচ ভ্রাতৃমহোদয়গণ জীবিকা অর্জন করেন, এই অহঙ্কারেই বাঁচেন না! ভগিনী সারার সহিত বিবিধ প্রসঙ্গ হইল। শুনিলাম তাঁহাদের নারীস্থান কখনও মহামারী রোগে আক্রান্ত হয় না। আর তাঁহারা আমাদের ন্যায় হুলধর মশার দংশনেও অধীর হন

না! বিশেষ একটি কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম— নারীস্থানে নাকি কাহারও অকাল-মৃত্যু হয় না। তবে বিশেষ কোন দুর্ঘটনা হইলে লোকে অপ্রাপ্ত বয়সে মরে, সে স্বতন্ত্র কথা। ভগিনী সারা আবার হিন্দুস্থানের অসংখ্য শিশুর মৃত্যু সংবাদে অবাক হইলেন। তাঁহার মতে যেন এই ঘটনা সর্বাপেক্ষা অসম্ভব! তিনি বলিলেন, যে প্রদীপ সবেমাত্র তৈল সলিতা যোগে জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে কেন (তৈল বর্ত্তমানে) নির্বাপিত হইবে? যে নব কিশলয় সবেমাত্র অঙ্কুরিত হইয়াছে, সে কেন পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্বে ঝরিবে!

ভারতের প্লেগ সম্বন্ধেও অনেক কথা হইল; তিনি বলিলেন, "প্লেগ টেলেগ কিছুই নহে—কেবল দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত লোকেরা নানা রোগের আধার হইয়া পড়ে। একটু অনুধাবন করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, গ্রাম অপেক্ষা নগরে প্লেগ বেশি,—নগরের ধনী অপেক্ষা নির্ধনের ঘরে প্লেগ বেশি হয়, এবং প্লেগে দরিদ্র পুরুষ অপেক্ষা দরিদ্র রমণী অধিক মারা যায়। সুতরাং বেশ বুঝা যায়, প্লেগের মূল কোথায়—মূল কারণ ঐ অন্নাভাব। আমাদের এখানে প্লেগ বা ম্যালেরিয়া আসুক ত দেখি!"

তাই ত, ধনধান্যপূর্ণা নারীস্থানে ম্যালেরিয়া কিম্বা প্লেগের অত্যাচার হইবে কেন? প্লীহা-স্ফীত উদর ম্যালেরিয়াক্লিস্ট বাঙ্গালায় দরিদ্রদিগের অবস্থা স্মরণ করিয়া আমি নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম।

অতঃপর তিনি আমাকে তাঁহাদের রন্ধনশালা দেখাইবার জন্য লইয়া গেলেন। অবশ্য যথাবিধি পর্দা করিয়া যাওয়া হইয়াছিল! একি রন্ধন-গৃহ, না নন্দন-কানন? রন্ধনশালার চতুর্দিকে মনোরম সবজী বাগান এবং নানপ্রকার তরিতরকারির লতাগুল্মে পরিপূর্ণ। ঘরের ভিতর ধূম বা ইন্ধনের কোন চিহ্ন নাই,—মেঝেখানি অমল ধবল মর্মর প্রস্তর-নির্মিত; মুক্ত বাতায়নগুলি সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পদামে সুসজ্জিত! আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"আপনারা রাঁধেন কিরূপে? কোথাও ত অগ্নি জ্বালিবার স্থান দেখিতেছি না?"

তিনি বলিলেন, "সূর্যোত্তাপে রান্না হয়।" অতঃপর কি প্রকারে সৌরকর একটা নলের ভিতরে দিয়া আইসে, সেই নলটা তিনি আমাকে দেখাইলেন। কেবল ইহাই নহে; তিনি তৎক্ষণাৎ এক পাত্র ব্যঞ্জন (যাহা পূর্ব হইতে তথায় রন্ধনের নিমিত্ত প্রস্তুত ছিল) রাঁধিয়া আমাকে সেই অদ্ভুত রন্ধনপ্রণালী দেখাইলেন।

আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা সৌরোত্তাপ সংগ্রহ করেন কি প্রকারে?"

ভগিনী বলিলেন, "কিরূপে সৌরকর আমাদের করায়ত্ত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস শুনিবেন? ত্রিশ বৎসর পূর্বে যখন আমাদের বর্তমান মহারানী সিংহাসন প্রাপ্ত হন, তখন তিনি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা ছিলেন। তিনি নামত রানী ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রী রাজ্য শাসন করিতেন।

"মহারানী বাল্যকাল হইতেই বিজ্ঞান চর্চা করিতে ভালবাসিতেন। সাধারণ রাজকন্যাদের ন্যায় তিনি বৃথা সময় যাপন করিতেন না। একদিন তাঁহার খেয়াল হইল, যে তাঁহার রাজ্যের সমুদয় স্ত্রীলোকই সুশিক্ষা প্রাপ্ত হউক। মহারানীর খেয়াল,— সে

খেয়াল তৎক্ষণাৎ কার্যে পরিণত হইল! অচিরে গভর্নমেন্ট পক্ষ হইতে অসংখ্য বালিকা স্কুল স্থাপিত হইল। এমনকি পল্লীগ্রামেও উচ্চশিক্ষার অমিয়-স্রোত প্রবাহিত হইল। শিক্ষার বিমল জ্যোতিতে কুসংস্কাররূপ অন্ধকার তিরোহিত হইতে লাগিল, এবং বাল্যবিবাহ-প্রথাও রহিত হইল। একুশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বে কোন কন্যার বিবাহ হইতে পারিবে না—এই আইন হইল। আর এক কথা, এই পরিবর্তনের পূর্বে আমরাও আপনাদের মত কঠোর অবরোধে বন্দিনী থাকিতাম।"

"এখন কিন্তু বিপরীত অবস্থা!" এই বলিয়া আমি হাসিলাম।

"কিন্তু স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে ব্যবধান ত সেই প্রকারই আছে! কতকদিন তাঁহারা বাহিরে, আমরা ঘরে ছিলাম; এখন তাঁহারা ঘরে, আমরা বাহিরে আছি! পরিবর্তন প্রকৃতিরই নিয়ম! কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইল; তথায় বালকদের প্রবেশ নিষেধ ছিল।"

"আমাদের পৃষ্ঠপোষিকা স্বয়ং মহারানী,—আর কি কোন অভাব থাকিতে পারে? অবলাগণ অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে বিজ্ঞান আলোচনা আরম্ভ করিলেন। এই সময় রাজধানীর একতর বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা—প্রিন্সিপাল একটি অভিনব বেলুন নির্মাণ করিলেন; এই বেলুনে কতকগুলি নল সংযোগ করা হইল। বেলুনটি শূন্যে মেঘের উপর স্থান করা গেল,—বায়ুর আর্দ্রতা ঐ বেলুনে সংগ্রহ করিবার উপায় ছিল,—এইরূপে জলধরকে ফাঁকি দিয়া তাঁহারা বৃষ্টিজল করায়ত্ত করিলেন! বিদ্যালয়ের লোকেরা সর্বদা ঐ বেলুনের সাহায্যে জল গ্রহণ করিত কি না, তাই আর মেঘমালায় আকাশ আচ্ছন্ন হইতে পারিত না। এই অদ্ভুত উপায়ে বুদ্ধিমতী লেডী প্রিন্সিপাল প্রাকৃতিক ঝড় বৃষ্টি নিবারণ করিলেন।"

"বটে? তাই আপনাদের এখানে পথে কর্দম দেখিলাম না" কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না,—নলের ভিতর বায়ুর আর্দ্রতা কিরূপে আবদ্ধ থাকিতে পারে; আর ঐরূপে বায়ু হইতে জল সংগ্রহ করাই বা কিরূপে সম্ভব? তিনি আমাকে ইহা বুঝাইতে অনেকটা চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আমার যে বুদ্ধি!—তাহাতে আবার বিজ্ঞান রসায়নের সঙ্গে আমাদের (অর্থাৎ মোসলেম ললনাদের) কোন পুরুষে পরিচয় নাই! সুতরাং ভগিনী সারার ব্যাখ্যা কোন মতেই আমার বোধগম্য হইল না। যাহা হউক তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন:

"দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই জলধর-বেলুন দর্শনে অতীত বিস্মিত হইল,—অতিহিংসায় তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সহস্রগুণ বর্ধিত হইল। প্রিন্সিপাল মনস্থ করিলেন, যে এমন কিছু অসাধারণ বস্তু সৃষ্টি করা চাই, যাহাতে কাদম্বিনী-বিজয়ী বিদ্যালয়কে পরাভূত করা যায়! তাঁহারা অল্পকাল মধ্যে একটি যন্ত্র নির্মাণ করিলেন, তদ্বারা সূর্যোত্তাপ সংগ্রহ করা যায়। কেবল ইহাই নহে,—তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে ঐ উত্তাপ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে এবং ইচ্ছামত যথাতথা বিতরণ করিতে পারেন।"

"যৎকালে এ দেশের রমণীবৃন্দ নানাবিধ বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে নিযুক্ত ছিলেন, পুরুষেরা তখন সৈনিক বিভাগের বলবৃদ্ধির চেষ্টায় ছিলেন। যখন নরবীরগণ শুনিতে

পাইলেন যে জেনানা বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয় বায়ু হইতে জলগ্রহণ করিতে এবং সূর্যোত্তাপ সংগ্রহ করিতে পারে, তাঁহারা তাচ্ছিল্যের ভাবে হাসিলেন। এমন কি তাঁহারা বিদ্যালয়ের সমুদয় কার্যপ্রণালীকে 'স্বপ্ন-কল্পনা' বলিয়া উপহাস করিতেও বিরত হন নাই।"

আমি বলিলাম, "আপনাদের কার্যকলাপ বাস্তবিক অত্যন্ত বিস্ময়কর! কিন্তু এখন বলুন দেখি, আপনারা পুরুষদের কি প্রকারে অন্তঃপুরে বন্দী করিলেন? কোনরূপ ফাঁদ পাতিয়াছিলেন না কি?"

ভগিনী বলিলেন, "না"।

"তাঁহারা যে নিজে ধরা দিবেন ইহাও ত সম্ভব নয়। মুক্ত স্বাধীনতার জলাঞ্জলি দিয়া স্বেচ্ছায় চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে বন্দী হইবে কোন্ পাগল? তবে অবশ্যই পুরুষেরা কোনরূপে আপনাদের দ্বারা পরাভূত হইয়াছিলেন।"

"হাঁ, তাই বটে!"

"কে প্রথমে পুরুষপ্রবরদের পরাভূত করিল,—সম্ভবত; কতিপয় নারীযোদ্ধা?"

"না, এ দেশের পুরুষদল বাহুবলে পরাস্ত হয় নাই।"

"হাঁ, ইহা অসম্ভবও বটে, কারণ পুরুষের বাহু নারীর বাহু অপেক্ষা দুর্বল নহে। তবে?"

"মস্তিষ্কবলে।"

"তাহাদের মস্তিষ্কও ত রমণীর তুলনায় বৃহত্তর ও গুরুতর। না?—কি বলেন?"

"মস্তিষ্ক গুরুতর হইলেই কি? হস্তীর মস্তিষ্কও ত মানবের তুলনায় বৃহৎ এবং ভারি, তবু ত মানুষ হস্তীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছে!"

"ঠিক ত! কিন্তু কি প্রকারে কর্তারা বন্দী হইলেন, এ কথা জানিবার জন্য আমি বড় উৎসুক হইয়াছি। শীঘ্র বলুন—আর বিলম্ব সহে না!"

"স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক পুরুষের অপেক্ষা ক্ষিপ্রকারী, এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন। পুরুষ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে অনেক ভাবে—অনেক যুক্তি তর্কের সাহায্যে বিষয়টি বোধগম্য করে। কিন্তু রমণী বিনা চিন্তায় হঠাৎ সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। যাহা হউক, দশ বৎসর পূর্বে যখন সৈনিক বিভাগের কর্মচারীগণ আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদিকে 'স্বপ্ন-কল্পনা' বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন, তখন কতিপয় ছাত্রী তদুত্তরে কিছু বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেডী প্রিন্সিপালদ্বয় বাধা দিলেন। তাঁহারা বলিলেন, যে তোমরা বাক্যে উত্তর না দিয়া সুযোগ পাইলে কার্য দ্বারা উত্তর দিও। ঈশ্বর কৃপায় এই উত্তর দিবার সুযোগের জন্য ছাত্রীদিগকে অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই।"

"ভারি আশ্চর্য!" আমি অতি আনন্দে আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া করতালি দিয়া বলিলাম, "এখন দাম্ভিক ভদ্রলোকেরা অন্তঃপুরে বসিয়া 'স্বপ্ন-কল্পনায়' বিভোর হইয়াছেন!"

ভগিনী সারা বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—

"কিছুদিন পরে কয়েকজন বিদেশী লোক এ দেশে আসিয়া আশ্রয় লইল। তাহারা কোন প্রকার রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত ছিল। তাহাদের রাজা ন্যায়সঙ্গত সুশাসন

বা সুবিচারের পক্ষপাতী ছিলেন না,—তিনি কেবল স্বামীত্ব ও অপ্রতিহত বিক্রম প্রকাশে তৎপর ছিলেন। তিনি আমাদের সহৃদয়া মহারানীকে ঐ আসামী ধরিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মহারানী ত দয়া প্রতিমা জননীর জাতি—সুতরাং তিনি তাঁহার আশ্রিত হতভাগ্যদিগকে ক্রুদ্ধ রাজার শোণিত-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য ধরিয়া দিলেন না। প্রবল ক্ষমতাশালী রাজা ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

"আমাদের রণসজ্জাও প্রস্তুত ছিল, সৈন্য সেনানীগণও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহারা বীরোচিত উৎসাহে শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। তুমুল সংগ্রাম বাধিল—রক্ত গঙ্গায় দেশ ডুবিয়া গেল! প্রতিদিন যোদ্ধাগণ অম্লান বদনে পতঙ্গপ্রায় সমরানলে প্রাণ বিসর্জন দিতে লাগিল।

"কিন্তু শত্রুপক্ষ অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাহাদের গতিরোধ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। আমাদের সেনাদল প্রাণপণ কেশরীবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও শনৈঃ শনৈঃ পশ্চাৎবর্ত্তী হইতে লাগিল, এবং শত্রুগণ ক্রমশ অগ্রসর হইল।

"কেবল বেতনভোগী সেনা কেন, দেশের ইতর ভদ্র— সকল লোকই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। এমনকি ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ হইতে ষোড়শবর্ষীয় বালক পর্যন্ত সমরশায়ী হইতে চলিল। কতিপয় প্রধান সেনাপতি হইলেন; অসংখ্য সেনা প্রাণ হারাইল; অবশিষ্ট যোদ্ধাগণ বিতাড়িত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য হইল। শত্রু এখন রাজধানী হইতে মাত্র ১২/১৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত—আর দুটি চারি দিবসের যুদ্ধের পরেই তাহারা রাজধানী আক্রমণ করিবে।

"এই সঙ্কট সময়ে সম্রাজ্ঞী জনকতক মহিলাকে লইয়া সভা আহ্বান করিলেন। এখন কি করা কর্তব্য ইহাই সভার আলোচ্য বিষয় ছিল।

"কেহ প্রস্তাব করিলেন, যে রীতিমত যুদ্ধ করিতে যাইবেন; অন্য দল বলিলেন, যে ইহা অসম্ভব— কারণ একে ত অবলারা সমরনৈপুণ্যে অনভিজ্ঞ, তাহাতে আবার কৃপাণ, তোষাদান, বন্দুক ধারণেও অক্ষমা; তৃতীয় দল বলিলেন, যে যুদ্ধনৈপুণ্য দূরে থাকুক— রমণীর শারীরিক দুর্বলতাই প্রধান অন্তরায়।

"মহারানী বলিলেন, যদি আপনারা বাহুবলে দেশ রক্ষা করিতে না পারেন, তবে মস্তিষ্ক বলে দেশ রক্ষার চেষ্টা করুন।"

"সকলে নিরুত্তর; সভাস্থল নীরব। মহারানী মৌনভঙ্গ করিয়া পুনরায় বলিলেন, 'যদি দেশ ও সম্ভ্রম রক্ষা করিতে না পারি, তবে আমি নিশ্চয় আত্মহত্যা করিব।"

"এইবার দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেডী প্রিন্সিপাল (যিনি সৌরকর করায়ত্ত করিয়াছেন) উত্তর দিলেন। তিনি এতক্ষণ নীরবে চিন্তা করিতেছিলেন—এখন অতি ধীরে গম্ভীরভাবে বলিলেন, যে বিজয় লাভের আশা ভরসা ত নাই,—শত্রু প্রায় গৃহতোরণে। তবে তিনি একটি সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন—যদি এই উপায়ে শত্রু পরাজিত হয়, তবে ত সুখের বিষয়। এই উপায় ইতঃপূর্বে আর কেহ অবলম্বন করে নাই—তিনি প্রথমে এই উপায়ে শত্রু জয়ের চেষ্টা করিবেন। এই তাঁহার শেষ চেষ্টা—যদি ইহাতে কৃতকার্য হওয়া না যায় তবে অবশ্য সকলে আত্মহত্যা করিবেন। উপস্থিত মহিলাবৃন্দ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করিলেন, যে তাঁহারা কিছুতেই দাসত্ব-শৃঙ্খল পরিবেন না। সেই গভীর নিস্তব্ধ রজনীতে

মহারানীর সভাগৃহ অবলাকণ্ঠের প্রতিজ্ঞাধ্বনিতে পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইল। প্রতিধ্বনি ততোধিক উল্লাসের স্বরে বলিল, "আত্মহত্যা করিব!" সে যেন ততোধিক তেজোব্যঞ্জক স্বরে বলিলে, "বিদেশীয় অধীনতা স্বীকার করিব না!"

"সম্রাজ্ঞী তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন, এবং লেডী প্রিন্সিপালকে তাঁহার নূতন উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন।

"লেডী প্রিন্সিপাল পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন, "আমরা যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্বে পুরুষদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করা উচিত। আমি পর্দার অনুরোধে এই প্রার্থনা করি।" মহারানী উত্তর করিলেন, "অবশ্য! তাহা ত হইবেই।"

"অবলার যুদ্ধযাত্রার কথা শুনিয়া ভদ্রলোকেরা প্রথমে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না; পরে ভাবিলেন, 'মন্দ কি? তাঁহারা আহত এবং অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত ছিলেন—যুদ্ধে আর রুচি ছিল না, কাজেই মহারানীর এই আদেশকে তাঁহারা ঈশ্বর-প্রেরিত শুভ আশীর্বাদ মনে করিলেন। মহারানীকে ভক্তিসহকারে নমস্কার করিয়া তাঁহারা বিনা বাক্যব্যয়ে অন্তঃপুরে আশ্রয় লইলেন! তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে দেশরক্ষার কোন আশা নাই—মরণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। দেশের ভক্তিমতী কন্যাগণ সমরচ্ছলে মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন, তাঁহাদের এ অন্তিম বাসনায় বাধা দেওয়ার প্রয়োজন কি? শেষটা কি হয়, দেখিয়া দেশভক্ত সম্ভ্রান্ত পুরুষগণও আত্মহত্যা করিবেন।

"অতঃপর লেডী প্রিন্সিপাল দুই সহস্র ছাত্রী সমভিব্যাহারে সমর প্রাঙ্গণাভিমুখে যাত্রা করিলেন—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "দেশের পুরুষদিগকে ত পর্দার অনুরোধে জেনানায় বন্দী করিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে পর্দার আয়োজন করিলেন কিরূপে? উচ্চ প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া গুলিবর্ষণ করিয়াছিলেন না কি?"

"না ভাই! বন্দুক-গুলি ত নারী যোদ্ধাদের সঙ্গে ছিল না,—অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা থাকিলে আর বিদ্যালয়ের ছাত্রীর প্রয়োজন ছিল কি? আর শত্রুর বিরুদ্ধে পর্দার বন্দোবস্ত করিবার আবশ্যক ছিল না—যেহেতু তাহারা অনেক দূরে ছিল; বিশেষত তাহারা আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই অক্ষম ছিল।"

আমি রঙ্গ করিয়া বলিলাম,—"হয়ত রণভূমে মূর্তিমতী সৌদামিনীদের প্রভা দর্শনে তাহাদের নয়ন ঝলসিয়া গিয়াছিল—"

"তাহাদের নয়ন ঝলসিয়াছিল সত্য, কিন্তু সৌদামিনীর প্রভায় নয়,—স্বয়ং তপনের প্রখর কিরণে!"

"বটে? কি প্রকারে? আর আপনারা বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ করিলেন কিরূপে?"

"যোদ্ধাদের সঙ্গে সেই সূর্যোত্তাপ-সংগ্রহের যন্ত্র ছিল মাত্র। আপনি কখনও স্টীমারের সার্চলাইট (Search light) দেখিয়াছেন কি?"

"দেখিয়াছি।"

"তবে মনে করুন, আমাদের সঙ্গে অন্যূন দ্বিসহস্র সার্চলাইট ছিল,—অবশ্য সে যন্ত্রগুলি ঠিক সার্চলাইটের মত নয়, তবে অনেকটা সাদৃশ্য আছে; কেবল আপনাকে বুঝাইবার জন্য তাহাকে 'সার্চলাইট' বলিতেছি। স্টীমারের সার্চলাইটে উত্তাপের প্রাখর্য

থাকে না, কিন্তু আমাদের সার্চলাইটে ভয়ানক উত্তাপ ছিল। ছাত্রীগণ যখন সেই সার্চলাইটের কেন্দ্রীভূত উত্তাপ-রশ্মী শত্রুর দিকে পরিচালিত করিলেন,—তখন তাহারা হয়ত ভাবিয়াছিল, একি ব্যাপার! শত সহস্র সূর্য মর্তে অবতীর্ণ! সে উগ্র উত্তাপ ও আলোক সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রুগণ দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পলায়ন করিল! নারীর হস্তে একটি লোকেরও মৃত্যু হয় নাই—একবিন্দু নরশোণিতেও বসুন্ধরা কলঙ্কিত হয় নাই—অথচ শত্রু পরাজিত হইল! তাহারা প্রস্থান করিলে পর তাহাদের সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র সূর্যকিরণে দগ্ধ করা গেল।"

আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিলাম, "যদি বারুদ দগ্ধকালে ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়া আপনাদের কোন অনিষ্ট হইত।"

"আমাদের অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল না, কারণ বারুদ ছিল বহুদূরে। আমরা রাজধানীতে থাকিয়াই সার্চলাইটের তীব্র উত্তাপ প্রেরণ করিয়াছিলাম। তবু অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য জলধর বেলুন সঙ্গে রাখা হইয়াছিল।

"তদবধি আর কোন প্রতিবেশী রাজা মহারাজা আমাদের দেশ আক্রমণ করিতে আইসেন নাই।"

"তার পর পুরুষ-প্রবরেরা অন্তঃপুরের বাহিরে আসিতে চেষ্টা করেন নাই কি?"

"হাঁ, তাঁহারা মুক্তি পাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কতিপয় পুলিশ কমিশনার ও জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এই মর্মে মহারানীসমীপে আবেদন করিয়াছিলেন, যে যুদ্ধে অকৃতকার্য হওয়ার দোষে সমর-বিভাগের কর্মচারীগণই দোষী, সেজন্য তাঁহাদিগকে বন্দী করা ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে; কিন্তু অপর রাজপুরুষেরা ত কদাচ কর্তব্যে অবহেলা করেন নাই, তবে তাঁহারা অন্তঃপুর-কারাগারে বন্দী থাকিবেন কেন? তাঁহাদের পুনরায় স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত করিতে আজ্ঞা হউক।"

"মহারানী তাঁহাদিগকে জানাইলেন, যে যদি আবার কখনও রাজকার্যে তাঁহাদের সহায়তার আবশ্যক হয় তবে তাঁহাদিগকে যথাবিধি কার্যে নিযুক্ত করা যাইবে। রাজ্যশাসন ব্যাপারে তাঁহাদের সাহায্যের প্রয়োজন না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা যেখানে আছেন, সেইখানে থাকুন।

আমরা এই প্রথাকে 'জেনানা' না বলিয়া 'মর্দানা' বলি।"

আমি বলিলাম, "বেশ ত! কিন্তু এক কথা,—পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি ত 'মর্দানায়' আছেন, আর চুরি ডাকাতির তদন্ত এবং হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি অত্যাচার অনাচারের বিচার করে কে?"

"যদবধি 'মর্দানা' প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তদবধি এ দেশে কোন প্রকার পাপ কিম্বা অপরাধ হয় নাই; সেইজন্য আসামী গ্রেফতারের নিমিত্ত আর পুলিশের প্রয়োজন হয় না,—ফৌজদারী মোকদ্দমার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটেরও আবশ্যক নাই।"

"তাই ত, আপনারা স্বয়ং শয়তানকেই[১] শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন, আর দেশে শয়তানী[২] থাকিবে কিরূপে! যদি কোন স্ত্রীলোক কখনও কোন বে-আইনী কাজ করে, তবে তাহাকে সংশোধন করা আপনাদের পক্ষে কঠিন নয়। যাঁহারা বিনা রক্তপাতে যুদ্ধজয় করিতে পারেন,—অপরাধ ও অপরাধীকে তাড়াইতে তাঁহাদের কতক্ষণ লাগিবে?"

অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয় সুলতানা! আপনি এইখানে আরও কিছুক্ষণ বসিবেন, না আমার বসিবার ঘরে চলিবেন?"

আমি সহাস্যে বলিলাম, "আপনার রান্নাঘরটি রানীর বসিবার ঘর অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়! কিন্তু কর্তাদের কাজ বন্ধ করিয়া এখানে আমাদের বসা অন্যায়; আমি তাঁহাদের বে-দখল করিয়াছি বলিয়া হয়ত তাঁহারা আমাকে গালি দিতেছেন।"

আমি ভগিনী সারার বসিবার ঘরে যাইবার সময় ইতস্তত উদ্যানের সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিয়া বলিলাম,—"আমার বন্ধুবান্ধবেরা ভারি আশ্চর্য হইবেন, যখন আমি দেশে গিয়া নারীস্থানের কথা বলিব,—নন্দনকাননতুল্য নারীস্থানে নারীর পূর্ণ আধিপত্য, যৎকালে পুরুষেরা মর্দানায় থাকিয়া রন্ধন করেন, শিশুদের খেলা দেন,—এক কথায় যাবতীয় গৃহকার্য করেন! আর রন্ধন প্রণালী এমন সহজ ও চমৎকার, যে রন্ধনটা অত্যন্ত আমোদজনক ব্যাপার! ভারতে যে সকল বেগম খানম প্রমুখ বড় ঘরের গৃহিণীরা রন্ধনশালার ত্রিসীমায় যাইতে চাহেন না, তাঁহারা এমন কেন্দ্রীভূত সৌরকর পাইলে আর রন্ধনকার্যে আপত্তি করিতেন না!"

"ভারতের লোকেরা একটু চেষ্টা করিলেই সূর্যোত্তাপ লাভের উপায় করিতে পারেন। বিশেষ এক খণ্ড কাঁচ (Convex glass) দ্বারা যেমন রবিকর একত্রিত করিয়া কাগজাদি দগ্ধ করা যায়, সেইরূপ কাঁচ বিশিষ্ট যন্ত্র নির্মাণ করিতে অধিক বুদ্ধি ও টাকা ব্যয় হইবে না।"

"জানেন ভগিনী সারা! ভারতবাসীর বুদ্ধি সুপথে চালিত হয় না—জ্ঞান বিজ্ঞানের সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই। আমাদের সব কার্য্যের সমাপ্তি বক্তৃতায়—সিদ্ধি করতালি লাভে! কোন দেশ আপনা হইতে উন্নত হয় না, তাহাকে উন্নত করিতে হয়। নারীস্থানে কখনও স্বর্ণবৃষ্টি হয় নাই,—কিম্বা জোয়ারের জলেও মণিমুক্তা ভাসিয়া আইসে নাই?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "না।"

"তবেই দেখুন, ত্রিশ বৎসরে আপনারা একটা নগণ্য দেশকে সুসভ্য করিলেন,—না, প্রকৃতপক্ষে দশ বৎসরেই আপনারা এ দেশকে স্বর্গতুল্য পুণ্যভূমিতে পরিণত করিতে পারিলেন। আর আমরা একটি সুসভ্য রত্নগর্ভা দেশকে ক্রমে উন্নত করিব দূরের কথা,— বরং ক্রমশ তাহাকে দীনতমা শ্মশানে পরিণত করিতে বসিয়াছি!"

"পুরুষের কার্যে ও রমণীর কার্যে এই প্রভেদ। আমি যে বলিয়াছিলাম, পুরুষেরা কোন ভাল কাজ সুচারু রূপে করিবার উপযুক্ত নয়, আপনি বোধ হয় এতক্ষণে সে কথাটা বুঝিতে পারিলেন?"

"হাঁ, এখন বুঝিলাম, নারী যাহা দশ বৎসরে করিতে পারে, পুরুষ তাহা শত শত বর্ষেও করিতে অক্ষম! আচ্ছা ভগিনী সারা, আপন ভূমিকর্ষণাদি কঠিন কার্য করেন কিরূপে?"

"আমরা বিদ্যুৎ-সাহায্যে চাষ করিয়া থাকি। চপলা আমাদের অনেক কাজ করিয়া দেয়,—ভারি বোঝা উত্তোলন ও বহনের কার্যও সে-ই করে। আমাদের বায়ু-শকটও তদ্বারা চালিত হয়। দেখিতেছেন, এ দেশে রেল-বর্ত্ম বা পাকা বাঁধা সড়ক নাই, কেবল পদব্রজে ভ্রমণের পথ আছে।"

"সেই জন্য এখানে রেলওয়ে দুর্ঘটনার ভয় নাই—রাজপথেও লোকে শকট-চক্রে পেষিত হয় না। যে সব পথ আছে, তাহা ত কুসুম-শয্যা বিশেষ! বলি,আপনারা কখন কখন অনাবৃষ্টিজনিত ক্লেশ ভোগ করেন কি?"

"দশ এগার বৎসর হইতে এখানে অনাবৃষ্টিতে কষ্ট পাইতে হয় না। আপনি ঐ যে বৃহৎ বেলুন এবং তাঁহাতে সংলগ্ন নল দেখিতে পাইতেছেন,—উহা দ্বারা আমরা যত ইচ্ছা বারিবর্ষণ করিতে পারি। আবশ্যক মত সমস্ত শস্যক্ষেত্রে জলসেক করা হয়। আবার জলপ্লাবনেও আমরা ঈশ্বরকৃপায় কষ্টভোগ করি না। ঝঞ্ঝাবাত এবং বজ্রপাতেরও উপদ্রব নাই।"

"তবে ত এ দেশ বড় সুখের স্থান। আহা মরি! ইহার নাম 'সুখস্থান' হয় নাই কেন? আপনারা ভারতবাসীর ন্যায় ঝগড়া কলহ করেন কি? এখানে কেহ গৃহবিবাদে-সর্বস্বান্ত হয় কি?

"না ভগিনী! আমাদের কোঁদল করিবার অবসর কই? আমরা সকলেই সর্বদা কাজে ব্যস্ত থাকি—প্রকৃতির ভাণ্ডার অন্বেষণ করিয়া নানা প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দতা আহরণের চেষ্টায় থাকি। অলসেরা কলহ করিতে সময় পায়—আমাদের সময় নাই। আমাদের গুণবতী মহারানীর সাধ,—সমস্ত দেশটাকে একটি উদ্যানে পরিণত করিবেন।"

"রানীর এ আকাঙ্ক্ষা অতি চমৎকার! আপনাদের প্রধান খাদ্য কি?"

"ফল।"

"ভাল কথা, আপনারাই ত সব কাজ করেন, তবে পুরুষেরা কি করেন?"

"বড় বড় কলকারখানায় যন্ত্রাদি পরিচালিত করেন; খাতা-পত্র রাখেন,—এক কথায় বলি, তাঁহারা যাবতীয় কঠিন পরিশ্রম অর্থাৎ যে কার্যে কায়িক বলের প্রয়োজন, সেই সব কার্য করেন।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"ওঃ! তাহারা কেরানী ও মুটে মজুরের কাজ করিয়া থাকেন!"

"কিন্তু কেরাণী ও শ্রমজীবী বলিতে ঠিক যাহা বুঝায় এ দেশের ভদ্রলোকেরা তাহা নহেন। তাঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, সুশিক্ষায় আমাদের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহেন। আমরা শ্রম বণ্টন করিয়া লইয়াছি—তাঁহারা শারীরিক পরিশ্রম করেন, আমরা মস্তিষ্কাচালনা করি। আমরা যে সকল যন্ত্রের উদ্ভাবনা বা সৃষ্টি কল্পনা করি, তাঁহারা তাহা নির্মাণ করেন। নরনারী উভয়ে একই সমাজ-দেহের বিভিন্ন অঙ্গ,—পুরুষ শরীর, রমণী মন!"

"তা বেশ! কিন্তু ভারতবাসী পুরুষেরা একথা শুনিলে খড়্গহস্ত হইবেন! তাঁহাদের মতে তাঁহারা একাই এক সহস্র—'তনমন' সব তাঁহারা নিজেই! আমরা তাঁহাদের 'ছাই ফেলিবার জন্য ভাঙ্গাকুলা' মাত্র! আপনাকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না, আপনারা গ্রীষ্মকালে বাড়িঘম ঠাণ্ডা রাখেন কিরূপে? আমরা ত বৃষ্টিধারাকে স্বর্গের অমিয়ধারা মনে করি।"

"আমাদেরও সুস্নিগ্ধ বৃষ্টিধারার অভাব হয় না। তবে আমরা পিপাসা চাতকের ন্যায় জলধরের কৃপা প্রার্থনা করি না; এখানে কাদম্বিনী আমাদের সেবিকা—সে আমাদের

ইচ্ছানুসারে শীতল ফোয়ারার ধরণী সিক্ত করিয়া দেয়। আবার শীতকালে সূর্যোত্তাপে গৃহগুলি ঈষৎ উত্তপ্ত রাখা হয়।"

অতঃপর তিনি আমাকে তাঁহার স্নানাগার দেখাইলেন। এ কক্ষের ছাদটা বাক্সের ডালার মত! ছাদ তুলিয়া ফেলিয়া ইচ্ছামত বৃষ্টি জলে স্নান করা যায়! প্রত্যেকের গৃহপ্রাঙ্গণে বেলুনের ন্যায় বৃহৎ জলাধার আছে,—আদি বেলুনের সহিত ঐ জলাধারগুলির যোগ আছে। আমি মুগ্ধভাবে বলিলাম, "আপনারা ধন্য! স্বয়ং প্রকৃতি আপনাদের সেবাদাসী আর চাই কি! পার্থিব সম্পদে ত আপনারা অতিশয় ধনী: আপনাদের ধর্মবিধান কিরূপ—জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

"আমাদের ধর্ম প্রেম ও সত্য। আমরা পরস্পরকে ভালবাসিতে ধর্মত বাধ্য এবং প্রাণান্তেও সত্য ত্যাগ করিতে পারি না। যদি কালে ভদ্রে কেহ মিথ্যা বলে—"

"তবে তাহার প্রাণদণ্ড হয়?"

"না, প্রাণদণ্ড হয় না। আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টিজগতের জীব হত্যায়— বিশেষত মানব হত্যায় আমোদ বোধ করি না। কাহারও প্রাণনাশ করিতে অপর প্রাণীর কি অধিকার? অপরাধীকে নির্বাসিত করা হয় এবং তাহাকে এ দেশে কিছুতেই পুনঃপ্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না।"

"কোন মিথ্যাবাদীকে কখনও ক্ষমা করা হয় না কি?"

"যদি কেহ অকপট হৃদয়ে অনুতপ্ত হয়, তাহাকে ক্ষমা করা যায়।"

"এ নিয়ম অতি উত্তম। এখানে যেন ধর্মই রাজত্ব করিতেছে। ভাল, একবার মহারানীকে দেখিতে পাইব কি? যিনি করুণাপ্রতিমা, নানা গুণের আধার, তাঁহাকে দেখিতে পুণ্য হয়।"

"বেশ চলুন!" এই বলিয়া ভগিনী সারা যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এক খণ্ড তক্তায় দুইখানি আসন স্ক্রু দ্বারা আঁটা হইল; পরে তিনি কতিপয় গোলা আনিলেন, গোলা কয়টি দেখিতে বেশ চক্‌চকে ছিল; কোন্ ধাতুতে গঠিত তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, আমার মনে হইল উৎকৃষ্ট রৌপ্য-নির্মিত বলিয়া। তিনি আমাকে জিজ্ঞিসা করিলেন, আমার ওজন কত। আমি জীবনে কখনও ওজন হই নাই, কাজেই নিজের গুরুত্ব আমার জানা ছিল না; ভগিনী বলিলেন,—"আসুন তবে আপনাকে ওজন করি। ওজনটা জানা প্রয়োজন।"

আমি ভাবিলাম, একি ব্যাপার! যাহা হউক ওজনে আমি এক মণ ষোল সের হইলাম। শুনিলাম তিনি আটত্রিশ সের মাত্র! তবে ভগিনী সারার অপেক্ষা আর কোন গুণে না হউক, আমি গুরুত্বে বেশি ত!

তারপর দেখিলাম ঐ চক্‌চকে গোলার ছোট বড় দুইটি গোলা এই তক্তায় সংযোগ করা হইল। আমি প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, সে গোলা হাইড্রোজেন পূর্ণ। তাহারই সাহায্যে আমরা শূন্যে উত্থিত হইব। বিভিন্ন ওজনের বস্তু উত্তোলনের নিমিত্ত ছোট বড় বিবিধ ওজনের হাইড্রোজেন গোলা ব্যবহৃত হয়। এখন বুঝিলাম, এইজন্য আমার ওজন অবগত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। অতঃপর এই অপরূপ বায়ুযানে দুইটি পাখার মত ফলা সংযুক্ত হইল, শুনিলাম ইহা বিদ্যুৎ দ্বারা পরিচালিত হয়। আমরা উভয়ে আসনে

উপবেশন করিলে পর তিনি ঐ পাখার কল টিপিলেন। প্রথমে আমাদের 'তখ্‌তে রওয়াঁ' খানি ধীরে ধীরে ৭/৮ হাত ঊর্ধে উত্থিত হইল, তারপর বায়ুভরে উড়িয়া চলিল! আমি ভাবিলাম, এমন জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত দেশের অধীশ্বরীকে দেখিতে যাইতেছি, যদি আমার কথাবার্তায় তিনি আমাকে নিতান্ত মূর্খ ভাবেন—এবং সেই সঙ্গে আমাদের সাধের হিন্দুস্থানকে 'মূর্খস্থান' মনে করেন। কিন্তু অধিক ভাবিবার সময় ছিল না,— সবে তখ্‌তে রওয়াঁ শূন্যে উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে আর অমনই দেখি, আমরা চপলা-গতিতে রাজধানীতে উপনীত! সেই বায়ুযানে বসিয়াই দেখিতে পাইলাম, সখী-সহচরী পরিবেষ্টিতা মহারানী তাঁহার চার বৎসর বয়স্কা কন্যার হাত ধরিয়া উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন। সমস্ত রাজধানী যেন একটি বিরাট কুসুমকুঞ্জ বিশেষ! তাহার সৌন্দর্যের তুলনা এ জগতে নাই!

মহারানী দূর হইতে ভগিনী সারাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, "বা! আপনি এখানে!" ভগিনী সারা রানীকে অভিবাদন করিয়া ধীরে ধীরে তখ্‌তে রওয়াঁ অবনত করিলে আমরা অবতরণ করিলাম।

আমি যথাবিধি মহারানীর সহিত পরিচিতা হইলাম। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হইলাম। আমার যে আশঙ্কা ছিল, তিনি আমাকে কি যে মনে করিবেন, এখন সে ভয় দূর হইল। তাঁহার সহিত রাজনীতি সম্বন্ধে বিবিধ প্রসঙ্গ হইল। বাণিজ্য-ব্যবসায় সম্বন্ধেও কথা উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন, যে অবাধ বাণিজ্যে তাঁহার আপত্তি নাই; "কিন্তু যে সকল দেশে রমণীবৃন্দ অন্তঃপুরে থাকে অথবা যে সকল দেশে নারী কেবল বিবিধ বসন ভূষণে সজ্জিতা হইয়া পুত্তলিকাবৎ জীবন বহন করে,—দেশের কোন কাজ করে না, তাহারা বাণিজ্যের নিমিত্ত নারীস্থানে আসিতে বা আমাদের সহিত কাজ কর্ম করিতে অক্ষম। এই কারণে অন্য দেশের সহিত আমাদের বাণিজ্য-ব্যবসায় চলিতে পারে না। পুরুষেরা নৈতিক জীবনে অনেকটা হীন বলিয়া আমরা তাহাদের সহিত কোন প্রকার কারবার করিতে ইচ্ছুক নহি। আমরা অপরের জমি-জমার প্রতি লোভ করিয়া দুই দশ বিঘা ভূমির জন্য রক্তপাত করি না; অথবা এক খণ্ড হীরকের জন্যও যুদ্ধ করি না,—যদ্যপি তাহা কোহেনূর অপেক্ষা শত গুণ শ্রেষ্ঠ হয়; কিম্বা কাহারও ময়ূর-সিংহাসন দর্শনেও হিংসা করি না। আমরা অতল জ্ঞানসাগরে ডুবিয়া রত্ন আহরণ করি। প্রকৃতি মানবের জন্য তাহার অক্ষয় ভাণ্ডারে যে অমূল্য রত্নরাজি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, আমরা তাহাই ভোগ করি। তাহাতেই আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিই।"

মহারানীর নিকট বিদায় লইয়া আমি সেই সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে গেলাম, এবং কতিপয় কলকারখানা, রসায়নাগার এবং মানমন্দিরও দেখিলাম।

উপরোক্ত দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ পরিদর্শনের পর আমরা পুনরায় সেই বায়ুযানে আরোহণ করিলাম। কিন্তু যেই আমাদের তখ্‌তে রওয়াঁ খানি ঈষৎ হেলিয়া ঊর্ধে উঠিতে লাগিল, আমি কি জানি কিরূপে আসনচ্যুত হইলাম—সেই পতনে আমি চমকিয়া উঠিলাম। চক্ষু খুলিয়া দেখি, আমি তখনও সেই আরাম কেদারায় উপবিষ্টা!

ডেলিশিয়া হত্যা

'হত্যা" শব্দ শুনিয়া পাঠিকা ভগিনী ভয় পাইবে না যে ইহা সত্যই ছোরা তরবারি বা বন্দুক পিস্তল দ্বারা রক্তারক্তি বিশিষ্ট হত্যাকাণ্ড! প্রসিদ্ধা গ্রন্থকর্ত্রী মিস মেরী কলেরী "ডেলিশিয়া হত্যা" নামক এই উপন্যাসখানি লিখিয়াছেন। ডেলিশিয়া কাহিনীর সহিত আমাদের নারী সমাজের এমন চমৎকার সাদৃশ্য আছে যে গ্রন্থখানি পাঠকালে অবাক হইয়া বলিতে ইচ্ছা করে—

"এ পোড়া ভারত অন্তঃপুরের কথা
জানিল কি ছলে মেরী কলেরী!"

অদ্য আমরা ইংল্যান্ডের সামাজিক অবস্থার সহিত আমাদের সমাজের দুরবস্থার তুলনা করিয়া দেখিব, অবলা পীড়নে কোন সমাজ কিরূপ সিদ্ধহস্ত।

ইংরাজ রমণীর জীবন কিরূপ? আমরা মনে করি, তাঁহারা স্বাধীন, বিদুষী, পুরুষের সমকক্ষ, সমাজে আদৃতা,—তাঁহাদের আরও কত কি সুখ সৌভাগ্যের চাকচিক্যময় মূর্তি মানস-নয়নে দেখি। কিন্তু তাঁহাদের গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মারিয়া দেখিতে পাইলে বুঝি সব ফাঁকা! দূরে ঢোল শুনতে শ্রুতিমধুর! সভ্যতা ও স্বাধীনতার লীলাভূমি লন্ডন নগরীতে শত শত "ডেলিশিয়া বধকাব্য" নিত্য অভিনীত হয়! হায়! রমণী পৃথিবীর সর্বত্রই অবলা!!

সংবাদপত্রসমূহে কোন বিখ্যাত ইংরাজ দম্পতীর প্রতিকৃতি দেখিলে আমাদের মনে হয়,— লর্ড অমুক ত বেশ প্রতিপত্তিশালী, জগতের চক্ষে ধাঁ ধাঁ লাগান: কিন্তু লেডি অমুকের বুকখানি চিরিয়া দেখিলে জানিতে পারিতাম তাহাতে সুখ কতখানি!

গ্রন্থকর্ত্রী মেরি কলেরী স্বয়ং অবলা, তাই ডেলিশিয়ার মর্মবেদনা অতি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন। এবং অবলা পাঠিকারাই সম্যকরূপে "ডেলিশিয়া বধের" মর্ম গ্রহণ করিতে পারেন। এই চমৎকার উপন্যাসের অবিকল অনুবাদ করা সহজ ব্যাপার নহে, তবু ইহার গল্পাংশের অনুবাদ পাঠিকা ভগিনীদিগকে উপহার দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

গ্রন্থকর্ত্রী উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন, সামাজিক সত্য ঘটনা অবলম্বনে তিনি "ডেলিশিয়া" চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। অনেক সত্য ঘটনা আমাদেরও জানা আছে, আমরা ভারতের সেই প্রপীড়িতা অবলাদের একটি নমুনা (Representative) চরিত্রের নাম রাখিলাম "মজলুমা"। "ডেলিশিয়া"র প্রতিছত্রে প্রতিবর্ণে যেন "মজলুমারই চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে!

"মজলুমা" চিত্রটি ডেলিশিয়া চিত্রের পাশাপাশি অঙ্কিত করিয়া দেখাইব। ইংল্যান্ডের নারী সমাজের সহিত ভারত ললনা সমাজের কি চমৎকার সাদৃশ্য। আর কোথায় কি প্রকার পার্থক্য আছে, তাহাও দেখা যাইবে।

ডেলিশিয়া স্বাধীনা, রাজার জাতি এবং অন্তঃপুর-বন্দিনী নহেন; আর মজলুমা পরাধীনা, প্রজার জাতি এবং কঠোর অপরাধে বন্দিনী, কিন্তু উভয়ের অবস্থাগত পার্থক্য কতটুকু? অধিক নয়,—উভয়ে অবলা! উভয়ই সমাজের অত্যাচারে মর্মপীড়িতা! কিন্তু ডেলিশিয়া বিদুষী এবং মজলুমা নিরক্ষর—এই একটা ভারি পার্থক্য আছে। সুশিক্ষিতা

ডেলিশিয়া জীবন-সমর প্রাঙ্গণে অমিততেজা বীরার ন্যায় (স্বামীরূপ) গুপ্ত ঘাতকের শরাঘাতে নিহতা হয়, যৎকালে অশিক্ষিতা মজলুমা নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় অত্যাচারী স্বামীর পদতলে মর্দিতা হইয়া প্রাণত্যাগ করে! তেজস্বিনী ডেলিশিয়া পিস্তল হস্তে স্বামীকে স্পষ্ট বলিলেন, "তুমি আমার নিকট আর এক পদ অগ্রসর হইলে আমি তোমাকে গুলি করিব!" অভাগিণী মজলুমা সেরূপ কথা বলিবেন দূরে থাকুক—তিনি বরং অত্যচারীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া নাকিকান্না ধরিবেন—বলিবেন, "প্রভো! দাসীর কি অপরাধ হইয়াছে?" অথবা "দাসীর প্রতি সদয় হও!" শেষে অশ্রুধারায় শ্রীচরণ যুগল ধুইতে বসিয়া পুনঃ পুনঃ পদাঘাত লাভ করিবেন—ডেলিশিয়া ও মজলুমায় এই প্রভেদ।

ডেলিশিয়ার আত্মমর্যাদা জ্ঞান আছে, মজলুমার তাহা নাই। নির্যাতিত প্রপীড়িত হইলেও ডেলিশিয়ায় কেমন একপ্রকার মহীয়ান গরীয়ান ভাব আছে অত্যাচারী কর্তৃক তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইতেছে কিন্তু অবনত হইতেছে না। তিনি গর্বোন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া মরিবেন, কিন্তু নতশিরে যুক্ত করে প্রাণ ভিক্ষা চাহিবেন না। এই মহান ভাবটা যেন মজলুমার নাই। ইহার কারণ এ দেশের স্ত্রীশিক্ষার অভাব। মজলুমা ভূমিষ্ঠা হইয়াই শুনিতে পায়, "তুই জন্মেছিস গোলাম; চিরকাল থাকবি গোলাম।" সুতরাং তাহার আত্মা পর্যন্ত গোলাম হইয়া গিয়াছে। সে আর নিজের মূল্য জানে না—পুরুষ আত্মীয়দের কর্তৃক বারম্বার পদদলিত হইলেও সে তাহাদের পদ-লেহনে বিরত হয় না। স্বাধীনা ডেলিশিয়ায় ও পরাধীনা মজলুমায় এই প্রভেদ।

এ দেশের গ্রন্থকারেরা নারীচরিত্রকে নানা গুণ ভূষায় সজ্জিত করেন বনেট, বেশির ভাগে অবলা হৃদয়ের সহিষ্ণুতা বর্ণনা করা হয় (কারণ রমণী পাষাণ প্রায় সহিষ্ণু না হইলে তাহার প্রতি অত্যাচারের সুবিধা হইত না যে!) কিন্তু এ সব পুস্তকে নায়িকার আত্ম-গরিমার অস্তিত্ব দেখা যায় না।

এখন ডেলিশিয়া কাহিনীর গল্পাংশ অনুবাদ করা যাউক ঃ

ডেলিশিয়া বাল্যকাল হইতে সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন। যখন তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৭ বৎসর ছিল। তাঁহার উৎকৃষ্ট র. সমগ্র পাঠক সমাজে যথেষ্ট আদৃত হইত। এইরূপে প্রতিভাশালিনী ডেলিশিয়া বেশ সুখ্যাতি লাভ করিলেন, এবং পুস্তক বিক্রয়ের ফলে যথেষ্ট অর্থলাভও করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সঙ্গে তাঁহার অনেক শত্রুরও সৃষ্টি হইল। দেশের অপর লেখকবৃন্দ হিংসায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মতে পুস্তক রচনা কেবল পুরুষের কার্য। রমণীগণ কেবল নানা প্রকার বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া বিলাস পঙ্কে নিমজ্জিতা থাকিবে! আর যদি একান্ত প্রয়োজন হয় তবে যে নারীর বয়স নাই, রূপ নাই—সে অতি বিশ্রী কদাকার কুৎসিত, সেই লেখনী ধারণ করুক! ডেলিশিয়ার ন্যায় নিরুপমা রূপসী কিশোরী তাঁহাদের যশোপ্রভা ম্লান করিবে, ইহা যে একেবারে অসহ্য!

সাতাইশ বৎসর বয়ঃক্রমে ডেলিশিয়ার বিবাহ হয়। এ দীর্ঘ দশ বৎসর পর্যন্ত প্রতিভাশালিনী, অর্থশালিনী, সৌন্দর্যের রানী ডেলিশিয়া যে অবিবাহিতা ছিলেন, তাহার কারণ প্রধানত এই যে সাধারণ পুরুষ সমাজ তাঁহাকে কেমন এক প্রকার ভয়, ভক্তি ও স্থলবিশেষে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। নিজের বেশভূষার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসিনী, সতত

পুস্তক রচনায় নিযুক্তা রমণীকে বিবাহ করিয়া দাম্পত্য জীবনে সুখী হতেই পারিবেন, এরূপ ভরসা হয় ত কেহ করিতে পারেন নাই। (আমাদের দেশে ত "পুস্তক লেখিকা" নাই বলিলেই হয়, তবু "পুস্তক পাঠিকাকে" ও "নভেল পাণি" জ্ঞানে অনেকে বিবাহ করিতে সঙ্কুচিত হন?)

মিস্টার উইলফ্রেড কারলীঅন উচ্চবংশ জাত সুপুরুষ ছিলেন। তিনি পিতার ইচ্ছায় সৈনিক বিভাগে কর্ম গ্রহণ করেন। 'ছিল' বলিতে মিঃ কারলীঅনের ছিল ছয় ফিট দীর্ঘাকৃতি, সৌম্যমূর্তি আর বনিয়াদী বংশ মর্যাদা। আর এত অল্প যে তাহা ধর্তব্য নহে। মিঃ কারলীঅন দেখিলেন, ডেলিশিয়া শিকার মন্দ নহে। একে ত তিনি আভরণহীনা গোলাপ মুকুল; দ্বিতীয়তঃ বিপুল অর্থশালিনী। অবশেষে একদিন ডেলিশিয়ার জন্য সেই শুভ মুহূর্ত আসিল—যে মুহূর্ত মানবজীবনে (? না, নারীজীবনে) মাত্র একবার আইসে; যাহা ভগ্ন তরঙ্গের বাষ্পকণার মত ক্ষণস্থায়ী,—যাহা আকাশে উল্কার ন্যায় প্রতিভাত হয়—চাহিয়া দেখিতে না দেখিতে চির অন্তর্হিত হয়! ডেলিশিয়ার জীবনে সেই স্মরণীয় মুহূর্ত আসিল। সেদিন ডেলিশিয়া কোন বড় লোকের গৃহে নৈশভোজে অতিথি ছিলেন; মিঃ কারলীঅনও তথায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

"ডেলিশিয়া!" মিঃ কারলীঅন ডেলিশিয়ার হস্ত ধারণ করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "ডেলিশিয়া, আমি তোমায় ভালবাসি!"

*

ডেলিশিয়ার বিবাহের দিন গীর্জার বাহিরে অনেক লোক সমবেত হইয়াছিল—একপক্ষে যুদ্ধবেদতা অপর পক্ষে সাহিত্যের দেবী—এ বিবাহকে কার্তিক এবং সরস্বতীর মিলন বলা যাইতে পারে—এ নব দম্পতিকে দেখাই চাই। জনতায় অনেকে যে পুষ্প বর্ষণ করিয়াছিল, তাহার অধিকাংশ ডেলিশিয়া প্রাপ্ত হইলেন।

সচরাচর বলা হয়, "বর কন্যাকে বিবাহ করিল" কিন্তু এক্ষেত্রে বলিতে হইবে,—কন্যা বরকে বিবাহ করিলেন। কারণ ডেলিশিয়াই মিঃ কারলীঅনের অন্ন বস্ত্র ইত্যাদি যোগাইবার ভার লাইলেন। মজলুমার বেলায় আবার এরূপ বলা খাটে না, সেস্থলে বলিতে হইবে,—"জমিদারী ধন দৌলত সহ দাসী স্বামীর চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন!" ফল কথা, ডেলিশিয়া মধু মুক্ষিকার ন্যায় মধু আহরণ করিয়া মধুচক্র নির্মাণ করিতে লাগিলেন আর তাঁহার স্বামী নিষ্কর্মা (Drone) মক্ষীর ন্যায় মধু ভোগ করিতে লাগিলেন।

বিবাহের দিন অলঙ্কার বলিতে ডেলিশিয়া এক গুচ্ছ সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পমাত্র পরিয়াছিলেন। ইহাতে রমণী মণ্ডলী বিস্মিত হইলেন। নরপরিণীতা ডেলিশিয়ার গায় গহনা নাই! কি আশ্চর্য! ওমা! ঠিক যেন আমাদেরই নারীসমাজ! ৫/৭ জন প্রবীণা নবীনা একত্র হইলে, তাঁহারা কেবল অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচার করেন! যেই কোন নববধূ আইসে, উপস্থিত রমণীবৃন্দ অমনি তাহার নাক কান ও গলদেশের খানাতল্লাসী আরম্ভ করে—কোথায় কি গহনা আছে। কর্ণাভরণ দেখিবার জন্য বেচারীর কান লইয়া যত টানাটানি হয়, তাহা বর্ণনাতীত! ভারত বধূর ন্যায় ডেলিশিয়ার কান ধরিয়া টানাটানি হয় নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার কর্ণকুহর (শ্রবণশক্তি) লইয়া মুখরাগণ যথেষ্ট টানাটানির প্রয়াস পাইয়াছিলেন!

প্রৌঢ়া মহিলা সমাজ আন্দোলন আলোচনা করিতে লাগিলেন যে বেচারা কারলীঅন এমন সুশ্রী সুপুরুষ-তিনি বিবাহ করিলেন একটা "স্ত্রী গ্রন্থকর্ত্রী"কে ("female authoress")!

পক্ষান্তরে মিঃ কারলীঅন বন্ধু মহলে ডেলিশিয়া সম্বন্ধে বলিতেন, "তিনি স্বাভাবিক গোলাপফুল—কৃত্রিম রঙ, কলপ, পরচুলা (যাহা স্ত্রী কয়েদীদের মাথা হইতে কাটিয়া লইয়া বাজারে বিক্রয় করা হয়), এসেন্স, পাউডার—এ সকল কিছুরই ধার ধারেন না।" তচ্ছ্রবনে জনৈক বন্ধু বলিলেন, "ভাগ্যবান কুকুর (lucky dog)! তুমি এমন পুরস্কারের যোগ্য নহ।"

"সম্ভবত নহি, কিন্তু—" বলিল মিঃ কারলীঅন বন্ধুর দিকে মধুর দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই চাহনীতেই তাঁহার কথার বাকি অংশ সমাপ্ত হইল। তিনি তাঁহার ঐ সুন্দর কটাক্ষ বাণেই ত ডেলিশিয়াকে বিদ্ধ করিয়াছেন। বন্ধুগণ আমোদ করিয়া তাঁহাকে "বিউটি কারলীঅন" ("Beauty Carlyon") বলিয়া ডাকিতেন।

ডেলিশিয়ার বিবাহ জীবনের প্রায় তিন বৎসর একরূপ নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। তিনি সামাজিক আমোদ উৎসবে বড় একটা যোগদান করিতেন না; অধিকাংশ সময় সাহিত্য সেবায় যাপন করিতেন। লেখকেরা নির্জনতাই ভালবাসে। যে আধ্যাত্মিক ভাবের আস্বাদ পাইয়াছে, সে বহির্জগতের অন্তঃসারহীন আমোদ আহ্লাদে বৃথা সময় নষ্ট করিতে চাহে না। উইলফ্রেড কারলীঅন কিন্তু "বল" নৃত্য প্রভৃতি যাবতীয় অসার আমোদ বড় ভালবাসিতেন। তিনি প্রায় প্রতিদিনই দুই-তিনটা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন।

এই সময় ডেলিশিয়ার সুখের বাসায় এক স্ফুলিঙ্গ অগ্নি আসিয়া পড়িল। তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না। অগ্নিকণা তাঁহার অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে দাহক্রিয়া আরম্ভ করিল!

দুই-একজন পরিচিত লোক তাঁহাকে ঐ অগ্নির বিষয় জানাইতে চেষ্টা করিলেন, ডেলিশিয়া তাহা শুনিলেন না। তিনি ভাবিলেন, "লোকগুলা অনর্থক আমাদের দাম্পত্যজীবনে অশান্তি আনিতে চায়। পরনিন্দা করিয়া উহারা কি সুখ পায়?" তিনি সময়ে সাবধান হইলে হয়ত অভিনয় এতদূর গড়াইত না। স্বামীকে সংশোধন করিয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু স্বামীর প্রতি অন্ধ অনুরাগবশত তিনি তাঁহাকে সন্দেহ করিতে পারিলেন না।

মিঃ কারলীঅন একদিন বলিলেন, "সাহিত্য-সেবিকা মহিলারা কোনরূপ উপাধিপ্রাপ্ত হয় না, ইহা বড় অন্যায় এবং দুঃখের বিষয়।...যাহা হউক, ডেলিশিয়া, আমি তোমাকে একটি উপাধি দিতেছি—আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হওয়ায় এখন আমি প্রৈত্রিক লর্ড উপাধির উত্তরাধিকারী হইয়াছি।

ডেলিশিয়া ফাঁকা উপাধি প্রাপ্তিতে হাসিয়া ফেলিলেন। বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন,—

"প্রভো! আমি আপনার দীনতমা সেবিকা!"

লেডি শব্দ কি ডেলিশিয়ার সম্মান বৃদ্ধি করিবে? তিনি লেখিকারূপে যে যশোলাভ করিয়াছেন, তাহার তুলনায় এ লেডী পদবী কি? অমন কত লেডী জগতে অপরিচিত অবস্থায় মরে বাঁচে, তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু "গ্রন্থকর্ত্রী ডেলিশিয়া" নামটি অমর থাকিবে।

আর একদিন লর্ড কারলীঅন বলিলেন, "আমি মনে করি সেই প্রাচীন কাল ভাল ছিল।"

বটে? যখন পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধা রাখিত—যেমন গবাদি পশুকে খোঁয়াড়ে রাখা হয়—এবং তাহাদের বিবেচনায় যতটুকু খাদ্য রমণীদের পাওয়া উচিত মনে করিত, তাহাই তাহাদের দিত—আর নারীগণ অবাধ্য হইলে তাহাদের প্রহার করিত? হইতে পারে, সে কাল সুখের ছিল, কিন্তু আমি তাহার পক্ষপাতী নহি। আমি জগতের ক্রমোন্নতি দেখিতে চাই— আমি চাই সভ্যতা—যাহাতে নারী ও পুরুষ সুশিক্ষা লাভ করে।"

*

কারলীঅন বলিলেন, "আমার মতে উন্নতি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। আমি ইহার গতি মন্দ হওয়ার পক্ষে ভোট দিতে চাই।"

পরশ্রীকাতর লোকেরা কাহারও সুখ সুখ্যাতি সহ্য করিতে পারে না। ডেলিশিয়ার দাম্পত্য-জীবন মোটের উপর অত্যন্ত সুখের ছিল—তিনি কেবল একবার একটি শিশুর মৃত্যুশোক পাইয়াছিলেন, এ শোক ত পাবক—ইহাতে হৃদয় পবিত্র হয়। জননী হৃদয়ের ঐ জ্বালাটুকু ব্যতীত তাঁহার জীবনে আর কোন অশান্তি বা দুঃখ ছিল না। সাহিত্য-জগতেও তিনি বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এতখানি সুখ হিংসুকের সহ্য হইবে কেন? তাহারা ছিদ্রান্বেষণের চেষ্টায় ছিল। ডেলিশিয়া সংসার চিনিতেন, তাই সতর্কতাবশত লোকনিন্দায় কর্ণপাত করিতেন না। তিনি নিন্দুকের মিথ্যা নিন্দা এড়াইতে গিয়া বন্ধুর কথায়ও কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার ন্যায় সতী লক্ষ্মীর স্বামী পথভ্রষ্ট হইতে পারে, তাঁহার ধারণার অতীত ছিল। আহা! তাঁহার কি সরল বিশ্বাস ছিল।

তাঁহার জনৈক বন্ধু মিঃ পল ভাল্‌ডিস্ নানা ইঙ্গিতে ডেলিশিয়াকে সতর্ক করিতে চাহিলেন, তাহাতে ডেলিশিয়া চটিলেন! মিঃ ভাল্‌ডিস্ ডেলিশিয়ার প্রিয় কুকুর স্পার্টানের গায় সাদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "লেডি কারলীঅন, আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু বলিতে এখন কেবল একজন আছে।"

ডেলিশিয়া উত্তর করিলেন, "আপনি স্পার্টানের কথা বলেন, না আপনার নিজের?"

ভাল্‌ডিস্ বলিলেন, "স্পার্টানের কথা বলি!"

ক্রমে কথা প্রসঙ্গে যখন মিঃ ভাল্‌ডিস্ বলিলেন, লর্ড কারলীঅন নগণ্য,—কিছুই নহেন, তখন ডেলিশিয়া বিরক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ মিঃ ভাল্‌ডিস্‌কে বিদায় দিলেন। তাই তা, পতিপ্রাণা সতী কি পতিনিন্দা সহিতে পারেন?

ডেলিশিয়ার ব্যবহারটা যেন স্পার্টানের পছন্দ হইল না—সে তাঁহার মুখ দেখিতে লাগিল। সে চাহনির অর্থ এই—"তুমি মিঃ ভাল্‌ডিস্‌কে তাড়াইয়া দিলে কেন? তিনি আমার পরম বন্ধু।" ডেলিশিয়া কুকুরের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "স্পার্টান! তিনি আমাদের প্রভুর নিন্দা করিতেছিলেন যে। তাঁহাকে আর আমরা নিকটে আসিতে দিব না।" স্পার্টান কিন্তু কর্ত্রীর এ কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইল না।

যাহাদের কবিতা, রচনা প্রভৃতি ডেলিশয়ার গ্রন্থের ন্যায় আদৃত হইত না, তাহারা হিংসায় দগ্ধ হইতে লাগিল। "হোমেমিয়ান" ক্লাবে ৮/১০ জন ভদ্রলোক একত্র হইলে তাঁহাদের অধিকাংশ লোক ডেলিশিয়া নিন্দা করিয়া হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করিতেন। একজন কবি বলিলেন, "স্ত্রীলোকে এমন লিখিতে পারিবে কেন,—অধিকাংশ পুস্তক তাঁহার স্বামী লিখিয়া দেন।" মিঃ ভাল্‌ডিস্ বলিলেন,—"মিথ্যা কথা। তাঁহার স্বামী আপনারই মত মস্ত গাধা!"

"আপনি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিলেন মিস্টার ভাল্‌ডিস্! আর আমাকে গাধা বলিতেও ছাড়েন নাই!"

ভাল্‌ডিস্ বলিলেন, "হ্যাঁ। আমি লর্ড কারলীঅনের স্বহস্ত-লিখিত পত্র দেখিয়াছি; তিনি প্রতি শব্দে বানান ভুল করেন, প্রতি ছত্রে ব্যাকরণের মুণ্ডপাত করেন। আপনি যদি মনে করেন যে এই বিদ্যা লইয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীর পুস্তক লিখেন, তবে আপনি অবশ্যই গাধা! কিন্তু আপনি বাস্তবিক তাহা মনে করেন না, কেবল একজন মহিলার যশোপ্রভা দর্শনে হিংসাদগ্ধ হইয়া এমন কথা বলেন।"

কতক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডার পর কবি বলিলেন, "জানেন মিঃ ভাল্‌ডিস্ লেখনীর ধার অসির অপেক্ষা তীক্ষ্ণ!"

ভাল্‌ডিস্ তুচ্ছভাবে হাসিয়া বলিলেন, "ওহো! বুঝিলাম, আপনি অর্ধপেনী মূল্যের সংবাদপত্রে আমাকে গালি দিবেন।"

*

একদা ডেলিশিয়া তাঁহার প্রভুর জন্য অনেকগুলি জিনিস ক্রয় করিতে দোকানে গিয়াছেন। লর্ডের ফরমাইশ ছাড়া আরও বিশেষ কোন বস্তু ক্রয় করিবারও ইচ্ছা ছিল। তাঁহাদের বিবাহের বার্ষিক উৎসব হইবে, সেই শুভদিনে তিনি লর্ড কারলীঅনকে কিছু উপহার দিবেন। প্রেম ত অশরীরী, তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য জড়বস্তুর অবলম্বনই চাই। পতিব্রতা সতী তাঁহার অকৃত্রিম পতি-ভক্তি একটি অঙ্গুরীয় বা একসেট বোতামের আকারে স্বামীকে উপহার দিবেন। এ দোকান সে দোকান ঘুরিয়া একস্থানে জানালার বাহির হইতে একজোড়া বোতাম দেখিয়া ডেলিশিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

বোতাম ক্রয়ের নিমিত্ত ডেলিশিয়া সেই দোকানে প্রবেশ করিলেন। মণিকার তাঁহাকে ধনবতী ভাবিয়া সযত্নে অনেক মণিমুক্তার অলঙ্কার দেখাইতে আরম্ভ করিল। ডেলিশিয়া মাত্র সেই বোতাম পছন্দ করিলেন, আর কিছু ক্রয় করিলেন না।

এত অল্প বিক্রয়ের পর জহুরী ক্রেতাকে সহজে নিষ্কৃতি দিবে কেন? সে বহুমূল্য রত্নভাণ্ডার খুলিয়া তাঁহাকে দেখাতেই লাগিল। তন্মধ্যে হীরকখচিত একটি কপোতাকৃতি "যুগ্‌নু" বড় সুন্দর ছিল। কপোতের চঞ্চুপুটে একটি স্বর্ণলিপি এবং সেই স্বর্ণপত্রে একটি শ্লোক (মটো) পদ্মরাগে খচিত ছিল। ডেলিশিয়া সেইটি হাতে লইয়া বলিলেন, "এ যুগ্‌নুটি ত বড় চমৎকার! ইহাতে কবিত্ব ও শিল্প নৈপুণ্য দুইই আছে।

"হ্যাঁ, কিন্তু এটি বিক্রয় হইবে না। ইহা লর্ড কারলীঅনের বিশেষ ফরমাইশ অনুসারে নির্মিত হইয়াছে।"

ডেলিশিয়া ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। এবার হয়ত বিবাহের বার্ষিক উৎসবের দিন লর্ড কারলীঅন ডেলিশিয়াকে এই যুগ্‌নু উপহার দিবেন; তিনি কিছু বলিবার পূর্বেই মণিকার যুগ্‌নুটি ডিবে হইবে বাহির করিয়া সূর্য কিরণে ধরিল—যাহাতে মণিগুলি বেশ ঝলমল করে! সে ডেলিশিয়াকে চিনিত না। বেশ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া যাইতে লাগিল—

"এ কপোতের জন্য লর্ড কারলীঅনকে পাঁচশত পাউন্ডের কিছু বেশি (প্রায় ৮০০০ টাকা)[২] দিতে হইবে। তা ভদ্রলোকে যখন কোন মহিলা বিশেষকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন, তখন এরূপ ব্যয়বাহুল্যে কুণ্ঠিত হন না। এক্ষেত্রে সে মহিলাটি যে কারলীঅনের পত্নী নহেন, তাহা অবশ্যই আপনি বুঝিতে পারেন।"

ডেলিশিয়া বলিলেন, "আমি সেরূপ কিছু মনে করিব কেন? আমি ত বুঝি ইহাই স্বাভাবিক যে কোন ভদ্রলোক তাঁহার সহধর্মিনীকে উপহার দিবার জন্য এরূপ যুগ্‌নু নর্মাণ করাইবেন।"

জহুরী বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "বটে? কিন্তু ফলত আমরা ইহাই দেখিতে পাই যে যখনই কোন ভদ্রলোক কোন বিশেষ ফরমাইশ দেন, সে বস্তু কখনই তাঁহার ধর্মপত্নীর হাতে পড়ে না। আমরা সর্বদাই ইহাতে দুঃখিত হই, যে আমাদের অতি যত্নে প্রস্তুত অলঙ্কারসমূহ মহিলারা প্রাপ্ত হন না।....নচেৎ এই বহুমূল্য হীরককপোতটি কেন লেডী কারীঅনের নিকট না যাইয়া নর্তকী লা-মেরিনার নিকট যাইতেছে?"

অ্যাঁ! মণিকার এ কি বলিল? ডেলিশিয়ার মাথা ঘুরিয়া গেল!

*

শেষে জহুরী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি লেডী কারলীঅনের গ্রন্থাবলি পাঠ করিয়াছেন কি? তিনি সাহিত্য জগতে 'ডেলিশিয়া ভাগ্‌ন্' নামে পরিচিতা।"

ডেলিশিয়া বলিলেন,—"হাঁ—মনে হয়, পড়িয়াছি।"

জহুরী। তা বেশ। তিনি বাস্তবিক অতি যশস্বিনী রমণী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার স্বামী তাঁহার বিষয় একটুও ভাবে না।...শুনিতে পাই লর্ড কার্‌লীঅন্ যে টাকার এমন অপব্যয় করেন, তাহা তাঁহার পত্নীর; তাঁহার নিজের এক পয়সাও নাই। যদি একথা সত্য হয় তবে কি লজ্জার বিষয়! অবশ্য লেডী কার্‌লীঅন্ না জানিয়াই মেরিনার অলঙ্কারের মূল্য দিয়া থাকেন!...তবে আপনি এই বোতামজোড়া লইবেন ত?

ডেলিশিয়া, হাঁ, ধন্যবাদ। এগুলি ভদ্রলোককে উপহার দিবার উপযুক্ত।

জহুরী ঠিক। ইহার কারুকার্যে প্রগল্‌ভতা মোটেই নাই, অথচ সৌন্দর্য আছে। ইহা ভদ্রলোকের উপযুক্ত, সন্দেহ নাই, কিন্তু (ঈষৎ হাস্য) 'ভদ্রলোক' ক্রমেই বিরল হইতেছেন!

ডেলিশিয়া স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে মণিকারের সমুখাৎ অনেক কথাই শুনিলেন। যে কথা তিনি বন্ধুবান্ধবকে বলিতে দিতেন না,—মণিকার সেই কথা অতি নিষ্ঠুরভাবে শুনাইয়া তাঁহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিল!

এই চিত্র বঙ্গ-ললনার কেমন বোধ হয়? ইহা কি দর্পণের ন্যায় মজলুমার মূর্তি প্রতিবিম্বিত করে না? মজলুমার কণ্ঠ হইতে কণ্ঠহার মোচন করিয়া কোন বিলাসিনীকে না পরাইলে আর পুরুষপ্রবরের বাহাদুরী কি?

বাড়ি ফিরিয়া ডেলিশিয়া তাঁহার স্বামীর টেলিগ্রাম পাইলেন—"ডিনারের সময় ফিরিব না; আমার জন্য অপেক্ষা করিও না।"

ক্রোধে ক্ষোভে জর্জরিত ডেলিশিয়া স্বীয় পাঠাগারের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিলেন, সঙ্গে কেবল স্পার্টান ছিল। তাহাকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন,—স্পার্টান, মনে হয় আমি যেন বিষ খাইয়াছি।—"

স্পার্টান সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল, তাহার সেই নির্বাক দৃষ্টি যেন বলিতেছিল, "তুমি মানুষকে বিশ্বাস কর কেন? কুকুরজাতি পুরুষাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য!"

স্পার্টান ডেলিশিয়ার ভালবাসার যতখানি প্রতিদান দিতেছিল, লর্ড কারলীঅন ততটুকুও দিতে পারিলেন না। ডেলিশিয়া নানা চিন্তা করিতেছিলেন, তাঁহার কঠোর শ্রমার্জিত টাকাগুলি লা-মেরিনাকে অলঙ্কার পরাইতে ব্যয়িত হইবে, ইহা কি ন্যায়সঙ্গত?

ডেলিশিয়ার টাকায় ও মজলুমার টাকায় প্রভেদ আছে। মজলুমার যে টাকা অত্যাচারী কর্তৃক অপব্যবহৃত হয়, সে টাকা মজলুমার স্ব-উপার্জিত নহে,—তাহা তাঁহার পূর্বপুরুষের সঞ্চিত—অর্থাৎ পুরুষেরই উপার্জিত। একজন পুরুষের সঞ্চিত ধণ অপর পুরুষে ধ্বংস করে, ইহা বরং সহ্য হয়। কিন্তু ডেলিশিয়ার স্ব-উপার্জিত টাকায় অপব্যবহার অসহ্য—এরূপ কাপুরুষতা ক্ষমাযোগ্য নহে। এ বিষয়ে মজলুমার তুলনায় ডেলিশিয়ার অবস্থা অধিক শোচনীয়। অথচ ইংরাজ সমাজ সভ্যতার দাবি করে! ইহাই কি সভ্যতা! ইহাই কি শিভালরী?

ডেলিশিয়া বলিলেন, "আমার একটি প্রতিমা স্বর্ণবেদিত স্থাপিত ছিল,—অদ্য তাহা বেদিভ্রষ্ট হইয়াছে; মূর্তিটা এখনও ভাঙ্গিয়া যায় নাই কেবল ভূমিতলে পড়িয়া আছে।"

মূর্তির পতনের সহিত ডেলিশিয়ার প্রেমের মৃত্যু হইল। অদৃষ্টের কি নিদারুণ পরিহাস,—ভাবিতে হৃদয় দ্বিধা হয়—কোথায় সে বিবাহের সাম্বৎসরিক উৎসব, কোথায় এ প্রেমের সমাধি!

লর্ড কারলীঅন প্রায় ১টা রাত্রিতে বাড়ি ফিরিলেন। প্রায় সব কক্ষই অন্ধকার দেখিয়া ভারি বিরক্ত হইলেন। ডেলিশিয়ার অত্যধিক আদর যত্নে তিনি 'আদুরে' হইয়া উঠিয়াছিলেন! এ সামান্য অবহেলায় তাঁহার মানহানি হইল যে! প্রতি রাত্রি তাঁহার অপেক্ষায় আলো জ্বালিয়া রাখা হইত, অদ্য অন্ধকার কেন? তিনি নিজেই টেলিগ্রাফে অপেক্ষা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সে কথা ভুলিয়া গেলেন! না, তাঁহার ভাবটা এই—আমি নিষেধ করিলেও ডেলিশিয়ার অপেক্ষা করা উচিত ছিল!

তিনি ডেলিশিয়ার শয়নকক্ষের দ্বারে আঘাত করিয়া সাড়া শব্দ না পাওয়ায় বিরক্ত হইলেন! এত শীঘ্র ডেলিশিয়া ঘুমাইয়াছেন? তিনি সর্বদাই প্রভুর অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতেন,—অদ্য এ অনাদর কেন?

তিনি অধীরভাবে পুনঃ পুনঃ দ্বারে আঘাত করায় স্পার্টান বিরক্তির সহিত উঠিয়া বলিল,—"গোঁ—! সে কর্ত্রীর শয়নকক্ষের বর্হিদ্বারে শয়ন করিয়াছিল। তাহার বাক্‌শক্তি থাকিলে বোধ হয় সে স্পষ্টই বলিত, "পাজি! তুমি এখানে কেন? কর্ত্রী ঘুমাইতেছেন, তাঁহাকে বিরক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। যাও তুমি জাহান্নামে!" স্পার্টানের সেই অব্যক্ত

গোঙানিতে সত্যই কারলীঅন যেন অপমান বোধ করিলেন! তিনি কুকুরকে ধমক দিয়া আপন কক্ষে চলিয়া গেলেন।

অদ্য তাঁহার মনটা খারাপ ছিল—তিনি জুয়াখেলায় অনেক টাকা (ডেলিশিয়ার টাকা) হারিয়াছেন; লা-মেরিনাও ভাল ব্যবহার করে নাই। এখন ডেলিশিয়ার দু'টি মধুমাখা কথা শুনিলে প্রাণটা শীতল হইত; তা ডেলিশিয়ার যে গাঢ়নিদ্রা—!

পরদিন প্রভাদে ডেলিশিয়া অশ্বারোহণে বেড়াইয়া আসিলেন। গৃহে ফিরিয়া শুনিলেন, লর্ড তখনও নিদ্রিত। প্রাতঃকালীন মুক্ত বায়ুসেবনে তাঁহার মন প্রফুল্ল হইয়াছি, এখন মনে হইল, বন্ডস্ট্রীটে মণিকারের নিকট যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহা দুঃস্বপ্নমাত্র! প্রিয়জনের বিরুদ্ধে কোন অপ্রিয় কথা সহজে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না—লোকে যথাসাধ্য আত্ম-প্রবঞ্চনা করিয়া সুখী থাকে! ডেলিশিয়া রমণী বই ত নহেন!

এতক্ষণে উঠিলে? গতরাত্রে অনেক বিলম্বে আসিয়াছিলে, না?"

লর্ড কিন্তু এ কথায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তাঁহার মনে হইল,—অদ্য ডেলিশিয়ার কি যেন নাই! কেন? লর্ড সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন, কেন? ডেলিশিয়া অতি সাবধানে দূরে দূরে থাকিতেছেন, কেন? ডেলিশিয়ার মৃদুহাস্যটুকুতে যেন প্রাণ নাই! যদিও তাঁহার ব্যবহারের কোন ত্রুটি ধরা যাইতে পারে না, তবু ডেলিশিয়ার ভাবটা যেন প্রাণহীন বোধ হয়।...

লর্ড বলিলেন, "ডেলিশিয়া! তোমার নূতন পুস্তকের কোন কোন অংশ বড়ই আপত্তিজনক হইয়াছে। গতরাত্রিতে একজন আমাকে এই কথা বলিতেছিল!... ।"

ডেলিশিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সে? আমার রচনার অংশবিশেষ হয়ত তাহার কোন ক্ষতস্থান স্পর্শ করিয়াছে!"

কারলীঅন। তিনি ফিট্‌জ্‌হাফ তাঁহাকে তুমি জান। তিনি বলিয়াছেন যে তিনি তাঁহার ভগিনীদিগকে কিছুতেই তোমার পুস্তক পাঠ করিতে দিবেন না। তাঁহার কথা আমার বড় বিরক্তিকর বোধ হইয়াছিল।

মিঃ কারলীঅন কথিত ফিট্‌জ্‌হাফ এর কথাগুলি কি আমাদের সমাজের উক্তিরই প্রতিধ্বনি নহে? যে সকল পত্রিকায় উদারতাসূচক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়, সে সব কাগজ অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিতে পায় না। কেবল বঙ্গে নহে, সুদূর পশ্চিমদেশেরও কোন পত্রিকা (যাহা অবলাদের জন্য প্রচারিত হইয়াছে এবং যাহার অধিকাংশ প্রবন্ধই মহিলা-রচিত) অনেক পাঠক তাঁহাদের আত্মীয়া মহিলাদের দৃষ্টিগোচর হইতে দেন না! ক্ষমতা পুরুষের হাতে কিনা! ডেলিশিয়া উত্তরে কি বলিতেছেন, তাহাও মনোযোগপূর্বক শুনুন,—

"তুমি ত আমার পুস্তক পাঠ করিয়াছ; কাপ্তেন ফিট্‌জ্‌হাফ যে বিষয়ে আপত্তি করেন, সেরূপ কোন কথা কি তুমি সে পুস্তকে দেখিয়াছ?"

লর্ড। এখন আমার ঠিক মনে হয় না।

কাপ্তেন ফিটজ্‌হাফ অনেক দিনে সমাজের প্রকাশ্য নিন্দাপাত্র ছিলেন; তাঁহার কলঙ্কের কথা ডেলিশিয়া তুলিলেন! এবং তাঁহার ভগিনীরাও সাধ্বী নহেন। এই কাপ্তেন আবার ডেলিশিয়ার গ্রন্থের নিন্দা করেন! "যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!"

*

ডেলিশিয়ার নূতন পুস্তকের বিক্রয়-লব্ধ ৮০০০ পাউন্ডের অর্ধেক লর্ডের নামে জমা করা হইয়াছে। ডেলিশিয়া যত টাকা প্রাপ্ত হইতেন, তাহার অর্ধেক স্বামীকে দিতেন।

সেইদিন অপরাহ্নে মিসিস্ ক্যাবেন্‌ডিশ্ ডেলিশিয়ার সহিত দেখা করিতে আসিয়া তাঁহাকে নৈশভোজনের এবং ভোজনান্তে সঙ্গীতালয়ে যাইবার নিমন্ত্রণ করিলেন। ইনি ডেলিশিয়াকে বাল্যকাল হইতে জানেন এবং তাঁহাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন। ডেলিশিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করিলেন। যেহেতু ব্যথিত হৃদয়ে নির্জ্জনে দুশ্চিন্তার ভারবহন করা নিতান্ত অসহ্য। ভাবিলেন, এই ছলে কতক্ষণ স্নেহময় বন্ধুদের সংশ্রবে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া থাকা যাইবে।

অদ্য শহরে বিজ্ঞাপনের ভারি ধুমধাম,—"প্রজাপতির জন্ম—লা মেরিনা (অভিনেত্রী)!" লা-মেরিনাকে দেখিবার জন্য হয়ত ডেলিশিয়ার একটু কৌতূহলও ছিল,—যাহার জন্য তাঁহার সুখ-গৃহ দগ্ধ হইতে চলিল,—যে তাঁহার ধ্বংসের কারণ, তাহাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক।

যথাসময় ডেলিশিয়া মিষ্টার ও মিসিস কাবেনডিশ এর সহিত সঙ্গীতালয়ে (অপেরা হাউসে) উপস্থিত হইলেন। "এম্পায়ার" অদ্য লোকে লোকারণ্য। লর্ড কারলীঅনও আসিয়াছে।

*

প্রজাপতির জন্ম হইল—এখন লা-মেরিনা প্রজাপতিরূপে নৃত্য করিতেছিল। ডেলিশিয়া দেখিলেন, লা-মেরিনার বক্ষস্থলে সেই কপোত—যাহা তিনি পূর্ব দিন বন্ডস্ট্রীটে মণিকারের দোকানে দেখিয়াছিলেন! সেই হীরক-কপোত,—কপোতের চঞ্চুপুটে সেই পদ্মরাগে লিখিত শ্লোক বিশিষ্ট সুবর্ণলিপি! আর সন্দেহের স্থল কই? আর মণিকারের কথা অবিশ্বাস করা যায় কিরূপে? সেই আলোকমালা—পরিশোভিত-রঙ্গালয় সহসা ডেলিশিয়ার চক্ষে ঘোর অন্ধকার বোধ হইল! অকস্মাৎ দারুণ শীতে যেন তাঁহার হস্তপদ অসাড় হইল!

ডেলিশিয়াকে বিবর্ণা দেখিয়া তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্টা মিসিস্ ক্যাবেন্‌ডিশ ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন,—

"একি ডেলিশিয়া! তোমার কি অসুখ হইয়াছে? (মিঃ ক্যাবেন্‌ডিশের প্রতি) রবার্ট! তুমি ইহাকে একটু বাতাসে লইয়া যাও,—ইনি যেন মূর্চ্ছা যাইবেন।"

মর্মাহতা ডেলিশিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, "আমি এখনই ভাল হইব—চিন্তা নাই। বোধ হয় এ কামরার গরম আমার সহ্য হইতেছে না। আমার জন্য আপনারা ব্যস্ত হইবেন না।"

হায় ডেলিশিয়া! তুমি কক্ষের উষ্ণতায় বিচলিত হইতেছ, না অন্তর্দাহের উত্তাপে?

"এম্পায়ার" হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে ডেলিশিয়া লর্ড কারলীঅনকে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রখানি ভৃত্য রব্‌সন্‌কে দিয়া বলিলেন, যেন লর্ড বাড়ি আসিবামাত্রই তাঁহাকে পত্রখানি দেওয়া হয়।

অতঃপর শয়নকক্ষে গিয়া ডেলিশিয়া পরিচারিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, "এমিলি, আমি সমুদ্রতীরে যাইব। জিনিসপত্র ঠিক কর যেন আমরা আগামীকল্য দশটার সময় ব্রোডস্টেয়ার্স যাইতে পারি। স্পার্টানকে সঙ্গে লইব।"

এমিলি তাঁহার চুলের বেণী খুলিতেছিল—তিনি (আন্তরিক ব্যাকুলতায় অস্থিরভাবে) হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এমিলি সবিস্ময়ে বলিল, "ও লেডী! আপনার কি হইল?"

"না কিছু নয়" বলিয়া ডেলিশিয়া মৃদু হাসিতে চেষ্টা করিলেন।..."না এমিলি! ভয় নাই; আমি অসুস্থ নই—কেবল শ্রান্ত হইয়াছি। তুমি যাও, আমি একা থাকিলে ভাল হইব। দেখিও, তুমি সমুদ্র উপকূলে যাত্রার জন্য সময়ে প্রস্তুত হইবে।"

ডেলিশিয়া "এম্পায়ারে" যে দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা সহজে পরিপাক করা মজলুমারও সাধ্যাতীত—যদি ভারত রমণী ধৈর্যগুণে অতুলনীয়। আর স্বাধীনা ডেলিশিয়ার পক্ষে ত ইহা বজ্রাঘাত তুল্য।

*

ডেলিশিয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না—নতজানু হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, "ও প্রভো! এতদিনে বুঝিলাম কি হারাইয়াছি। প্রেম আমাকে সর্বস্বান্ত করিয়া স্বপ্নের ন্যায় অদৃশ্য হইল—চির অন্তর্হিত হইল! আহা! 'আছে' বলিতে রহিল কেবল যশোরূপ কণ্টক মুকুট!"

হায়! মজলুমার ন্যায় ডেলিশিয়াও নির্জনে রোদন করিলেন! ইহা অশ্রু, না ভগ্ন হৃদয়ের শোণিত ধারা?

"আমি তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতাম—তাঁহাকে উপাস্য মূর্তি মনে করিতাম। আমার পাপের (পৌত্তলিকতার) যথেষ্ট শাস্তি হইল!"

*

"আহা প্রেম!—প্রেম কি কোমল আহা! কঠোরস্পর্শে ইহা চিরতরে চূর্ণ হয়! উচ্চ আকাঙ্ক্ষা একবার নষ্ট হইলে আবার জাগিয়া উঠে— কিন্তু প্রেম! ইহা 'এলো' ফুলের মত—শত বৎসরে একবার মুকুলিত হয়! এ জীবন লইয়া এখন আমি কি করি?"

কি আর করিবে?—মৃত্যু-সাগরে বিসর্জন দাও! তুমি নিজের প্রেমজ্যোতিতে তোমার লর্ডকে জ্যোতির্ম্ময় দেখিতে! কারলীঅন বাস্তবিক জ্যোতির্ম্ময় ছিলেন না। যে নিজে আলোকে থাকে, সে অন্ধকারের কিছু দেখিতে পায় না।

আহা! ডেলিশিয়া কি ভুল করিয়াছেন! তিনি স্বামীকে কেমন অনিন্দ্য দেবতা মনে করিতেন! তাঁহাকে কেমন অকপট হৃদয়ে বিশ্বাস করিতেন। যে মোহিনী-মূর্তিটিকে ডেলিশিয়া অমূল্য ভক্তি-রত্ন-খচিত হৃদয় সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা ঈশ্বর তাঁহারই নয়ন-সমক্ষে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন! ডেলিশিয়া! তুমি সে পুতুলের ভগ্ন খণ্ডগুলি কুড়াইয়া তুলিও না।...

পৌত্তলিকেরা যখন মৃন্ময়ী প্রতিমা পূজা করে, তখন তাহাদের বিশ্বাস থাকে যে ইহাতে দেবতা অবতীর্ণা আছেন—পূজাশেষে যখন মনে করে, দেবতা স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়াছেন, তখন প্রতিমাটি বিসর্জন দেয়। কেবল মাটিজ্ঞানে কে পুতুল পূজা করে? ভক্ত যদি জানিতে পায় যে প্রতিমায় দেবতার পরিবর্তে ভূত পিশাচ আবির্ভূত ছিল, তবে?

তবে আর কি পূজা করিতে পারে? কেবল তাহাই নহে, দেবতা ভ্রমে পিশাচের পূজা করা হইয়াছে, এ চিন্তা—এ লজ্জা অসহ্য!

ডেলিশিয়া কি ভয়ানক প্রতারিতা হইয়াছেন—প্রেমিক স্বামীজ্ঞানে বিশ্বাসঘাতক পিশাচের পূজা করিয়াছেন! কাঞ্চন ভ্রমে কর্দমের আদর করিয়াছেন! এতদিন ভ্রমণবশত ডেলিশিয়া শূন্যে যে সুখের অট্টালিক নির্মাণ করিয়া শান্তিতে বাস করিতেছিলেন, অদ্য সে প্রাসাদ চূর্ণ হইয়াছে, মর্মাহত ডেলিশিয়া সেই চূর্ণ প্রাসাদের আবর্জনা ও ধূলিরাশিতে বিলুণ্ঠিতা!

ভক্তিভাজন ভক্তির উপযুক্ত নহেন, নরাকারে পিশাচ— এই আবিষ্কারে ভক্ত-হৃদয়ে যে বজ্রাঘাত হয়, তাহা ভুক্তভোগী হতাশ ভক্ত ভিন্ন আর কে বুঝিবে? সেরূপ হতাশের বৃশ্চিকদংশন যে সশরীরে ভোগ করিয়াছে, সেই জানে সে জ্বালা কেমন তীব্র! স্বপ্নরাজ্যে কল্পিত লতাপত্র পুষ্পাবৃত পথে অন্ধভক্ত নিশ্চিতমনে চলিতেছিল, সহসা কে তাহাকে জাগ্রত করিয়া বলিয়া দিল, ঐ কুসুমাবৃত স্থানে গভীর গর্ত আছে, আর একপদ অগ্রসর হইলেই পতন অবশ্যম্ভাবী। হায়! সে জাগরণ কি কষ্টকর! জাগিবার পূর্বেই ভক্ত মরিল না কেন? হায় সত্য! এমন সত্য কে জানিতে চাহিয়াছিল? এ সত্য জানিবার পূর্বে মৃত্যু হইল না কেন? যাঁহাকে ষোল আনা বিশ্বাস করা গিয়াছিল, তিনি এককড়া বিশ্বাসেরও উপযুক্ত নহেন, নরদেবতাজ্ঞানে যাঁহার চরণে এতদিন ভক্তি কুসুমাঞ্জলি দান করা গিয়াছিল, তিনি নরপশু—এ আবিষ্কার ভক্তের অসহ্য।

হায়! এমন নিষ্ঠুরভাবে প্রতারিতা হওয়া গিয়াছিল! ঈশ! কি যন্ত্রণা। ডেলিশিয়া, তুমি যে দেবতার আরাধনা করিতে, তিনি সৈনিক বিভাগের "গার্ডস্ আফিসার ও ভদ্রলোক" মাত্র—আর কিছুই নহেন!

অবিশ্বাসীকে পশু বলিলেও ঠিক হয় না। কোন্ পশু তেমন নীচ? সিংহ শার্দুল বলিলে 'বীর' বলিয়া প্রশংসা করা হয়; কুকুর বলিলে অতি কৃতজ্ঞ, অতি বিশ্বস্ত বন্ধু বলা হয়; অশ্ব? সেও অপেক্ষাকৃত ভাল; গর্দভ? সে বোকা কিন্তু হিংস্র প্রকৃতির নয়; মহিষ, গণ্ডার, শূকর—না, মানুষের তুলনায় কোন জন্তুই নিকৃষ্ট নয়! কোন পশুই ভক্তহৃদয় পদদলিত করে না!

অবশ্য অবলাহৃদয় দগ্ধ হইল বা চূর্ণ হইল, তাহাতে কর্তাদের কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না; প্রপীড়িতার নীরব যন্ত্রণার তপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ক্ষমতাশালী পুরুষের সুনিদ্রার ব্যাঘাত হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু বলি অকপট ভক্তির কি কিছু মূল্য নাই? সেই অমর-বাঞ্ছিত দুর্লভ ভক্তি হারাইয়া—বেদীভ্রষ্ট হইয়া প্রভুরা কি বড় সুখে থাকেন? মজলুমা অত্যাচারীর অন্নবস্ত্র বন্ধ করিতে পারে না, সত্য, অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে পারে না সত্য, কিন্তু অন্ধ ভক্তি ফিরাইয়া লইতে পারে ত? মানবদেবতাকে ঘৃণা না করিলেও দয়ার পাত্র জ্ঞান করিতে পারে ত? অবলার কৃপাপাত্র হওয়া কি সকলের পক্ষে পড় গৌরবের বিষয়?

ডেলিশিয়া অব্যক্ত যাতনায় পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গীর ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যেন উচ্চারিত হইতেছিল,—

"বড় ভাল বাসিতাম, বড় ভক্তি করিতাম
ভাল প্রতিদান নাথ! পাইলাম তার!"

আবেগের উচ্ছ্বাস কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে রোরুদ্যমানা ডেলিশিয়া তন্দ্রাভিভূতা হইলেন।

মজলুমা! ডেলিশিয়ার বিলাপ কি আপনারই হৃদয়বিদারী বিলাপের প্রতিধ্বনি নয়? ডেলিশিয়ার দগ্ধ প্রাণের হা হুতাশ কি আপনারই হতাশ প্রাণের হা হুতাশের অনুরূপ নয়? প্রভেদ এই যে ডেলিশিয়ার স্বামীর অত্যাচারকে চুরি বলা যাইতে পারে, আর মজলুমার স্বামীর অত্যাচার ডাকাতি!

*

লর্ড কারলীঅন আইনের বিষয় অবগত ছিলেন—তিনি জানিতেন, আইন তাঁহারই অনুকূলে!—নারীহন্তা ভদ্রলোকের জন্য কোন দণ্ড নাই! ডেলিশিয়া যদি 'তালাক' প্রাপ্তির জন্য নালিশ করেন?—তিনি কি 'তালাক' পাইবেন? না। কারণ তিনি লর্ডের নিষ্ঠুরতা প্রমাণ করিতে পারেন না; অমন একটা কেন এক ডজন মেরিনার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা আইনের চক্ষে অত্যাচার নয়। সহধর্মিনীর অর্জিত টাকা মেরিনার জন্য অপব্যয় করাও আইনমতে দোষ নয়! তালাক লইতে হইলে ডেলিশিয়াকে প্রমাণিত করিতে হইবে, স্বামী বিশ্বাসঘাতক এবং দুই বৎসরের অধিককাল হইতে তিনি ইহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করিতেছেন, ডেলিশিয়া ইহা প্রমাণিত করিতে পারিবেন না! "ডেলিশিয়া আমা হইতে মুক্তি পাইতে পারেন না"এই কথা (আইনের এই ধারা) স্মরণ করিয়া কারলীঅন অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। হায়রে আইন! পুরুষ-রচিত আইন—পুরুষের সুবিধার নিমিত্তই ইহার সৃষ্টি! অবলাহৃদয় দলন করা—তাহার জীবন মাটি করা—তাহাকে জীবন্তে হত্যা করা আইনানুসারে অত্যাচার নয়!

*

ব্রোডস্ট্রেয়ার্সে আসিয়া ডেলিশিয়াও সামাজিক বিধি ব্যবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। কাহাকে শারীরিক কষ্ট দিলে, খুন জখম করিলে, অপরাধীর শস্তি আছে; কিন্তু রমণী-হৃদয় বিদীর্ণ করিলে, শতধা করিলে রমণী-প্রেমের জীবন্ত সমাধি করিলে, কোন দণ্ড নাই!

"তাই বলি", ডেলিশিয়া ভাবিলেন, "তিনি যদি আমাকে প্রহার করেন কিম্বা আমাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়েন,—তবেই আমি তাঁহার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারি,—নচেৎ না!"

অপরাহ্নে সমুদ্রতীরে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে ডেলিশিয়া তাঁহার ভগ্ন পুতুলের চিন্তা করিতেছিলেন। প্রতিমা বেদীভ্রষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু বেদীতে তাঁহার স্থিতিচিহ্ন এখনও বর্তমান!—ফুল ঝরিয়া যায় কিন্তু বৃন্তস্থলে তাহার অবস্থিতির চিহ্ন বিদ্যমান থাকে! সব যায়—কেবল স্মৃতি-যন্ত্রণা থাকে! অনিবার অশ্রুস্রোত বাধা মানিতেছিল না—ডেলিশিয়ার নয়নদ্বয় বাষ্পাচ্ছন্ন হওয়ায় তিনি কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না,—গগণ, সৈকত, সাগরের বীচিমালা—এইসব কিছুই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। এমন সময় স্পার্টান সানন্দে ডাকিয়া উঠিল, এবং কে একজন বলিল—

"লেডী কারলীঅন, আপনার সঙ্গে দুই চারিটি কথা বলিতে পারি কি?"

ডেলিশিয়া চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে মিঃ পল ভাল্‌ডিস্।

যেদিন ডেলিশিয়া ব্রোডস্ট্রেয়ার্সে আইসেন, তাহার পূর্বদিন "আনেস্‌টি" নামক সংবাদপত্রে এক ব্যক্তি ডেলিশিয়ার অতি জঘন্য মিথ্যানিন্দা লিখিয়াছিল। পল্ ভাল্‌ডিস্ সে লেখককে যথেষ্ট কশাঘাত করিয়াছেন। তিনি ডেলিশিয়াকে এই শুভ সংবাদ শুনাইতে আসিয়াছেন।

অন্যমনস্ক থাকাবশত ডেলিশিয়া প্রথমে তাহা বুঝিতেই পারিতেছিলেন না। পরে সহাস্যে বলিলেন, "সংবাদপত্রের মতে যিনি একাধারে দ্বিতীয় শেক্সপিয়র ও মিল্টন,—ওহো! সেই ব্যক্তিকে আপনি প্রহার করিয়াছেন!"

*

ভাল্‌ডিস্ বলিলেন, "লেডী কারলীঅন, আপনাকে বড় বিমর্ষ দেখায়।"

ডেলিশিয়া উত্তর করিলেন, "আপনার অনুমান ঠিক। আমি বড়ই বিষণ্ন—আমি আমার স্বামীর প্রেম হারাইয়াছি।"

"তবে আপনি সবই শুনিয়াছেন?"

"কি! কেবল আমি ব্যতীত শহরের সকলেই একথা জানে না কি?...

"বলুন ত ইহা কি সম্ভব যে লর্ড কারলীঅন এমনই আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছেন যে, তিনি প্রকাশ্যে লা-মেরিনার সহিত দেখা করিতে সঙ্কুচিত নহেন; এইরূপে তাঁহার পত্নীকে সমাজের বিদ্রূপ ও দয়ার পাত্রী করিয়াছেন?"

এ দেশে ত স্বামীর অধঃপতনের জন্য স্ত্রীকে লজ্জিত হইতে দেখা যায় না, বরং স্ত্রীর সামান্য পদস্খলনে স্বামীর লজ্জা হয়। ইংল্যান্ডে স্বামীর পতনে স্ত্রীও অপমান বোধ করেন। এ দেশে ও সে দেশে এ এক প্রভেদ।

ভাল্‌ডিস্ উত্তর করিলেন, "লেডী কারলীঅন, আপনার বন্ধুরা আপনাকে সতর্ক করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আপনি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। যখন আমি ইঙ্গিতে বলিয়াছিলাম যে আপনার বিশ্বাস অপাত্রে ন্যস্ত, সেদিন আপনি আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য, সেরূপ করা আপনার অন্যায় হইয়াছিল, আমি এরূপ বলি না। আপনি পতিপ্রাণা সতীর উপযুক্ত কাজ করিয়াছিলেন। এখন আপনি সবই জানিতে পারিয়াছেন—"

"এখন আমি জানিতে পারিয়াছি; কিন্তু জানিয়া ফল কি? আমি কি করিতে পারি? স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে অবলার কোন উপায় নাই। আমি প্রহার চিহ্ন দেখাইতে পারি না,—তাঁহার কোন দুর্ব্যবহার প্রমাণিত করিতে পারি না! আইন বলিবে, 'ফিরে যাও বোকা মেয়ে! তোমার স্বামী যাহাই করুন না কেন, তিনি যদি তোমার সহিত শিষ্ট ব্যবহার করেন, তবে তুমি তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র হইতে পার না!' ইত্যাদি ইত্যাদি।"

এ উক্তি ইংরাজ ললনার!—কি বুক ভাঙ্গা কথা! যে অনলে মজলুমা দগ্ধ হন, সেই অনল ডেলিশিয়াকেও দগ্ধ করে!

ডেলিশিয়া আবেগভরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "পল ভাল্‌ডিস্! আপনি থিয়েটারে আবেগের অভিনয় করিতে পারেন, দুঃখের স্বরূপ অনুকরণ করিতে পারেন; কিন্তু আপনি কোন কালে অবলার ভগ্ন হৃদয়ের অসহ্য মুক যন্ত্রণার ভয়াবহ গভীরতা

অনুভব করিতে পারিয়াছেন কি? না! আমার বিশ্বাস, আপনার অতি সুন্দর কল্পনাশক্তিও ততদূর পৌঁছিতে পারে না! আপনি জানেন, আমি কেন সহসা এখানে—এই সাগরতীরে আসিয়াছি?—আমি জানি, আমার যন্ত্রণা দুর্বহ হইলে এই শান্তশিষ্ট সমুদ্র আমাকে তাহার অতল বক্ষে স্থান দিতে আপত্তি করিবে না! কিন্তু না, আমি ডুবিব না! কিন্তু আপনি জানেন? আপনি অনুমান করিতে পারেন, কেন আমি অদ্য আমার স্বামীর সহিত দেখা না করিবার অভিপ্রায়ে এখানে চলিয়া আসিয়াছি?...আমার আশঙ্কা ছিল, দেখা হইলে আমি তাঁহাকে হত্যা করিতাম।"

*

ডেলিশিয়া নিভৃতে চিন্তা করিতেছেন, এখন কি করা কর্তব্য? পৃথিবীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়া নিত্য নূতন জ্ঞানার্জন করিবেন; অথবা অবিশ্রান্ত ভ্রমণে যদি শরীর অবসন্ন হয়, তবে স্কটল্যান্ডের হাইল্যান্ডস্থিত নির্জন প্রদেশে অথবা আয়রল্যান্ডের মনোরম উপত্যকায় একটি বাড়িতে থাকিয়া সাহিত্য চর্চায় জীবনের অবশিষ্ট দিন অতিবাহিত করিবেন।

তাহাতে সমাজ ভালমন্দ বলিবে যে? "লেডী কারলীঅনের নির্জনবাসের কারণ কি? হয়ত তাঁহার কোন মন্দ অভিপ্রায় আছে!"

তাই ত! যতদিন আত্মীয় স্বজনের অত্যাচার সহ্য করিয়া তাঁহাদের পদলেহন করিতে পার, ততদিন তুমি ভাল। যদি তুমি আত্ম-গরিমা প্রকাশ কর, আপন সম্পত্তি রক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া উকিল মোক্তারের সহিত পরামর্শ কর, স্বাধীনতার ভাব দেখাও, আত্মীয়দের সহিত বনে না বলিয়া স্বতন্ত্র বাড়িতে থাক,—তবে কি আর রক্ষা? তবে সমাজের মতে তুমি অধঃপাতে গিয়াছ! ডেলিশিয়া ঠিকই বলিয়াছেন, "এ জীবন লইয়া এখন আমি কি করি?" বিধবা হইলে সমাজের গঞ্জনা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পূর্বে ভারতললনা মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া আত্ম-ঘাতিনী হইত। ডেলিশিয়াকেও জীবনভার লইয়া বেশিদিন ভাবিতে হয় নাই—তিনি শীঘ্রই মৃত্যুর শান্তিক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন!

যেদিন "এম্পায়ারে' লা-মেরিনার কক্ষে কারলীঅন প্রদত্ত প্রেম-চিহ্ন দেখিয়া আসিলেন, সেইদিনই ডেলিশিয়ার প্রকৃত মৃত্য হয়—অর্থাৎ তাহার হৃদেয়র মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যু ও প্রেমের মৃত্যু একই কথা। জীবন্মৃতা ডেলিশিয়া তবু যে দেহভার বহন করিতেছেন, তাহা কেবল জীবনের এক গুরুতর কর্তব্যপালন বাকি আছে বলিয়া।

ডেলিশিয়া ১৫ দিন পরে ব্রোডস্টেয়ার্স হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ভৃত্য রব্‌সনের প্রমুখাৎ স্বামীর অনেক কলঙ্ক কথাই শুনিলেন। ক্রোধে লজ্জায় ডেলিশিয়ার দেহলতা কম্পিত হইল—তাঁহার নিজের ভৃত্যও তাহাকে দয়ার পাত্রী ভাবিল! রব্‌সনের কথার ভাবে করুণা ছিল! সমবেদনা ছিল!!

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের জন্য ডেলিশিয়া শয়নকক্ষে গেলেন। দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় উপাধানের প্রতি চাহিয়া ডেলিশিয়া ভাবিলেন, 'আমার এই উপাধানে লা-মেরিনার মস্তক ন্যস্ত হইয়াছিল?' শয্যার নিকট যাইতে না যাইতেই তাঁহার মনে হইল যেন একটি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল—সেই যন্ত্রণায় ডেলিশিয়া মূর্ছিতা হইয়া

ভূমিতলে পড়িলেন। তাঁহার পতনের শব্দ শুনিতে পাইয়া এমিলি দৌড়িয়া আসিল।... ডেলিশিয়া চক্ষু মেলিলে, দেখিলেন, এমিলি তাঁহার শুশ্রুষায় ব্যস্ত।...

গৃহে লর্ডের সহিত দেখা হইবার পূর্বেই ডেলিশিয়াকে সন্ধ্যায় লেডী ডেক্সটারের নিমন্ত্রণে যাইতে হয়। তথায় স্বকর্ণে স্বামীর মুখে তাঁহার নিন্দা শুনিতে পাইলেন। অবশ্য ডেলিশিয়াকে না দেখিয়াই তিনি নিন্দা করিতেছিলেন! তাঁহার কথা শেষ হইলে ডেলিশিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—কঠোর দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিলেন! মুহূর্ত পরে তিনি নীরবে সরিয়া গেলেন। লেডী ব্রানসুইথ (ইঁহারই সঙ্গে কারলীঅন আলাপ করিতেছিলেন) সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনি কে?"

কারলীঅন কিঞ্চিৎ ভীতভাবে বলিলেন,—"উনি ডেলিশিয়া—আমার স্ত্রী।" লেডী ব্রানসুইথ বলিয়া উঠিলেন, "তিনি! সেই সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা। আমার ধারণা ছিল না যে তিনি এমন সুন্দরী। তিনি সেসব কথা অবশ্যই শুনিয়াছেন।"

*

সে রাত্রি লর্ড কারলীঅন গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র রব্‌সন্ তাঁহাকে জানাইল যে কর্ত্রী তাঁহার জন্য পাঠাগারে অপেক্ষা করিতেছেন।

ডেলিশিয়ার সম্মুখে উপস্থিত হইতে লর্ডের যেন হৃতকম্প হইল। দ্বারের পর্দা র নিকট দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎ ইতস্তত করিয়া তিনি কক্ষে প্রবেশ করিলেন!—(যেন রানীর সম্মুখে খুনী আসামী—বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইবে!)

লর্ড আরম্ভ করিলেন,"ডেলিশিয়া আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি—"

ক্রোধে ডেলিশিয়ার চক্ষু হইতে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছিল, তিনি মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "থাম, আর মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন নাই! এখন আমি তোমার নিজমূর্তি দেখিয়াছি—তোমার সে মুখোস খসিয়া পড়িয়াছে; মুখোসটা আর তুলিয়া লওয়ার চেষ্টা বৃথা।"

প্রভু স্তম্ভিত হইলেন, একটু হাসিতে বৃথা চেষ্টা করিলেন।

ডেলিশিয়া তাঁহার প্রতি স্থিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন, আজি রাত্রে তুমি আমার নিন্দা করিয়াছ।..."

*

"আমি তোমাকে বলি নাই", লর্ড আত্মরক্ষার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন, "আমি বলিয়াছি, প্রায় সকল বিদুষী নারীই রমণীসুলভ কোমলভাব হারাইয়া থাকে।"

"ক্ষমা কর", ডেলিশিয়া বাধা দিয়া বলিলেন, "তুমি বলিয়াছ, স্ত্রীলোকেরা—যাঁহারা পুস্তক লিখেন, যেমন আমার স্ত্রী; ঠিক এই কথাগুলি বলিয়াছ। ... যৎকালে আমি পরম আরাধ্য দেবতাজ্ঞানে তোমার উপাসনা করিতেছিলাম, তুমি আমাকে প্রতারণা করিতেছিলে! তুমি এইরূপে আমাকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করিলে!"

*

শেষে কারলীঅন বলিলেন, "ডেলিশিয়া! তুমি কি প্রলাপ বকিতেছ। তুমি বাস্তবিক স্বতন্ত্রবাসের ইচ্ছা কর না? আমাকে ছাড়িয়া তুমি কি করিবে?"

"আমি জীবিত থাকিব! অথবা মরিব, সেজন্য ভাবি না!"

লর্ড ভাবিলেন, এখন বোধ হয় ডেলিশিয়ার রাগ কম হইয়াছে। তাই তাঁহার দিকে একটু অগ্রসর হইলেন।

ডেলিশিয়া ক্ষিপ্ত হস্তে পিস্তল তুলিয়া বলিলেন, "সাবধান! আমার নিকট আসিও না! —"

লর্ড একটু হাসিলেন, "তুমি পাগল হইয়াছ ডেলিশিয়া? পিস্তলটা রাখ; বোধহয় ওটা ভরা নয়। তবু তোমার হাতে পিস্তাল ভাল দেখায় না।"

"না, ভাল ত দেখায় না; কিন্তু পিস্তলটা ভরা! তোমার আসিবার পূর্বেই আমি এটা ভরিয়া রাখিয়াছি। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যদি তুমি আর একপদ অগ্রসর হও— আমি তোমাকে গুলি করিব!"

*

ডেলিশিয়া শেষ বিদায়ের জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিলেন, "বিদায় উইল! আমি তোমাকে বড় ভালবাসিতাম। কিছুদিন পূর্বেই তুমি আমার হৃদয়সর্বস্ব ছিলে;—সেই প্রেম, যাহা অকস্মাৎ চিরতরে বিনষ্ট হইয়াছে—মরিয়া গিয়াছে, তাহারই খাতিরে এখন আমরা শান্তির সহিত বিদায় লই।"

কিন্তু লর্ড ডেলিশিয়ার হস্ত স্পর্শ করিলেন না; তিনি এত শীঘ্র বিদায় লইবেন না। তিনি নিজ বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন!

ডেলিশিয়া আর কিছু না বলিয়া লিখিতে বসিলেন।

"তুমি শুনিতেছ?" লর্ড পুনরায় বলিলেন,"আমি বিদায় গ্রহণ করিব না।"

ডেলিশিয়া নিরুত্তর। তিনি নিজে স্থিরা ছিলেন, কেবল তাঁহার লেখনী নড়িতেছিল।

লর্ড কারলীঅন্ বলিলেন, "গভর্নমেন্ট স্ত্রীলোকের বেশি স্বাধীনতায় বাধা দিয়া ভালই করেন। যদি তোমাদের ইচ্ছামত সব অধিকার তোমরা পাইতে তবে তোমাদের অত্যাচারের সীমা থাকিত না। রমণীর উচিত নম্র শান্ত হওয়া; যদি সৌভাগ্যবশত তাহারা ধনবতী হয়, তবে সে টাকা তাহাদের স্বামীদের উপকারের জন্য ব্যয় করা উচিত। ইহাই সৃষ্টি জগতের স্বাভাবিক নিয়ম,—রমণী পুরুষের সেবিকারূপে সৃষ্ট হইয়াছে—যখন সে তাহার (দাসী) হইতে চায় না, তখনই গোলমাল হয়।"

বাহবা! যদি ইংল্যান্ড-নিবাসীর এই উক্তি, তবে আর আমরা গোটাকতক ইংল্যান্ড প্রত্যাগত লোকের সঙ্কীর্ণচিত্ততা দেখিয়া আশ্চর্য্য হই কেন? যাঁহারা বিলাতী বিদ্যালাভের নিমিত্ত সে দেশে যান, তাঁহারা দুই-চারিটা "কারলীঅন" এর সংশ্রবে পড়িয়া বিষাক্ত হন, ইহা অসম্ভব নহে। তাই ত গভর্নমেন্ট কেন স্ত্রীলোকগুলিকে কামানে উড়াউয়া দেন না? অতগুলি গোলাগুলি কামান বন্দুক আছে কিসের জন্য? অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমুদয় অবলাকে একটা বারুদের ঘরে বন্ধ করিয়া বারুদে আগুন দিলে সব আপদ চুকিয়া যায়! তাহা হইলে আর "ডেলিশিয়া ট্রাজেডী" বা "মজলুমা-বধ-কাহিনী" লিখিবার জন্য কেহ জীবিত থাকিবে না!!

সুখের বিষয় ইংল্যান্ডে "কারলীঅন" এর সংখ্যা (দুই এক শতের) অধিক নহে। যেখানে কারলীঅন হেন নীচাশয় কাপুরুষ আছেন, সেখানে মিঃ ক্যাবেনডিশ ও পল্ ভাল্‌ডিসের ন্যায় মহানুবভ লোকও আছেন। মোটের উপর সহৃদয় পুরুষই বেশি। এবং আমাদের দেশেও (অধিক না হইলেও) অল্পসংখ্যক মহাশয় পুরুষ আছেন। বিশাল

কণ্টক-অরণ্যে যে মুষ্টিমেয় ফুল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্তব্য।

ডেলিশিয়া তবু কিছু না বলিয়া পূর্ববৎ লিখিতে থাকিলেন।

পরিশেষে লর্ড বলিলেন, "আমি এখন শয়ন করিতে যাই; শুভরাত্রি, ডেলিশিয়া!"

এবার ডেলিশিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শুভরাত্রি!"

এই তাঁহাদের শেষ বিদায়! এই শেষ দেখা! কারলীঅন চলিয়া যাইবামাত্র ডেলিশিয়া উঠিয়া কপাট বন্ধ করিলেন।

যতক্ষণ জ্বর থাকে, ততক্ষণ জ্বরের উত্তেজনায় রোগী একরূপ সবল থাকে; যেদিন জ্বর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যায়, সেদিন রোগী হঠাৎ অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে।

যতক্ষণ লর্ড কারলীঅন উপস্থিত ছিলেন, ক্রোধ খেদের উত্তেজনা ছিল, ততক্ষণ ডেলিশিয়ার হৃদয় সবল ছিল; কারলীঅন্ চলিয়া গেলে পর ডেলিশিয়া যেন ভাঙ্গিয়া পড়িলেন,—ক্রমে সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল,—তিনি মূর্ছিত হইলেন।

পরদিন ডেলিশিয়ার উত্থানশক্তি ছিল না, তিনি ভগ্নহৃদয়, ভগ্নশরীর লইয়া সমস্ত দিন শয়নকক্ষেই থাকিলেন। সেইদিন প্রান্তে কারলীঅন প্যারিস যাত্রা করিলেন। তিনি যাত্রাকালে ডেলিশিয়াকে ছোট একখানি পত্র লিখিয়া গেলেন। মধ্যাহ্ন ডাকে একরাশি পত্র আসিয়াছিল, সে পত্রগুলি পাঠকালে ডেলিশিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—

"তাহারা (পত্র-লেখকেরা) জানে না যে আমি মরিয়াছি!"

ডেলিশিয়া-চরিত্রে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই,—সমাজ এবং আইন তাঁহার প্রতিকূলে থাকা সত্ত্বেও তিনি বিশ্বাসঘাতক স্বামীর কবল হইতে আপনাকে মুক্ত করিলেন। ইহাতে তাঁহার নৈতিক সাহসের প্রশংসা করিতে হয়! তাঁহার পবিত্র হৃদয় কত উচ্চ!—তাঁহার মনোভাব কি মহান—যে ব্যক্তি লা-মেরিনাকে ভালবাসেন, তাঁহার ভালবাসায় ডেলিশিয়ার প্রয়োজন নাই! তিনি স্বামীকে একথা স্পষ্টই বলিয়াছেন,—"তোমার যে হস্ত লা-মেরিনাকে স্পর্শ করিয়াছে, সে কলুষিত হস্ত আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না!"

কেহ বলিতে পারেন যে ডেলিশিয়ার অর্থবল ছিল বলিয়া তিনি স্বামী হইতে পৃথক হইতে পারিলেন; স্বামীর অন্নাশ্রিতা হইলে ওরূপ করিতে পারিতেন না। কিন্তু আমরা তেজস্বিনী ডেলিশিয়ার যে আত্ম-সম্মানজ্ঞানের পরিচয় পাই, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস যে তিনি একেবারে কপর্দকশূন্য হইলেও পৃথক হইতেন। তিনি লর্ড কারলীঅন এর প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া কোন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হইতেন, কিম্বা কাহারও বাড়িতে গভর্নেস হইতেন অথবা কোন আতুরাশ্রমে অতি সামান্য বেতনে সেবিকা হইতেন। স্বামীকে তাড়াইয়া দিয়া তিনি অধিক দিন জীবিত ছিলেন না, জীবনের সে কয়টা দিন যাপনের জন্য ডেলিশিয়া উপার্জনের কোন পথ নিশ্চয়ই খুঁজিয়া লইতেন। ইচ্ছা অতি প্রবল থাকিলে উপায়ের অভাব হয় না।

ডেলিশিয়ার এই ভাব—এই মৃত্যু সমাজের পক্ষে অতীব কল্যাণকর। সমাজ সংস্কার করিতে হইলে কতিপয় মজলুমাকে ডেলিশিয়ার ন্যায় 'সমরশায়িনী' হইতে হইবে। তা সাধুদের আত্মোৎসর্গ বিনে এ জগতে কখন কোন্ ভাল কাজটি হইয়াছে!

ঐরূপ উচ্চভাব ও সুমার্জিত রুচি লাভ করিতে হইলে সুশিক্ষার প্রয়োজন। কবে মজলুমা ডেলিশিয়ার মত বীরনারী হইতে পারিবেন?

মৃত্যুর পূর্বে ডেলিশিয়া উইল করিলেন, যেন তাঁহার স্বামী আজীবন মাসিক তিনশত টাকা (বার্ষিক ২৫০ শত পাউন্ড) বৃত্তি প্রাপ্ত হন। অবশিষ্ট ৬,০০,০০০ (ছয় লক্ষ) টাকা দীন দুঃখীদের দান করা হইল। এবং ভবিষ্যতে তাঁহার পুস্তক বিক্রয়ের টাকাও অনাথ আতুরদিগকে দান করা হইবে।

লর্ড কারলীঅন প্যারিসে থাকিতেই ডেলিশিয়ার মৃত্যু হইল। তিনি হৃদরোগে (হৃৎপিণ্ড সহসা স্তম্ভিত হওয়ায়) মারা গিয়াছেন।

ডেলিশিয়া-হত্যা কাহিনীর এই শেষ কি দারুণ নৈরাশ্য! হতাশ-পীড়নেই ডেলিশিয়ার জীবন রবি মধ্যাহ্নে অস্ত গেল,—পূর্ণ বিকাশের সময় কুসুম শুকাইয়া গেল!

এইরূপ কত মজলুমা ভগ্নহৃদয়ে আমাদের দেশে অন্তঃপুরের নিভৃত কোণে নিহতা হন, কে তাহার সন্ধান লয়? সে তাপ-দগ্ধা অভাগিনীদের উদয় বিলয় কোন ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকে না!

দাম্পত্যজীবনের অবস্থা যাহাই হউক, ডেলিশিয়া সামাজিক জীবনেও সুখী ছিলেন না। ডেলিশিয়া সমাজে যথেষ্ট আদর প্রাপ্ত হন নাই কেন? যেহেতু তিনি নিজে ভাল লোক ছিলেন! যেহেতু তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠা লেখিকা ছিলেন; সাহিত্যক্ষেত্রে যশোবিজয়ে লেখকদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। স্ত্রীলোকের এতটা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা?—ইহা সমাজের অসহ্য! শেষে সান্ত্বনা লাভের জন্য সমাজ বলিত, 'অধিকাংশ রচনা কারলীঅন লিখেন।' লেখার সুখ্যাতিটা নিতান্ত না দিলে নয়—তবে তাহা ডেলিশিয়াকে না দিয়া কারলীঅনকে দেওয়া যাউক!

ডেলিশিয়ার জন্য অকপট হৃদয়ে শোক করিল কে?—স্পার্টান। কুকুর স্পার্টানের বাক্‌শক্তি থাকিলে সে বলিত,—"যদি সত্য, বিশ্বস্ততা এবং বিশুদ্ধ ভক্তি সদ্‌গুণ হয়, তবে কুকুর পুরুষাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যদি স্বার্থপরতা, ধূর্ততা ও কপটাচারকে সদ্‌গুণ বলা যায়, তবে অবশ্য পুরুষ জাতি কুকুরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ!

এ কথার উত্তরে আমাদের বঙ্গীয় ভ্রাতৃসমাজ কি বলিতে চান? এ উক্তি একজন ইংরাজ মহিলার! তাঁহাকে কিছু বলা এ দেশী কর্তাদের ক্ষমতাতীত! কিছু বলিলেও ইঁহাদের কণ্ঠস্বর সাত সমুদ্র পার হইয়া লেখিকার শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিবে না। তবে আর কি করিবেন ভ্রাতৃগণ! নীরবে রোদন করুন!

পাঠিকা! এ দীর্ঘ উপন্যাস পাঠে আপনি অত্যন্ত শ্রান্ত ইহয়াছেন জানি, কিন্তু তুব আপনাকে "ডেলিশিয়া হত্যা"র শেষ উক্তিটি না শুনাইয়া ছুটি দিতে পারি না! শেষ কথার ভাবার্থ এই—

পৃথিবীর রাজা মহারাজার নিকট ন্যায় বিচার প্রাপ্তির আশা নাই। তবে একদিন স্বয়ং সর্বশক্তিমান বিশ্বপতি সুবিচার করিবেন,— তখন তিনি সতী সাধ্বী অবলার প্রতিবিন্দু অশ্রুর জন্য, রমণীর নীরব যন্ত্রণার প্রত্যেকটি দীর্ঘ নিঃশ্বাসের জন্য অত্যাচারীকে শাস্তি দিবেন। আমাদের এই একমাত্র ভরসা—এই আশায় বিশ্বাস করিয়া আমরা ধৈর্য ধারণ করিব— নতুবা (যদি ঐ বিচারের আশা না থাকে তবে) মনে করিতে হয়, ঈশ্বর নিজেই—এবং জগৎ তাঁহার নরক!

কথা কয়টি বড় নৈরাশ্যে বুক ভাঙ্গিয়া উচ্চারিত হইয়াছে! আহা!

জ্ঞানফল[১]

(রূপকথা)

আদম ও হাভা[৩] পূর্বে ইডেন উদ্যানে থাকিতেন। তাঁহারা প্রভু পরমেশ্বরের অতিথিরূপে পরম সুখে স্বর্গে ছিলেন, তাঁহাদের কোন অভাব ছিল না। পরমেশ্বর আদম দম্পতিকে কেবল একটি বৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

একদা হাভা স্বর্গোদ্যানের সুকুমার জাফরান মণ্ডিত পথে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই নিষিদ্ধ তরুর ছায়াতলে আসিয়া পড়িলেন। তিনি মুগ্ধনেত্রে কাননের সৌন্দর্য অবলোকন করিতে লাগিলেন। শাখাস্থিত বিহগের মধুর কাকলি শুনিতে শুনিতে তিনি অন্যমনস্ক হইয়া সেই বৃক্ষের কয়েকটি ফল চয়ন করতঃ একটি ভক্ষণ করিলেন।

ফল ভক্ষণ করিবামাত্র হাভার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারা যদিও রাজ-অতিথিরূপে রাজভোগে আছেন, তথাপি তাঁহার প্রকৃতি অবস্থা এই যে তাঁহার বর-অঙ্গে একখানি চীর পর্যন্ত নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ আজানুলম্বিত কেশদামে সর্বাঙ্গ আবৃত করিলেন। কেমন এক প্রকার অভিনব মর্মবেদনায় তাঁহার হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত হইল।

এই সময় তথায় আদম গিয়া উপস্থি হইলেন। হাভা তাঁহাকে স্বীয় হস্তস্থিত ফল খাইতে অনুরোধ করিলেন। পত্নীর উচ্ছিষ্ট জ্ঞানফল ভক্ষণে আদমেরও জ্ঞানোদয় হইল। তখন তিনি নিজের দৈন্যদশা হৃদয়ের পরতে পরতে অনুভব করিতে লাগিলেন।—এই কি স্বর্গ? প্রেমহীন, কর্মহীন অলস জীবন,—ইহাই স্বর্গসুখ? আরও বুঝিলেন, তিনি রাজবন্দী—এই ইডেন কাননের সীমানার বাহিরে পদার্পণ করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই! তিনি স্বর্ণ-রৌপ্যের ইষ্টক এবং (শুরকি মসলার স্থলে) প্রবাল ও মুক্তাচূর্ণ নির্মিত সুরম্য প্রাসাদে থাকেন, অথচ "আপন" বলিতে এক কড়ার জিনিস তাঁহার নাই,—এমনকি পরিধানের এক খণ্ড বস্ত্র পর্যন্ত নাই! এ কেমন রাজভোগ? এখন অজ্ঞতারূপ স্বর্গ সুখের

---

১. শেষ উহিট এমনই মর্ম্মস্পর্শী যে তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না,—"Not a tear, not a heart throb of on pure woman wronged shall escape the eyes of Eternal Justice, or fail to brign punichment upon the wrong--doer! Thie we may helieveíthis we must believe,--else God Himself would be a demon and the world His Hell!"

২. এস্থলে কোরান শরীর বা বাইবেলের বর্ণিত ঘটনার অনুসরণ করা হয় নাই।

৩. বর্তমানে মুসলমানদের কাছে 'হাওয়া'এবং খ্রিস্টানদের কাছে 'ইভ' নামে পরিচিত। –সম্পাদক

স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল;— জ্ঞানের জাগ্রত অবস্থা স্পষ্ট উপলব্ধ হইতে লাগিল। সুতরাং মোহ ও শান্তির স্থলে চেতনা ও অশান্তি দেখা দিল! তিনি হাভাকে বলিলেন,"এতদিন আমরা কি মোহে ভুলিয়াছিলাম! আমাদের এই অবস্থায় কত সুখী ছিলাম।"

হাভা উত্তর দিলেন, "তাই ত! এই যে সৌন্দর্যের ললাম ভূমি—সুগন্ধি জাফরাণ, কুসুমশয্যা যাহাতে দূর্বারূপে বিরাজমান; এই যে হীরক-প্রষূণ-ভূষিতা ললিতা বল্লরী; এই যে মরকত-কিশলয়-শোভিত তরুরাজি-শীর্ষে পদ্মরাগ ফুল,—ইহারা নয়ন রঞ্জন করে বটে কিন্তু ইহাতে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটে কই? 'কওসর' জলাশয়ের মকরন্দপ্রতিম অমিয়া বারি তৃষ্ণা নাশ করে বটে, কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের পিপাসা মিটে কই? এ সব স্বর্গীয় ঐশ্বর্যের আমাদের কি প্রয়োজন?" কোন এক অজ্ঞাত পরিবর্তন লাভের জন্য তাঁহারা ব্যাকুল হইলেন।

পরমেশ্বর উদ্যান-ভ্রমণে আসিয়া দেখিলেন, আদম দম্পতি তাঁহাকে দেখিয়া বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে ডাকিলেন কিন্তু তাঁহারা ক্ষোভে, অভিমানে, লজ্জায় বিভুসমীপে যাইতে পারিলেন না। সর্বজ্ঞ জগদীশ্বর সকলই অবগত ছিলেন, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোরা স্বাধীনতা চাহিস? যা তবে দূর হ! পৃথিবীতে গিয়া দেখ স্বাধীনতায় কত সুখ!"

আদম-দম্পতি সেইদিন পতিত হইয়া পৃথিবীতে আসিলেন। এখানে তাঁহার অভাব-স্বাচ্ছন্দ্য, শোক-হর্ষ রোগ আরোগ্য দুঃখ-সুখ প্রভৃতি বিবিধ আলো-আঁধারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রকৃত দাম্পত্যজীবন লাভ করিলেন! হাভা কন্যাদিগকে অধিক ভালবাসিতেন; তিনি আশীর্বাদ করিলেন, কন্যাকুল দীর্ঘায়ু হইবে; সুখে শান্তিতে গৃহে অবস্থিতি করিবে প্রেমের অক্ষয় ভাণ্ডার তাহাদের হৃদয়ে সঞ্চিত থাকিবে।

আদম আবার পুত্রদিগকে অধিক স্নেহ করিতেন, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাশক্তি তাদৃশ প্রবল না থাকায় তিনি তনয়দিগকে বিশেষ কোন বর দান করেন নাই।

জননী হাভার আশীর্বাদ মতে তাঁহার দুহিতানিচয় জন্মে এক গুণ, বাড়ে দ্বিগুণ, দীর্ঘায়ুঃ হয় চতুর্গুণ! আর আদমের প্রিয় তনয় জন্মে এক গুণ, অতি সোহাগে প্রতিপালিত হয় বলিয়া রোগ ভোগ করে দ্বিগুণ, মরে চতুর্গুণ! স্বাভাবিক মৃত্যু না হইলে তাহারা যুদ্ধচ্ছলে পরস্পরে মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরে! একদল কারাগারে পচে, অবশিষ্ট নানা ক্লেশ ভোগ করে!

স্বর্গচ্যুতা হাভা তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট যে জ্ঞানফলটি পৃথিবীতে ফেলিয়া দিলেন, তাহার বীজে ধরণীর পূর্বাংশে এক বিশাল মহীরুহ জন্মিল। সময়ে শাখাটি ফুলে ফলে পরিপূর্ণ হইল; কিন্তু সে দেশের লোকে তৎকালে ইহার যথেষ্ট আদর করিতে জানিত না। তরুতলে রাশি রাশি সুপক্ব ফল পড়িয়া থাকিত, শৃগাল ও কাক তদ্বারা উদরপূর্তি করিত। অবশিষ্ট ফল নিকটবর্ত্তী শান্তানদীর বেলায় পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল; কতক গড়াইয়া নদীগর্ভে পড়িল!

জ্ঞানফলের রসমিশ্রিত নদীজল যথাকালে বিরাট সাগরে গিয়া মিশিতেছিল। বিরাট সাগরের পরপারে পরীস্থান।

পরীস্থানের নরনারী দেখিতে অতি সুন্দর; কিন্তু শারীরিক সৌন্দর্য ব্যতীত বড়াই করিবার উপযুক্ত আর বিশেষ কিছু তাহাদের ছিল না। সে দেশে কেবল মাকালের বন;

উপযুক্ত খাদ্য-সামগ্রীর একান্ত অভাব। জিনগণ[১] নানা কৌশলে অতি যত্ন পরিশ্রমেও কর্ক্কশ অনুর্বর ভূমি কর্ষণ করিয়া উপযুক্ত ফললাভ করিতে পারিত না। পরীগণ অমরাবতী তুল্য বিলাসভবনে বাস করে, নানা প্রকার বিলাস-সামগ্রীতে পরিবেষ্টিত থাকে; তাহাদের ঐশ্বর্যও প্রচুর, তথাপি তাহারা জঠরানলের জ্বালায় ক্লেশ পায়!—বিধাতার লীলা এমনই চমৎকার!

একবার কতিপয় জিন অবগাহন কালে ক্ষুধার তাড়নে আকুল হইয়া বিরাট সাগরের লবণাম্বু খানিকটা গলাধঃকরণ করিল। জলপান করিবামাত্র তাহাদের অজ্ঞতারূপ আবরণ অপসারিত হইল। এতকাল তাহারা যে অন্নচিন্তারূপ জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতে পারে নাই, এখন সে মীমাংসা সহজেই হইয়া গেল। জ্ঞানের দিব্য চক্ষে তাহারা পথ দেখিতে পাইল।

সেইদিন উক্ত জনগণ মনস্থ করিল, তাহারা নানা দেশে গিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় করিবে। অতঃপর তাহারা মাকাল ফলে জাহাজ বোঝাই করিয়া বাণিজ্য-ব্যপদেশে যাত্রা করিল। জিনদের জাহাজখানি নানাস্থান ঘুরিয়া বিরাট সাগরের উপকূলে কনক দ্বীপের এক বন্দরে উপনীত হইল! কনক দ্বীপে একজাতি সুবর্ণকায় মানবের বসতি ছিল।

কনক দ্বীপের সমৃদ্ধিশালী নগর দেখিয়া জিন বণিকের চক্ষু স্থির হইল। তাহাদের ধারণা ছিল, যে তাহাদের দেশের মত ঐশ্বর্যশালী দেশ আর নাই—তাহারা "ধুলামুঠা ধরিলে সোণামুঠা' হয়! কিন্তু কনকদ্বীপের ভূমি রত্নগর্ভা! এখানে নানা জাতি সুস্বাদু ফলের গাছ আছে, তন্মধ্যে আম্রকানন প্রধান। এখানকার সুসভ্য ঋষিপ্রকৃতি রোকেয়া প্রধানত ফল ভক্ষণে জীবনধারণ করে। জিন বণিক মনে করিল, কোনরূপে একবার ইহাদিগকে ভুলাইতে পারিলে হয়। তখন তাহারা কনকদ্বীপবাসীদের নিকট হইতে মাকাল বিনিময়ে কতকগুলি সোণামুখী, আঁধারমাণিক প্রভৃতি আম্র লইল। এইরূপে প্রতি বৎসর মাকাল বোঝাই জাহাজ লইয়া আসিত আর আম্রপূর্ণ জাহাজ লইয়া যাইত। ক্রমে বাণিজ্য বেশ পাকিয়া উঠিল। কিন্তু তাহাদের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কনক দ্বীপে আম্রফলের দুর্ভিক্ষ হইতে লাগিল।

পরবৎসর বণিকেরা বিপণিতে আম্রের অভাব দেখিয়া চিহ্নিত হইল। তাহারা নগর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে আম্রের সন্ধানে বেড়াইতে লাগিল। গ্রামে গিয়া তাহারা দেখিল, হৈমন্তিক ক্ষেত্রসমূহ সুবর্ণ ধান্যে পরিপূর্ণ! কৃষককুল রাশি রাশি ধান্য লইয়া মনের আনন্দে গৃহে গমন করিতেছে। তদ্দর্শনে জিনেরা দীর্ঘনিঃশ্বস ত্যাগ করিল,—"ইহারা ক্ষুধার যন্ত্রণা জানে না!" অতঃপর কিঞ্চিৎ ইতস্তত করিয়া বণিক কৃষকের নিকট মাকাল বিনিময়ে ধান্য প্রার্থনা করিল। কৃষক তাহার ভাষা বুঝিল না; অপিচ ছোট ছোট হৃষ্টপুষ্ট বালক বালিকার দল সবিস্ময়ে জিনদের পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল; তাহারা কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে জিনদের সুন্দর বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল! বণিক মনে মনে ভাবিল, "একি রঙ্গ! আমরা এই কৃষক—শিশুদের তামাসার বিষয় হইলাম দেখি!"

---

১. জিন—নর। পরী—নারী।

আহারে!— "নিজ অন্ন পর কর পণ্যে দিলে
পরিবর্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে!"

যাহা হউক, কোন প্রকারে কৃষককে বণিকেরা নিজেদের মনোভাব জ্ঞাপন করিল। কৃষক প্রথমে মাকালের পরিবর্তে ধান্য দান করিতে অস্বীকৃত হইল; কিন্তু তাহার পুত্র বলিল, "আহা! দাও; ওরা ক্ষুধার্ত। আমাদের এত ধান আছে!

জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত পরীস্থানে প্রতি বৎসর বাণিজ্যতরীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এখন আর খাদ্যদ্রব্যের অপ্রতুলতা নাই, সুতরাং পরীদিগের আর কোন প্রকার ক্লেশ নাই। তাহারা মনের সাধে ঐন্দ্রজালিক রথারোহণে সময় সময় কনক দ্বীপে ভ্রমণ করিতে আসিত। তাহাদের সহিত কনকদ্বীপবাসিনী ললনাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা হইল। ফলে তাহারা পরীদের বেশভূষার অনুকরণ প্রয়াসী হইতে লাগিল! বাকি রহিল কেবল পরীর পাখা দুইটির অনুকরণ!

পূর্বে দুই একখানি জাহাজ বৎসরে একবার মাত্র মাকালের আমদানি হইত; পরে অসংখ্য তরীপূর্ণ মাকাল বৎসরে তিন-চারিবার কনক দ্বীপে আসিতে লাগিল। আর রাশি রাশি ধান্য পরীস্থানে রপ্তানি হইতে চলিল। মাকালের মায়া এমনই যে কৃষক আর কিছুইতে আত্মসংযম করিতে পারিতেছিল না। আর কৃষক সম্বৎসরের জন্য ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখে না; ক্রমে এমন হইল, অদ্য যে ধান্য ক্ষেত্র হইতে কর্তন করিয়া আনে, কল্য তাহা মাকাল বিনিময়ে বিক্রয় করে। সুতরাং কনক দ্বীপে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী আসিয়া ঘর বাঁধিল।

এই মাকাল বাণিজ্যের সময় একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। বিরাট সাগরতীরে একটি অপরূপ পেয়ারা গাছ হইয়াছিল। জ্ঞানফলের রসমিশ্রিত জল দ্বারা পুষ্ট হওয়ায় ঐ পেয়ারা ফল কিছু কিছু জ্ঞানফলের গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। জিন পরীগণ ঐ পেয়ারা নিজেদের জন্য সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিত। কিন্তু একদিন বণিকেরা যৎকালে জাহাজে মাকাল তুলিতেছিল, সেই সময়ে দৈবাৎ তরু-চূড়া হইতে গোটাকৃত পেয়ারা জাহাজে পড়িল। সেই পেয়ারা মাকালের সহিত কনক দ্বীপে আনীত ও বিক্রীত হইল।

কনকদ্বীপবাসী দুই চারি জন ভাগ্যবান ব্যক্তি পরীস্থান হইতে আনীত পেয়ারা ভক্ষণ করিয়া তাহার বীজ ফেলিয়া দিলেন। সেই বীজে কনকদ্বীপেও পেয়ারা গাছ হইল। ক্রমে শতাধিক বৎসর অতীত হইল।

*

পেয়ারা ফলের কল্যাণে কতিপয় কনকদ্বীপবাসী ভদ্রলোক এখন ভ্রান্তিস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিলেন! দীর্ঘ কালের,—শত শত বৎসরের মোহনিদ্রার পর এ কি তীব্র জাগরণ! অন্ধ চক্ষু প্রাপ্ত হইয়া ঘোর অন্ধকারে পড়িলেন!! তাঁহারা বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, জিনগণ এক মাকাল ফলের পরিবর্তে দেশের সর্বস্ব লইয়া গিয়াছে; এখন জলৌকার ন্যায় তাঁহাদের বুকের অবশিষ্ট রক্ত শোষণ করিতেছে! কনকের দৈন্য দুর্দশা দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় শতধা হইতে লাগিল।

আর সে আম্র কানন নাই; কোন স্বাদু ফলগাছেই আর ফল নাই; রত্নগর্ভা ধরণী ধূলিগর্ভা হইয়া পড়িয়াছে। ঘরে ঘরে "হা অন্ন! হা অন্ন!" আর্তনাদ উঠিয়াছে। পূর্বের মত কৃষকের আর কান্তিপুষ্টি নাই, তাহার দেহ কঙ্কালসার, পরিধানে শতগ্রন্থি চীর! কনকদ্বীপবাসীর আর কিছুই নাই; আছে কেবল মাকাল আর মাকাল! নগরে রাজপথের

দ্বিধারে পণ্য-বীথিকায় মাকাল; গ্রামে হাটে বাজারে মাকাল, গ্রাম্য মুদির দোকানে মাকাল,— সমুদয় দেশ মাকালে আচ্ছন্ন! এখন উপায়?

কনকদ্বীপবাসী শাপে বর প্রাপ্ত হইয়াছে, মাকালের সহিত জ্ঞানপেয়ারা লাভ করিয়াছে, সুতরাং উপায় ভাবিতে আর বিলম্ব হইবে না। তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল, আর মাকাল গ্রহণ করিবে না। আবালবৃদ্ধবনিতা,—সকলে এক যোগে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল, তাহারা আর মাকালের মায়ায় ভুলিবে না। তাহারা এখন যে নব উৎসাহ, প্রবল শক্তি লাভ করিয়াছে,—মাকালে নাকাল না হইলে এত শীঘ্র তাহা লাভে সমর্থ হইত না। এজন্য তাহারা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে জিনদিগকে শতবার ধন্যবাদ দিল।

এদিকে যথানিয়মে জিন সওদাগর পূর্ব অভ্যাস মত জাহাজ বোঝাই মাকাল লইয়া বন্দরে পৌঁছিল। কিন্তু এবার আর মাকাল বিক্রয় হইল না। যখন কিছুতেই বণিকেরা বেসারিত কূল কিনারা করিতে পারিল না, এবং ভারে ভারে নয়নরঞ্জন মাকাল পচিয়া নষ্ট হইতে লাগিল, তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া পরীস্থানে এই দুঃসংবাদ প্রেরণ করিল!

পরীস্থানে বণিক সভায় এ বিষয়ের তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল,—আন্দোলন প্রলয়ে বিরাট সাগরের সুগভীর শান্ত জল পর্যন্ত আলোড়িত হইল! পরিশেষে জনৈক গলিতদন্ত পলিতকেশ বৃদ্ধ বলিলেন, "অনুসন্ধান করিয়া দেখ, কনকদ্বীপবাসী কেন মাকালে বিরাগী হইল।"

বণিকদল কনকদ্বীপের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, নানা প্রকার জনরব শুনিয়া অবগত হইল যে, যাঁহারা পেয়ারার আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই মাকালের বিরোধী। সওদাগর এই সন্দেশ[১] মায়াবলে এক নিমেষেই পরীস্থানে প্রেরণ করিল। সেই দিনই বণিকনেতা আদেশ দিলেন, "কনকের পেয়ারা তরু সমূলে উৎপাটন কর।"

পুনরায় বণিকেরা মায়া সন্দেশবহ দ্বারা তাহাদের নেতাকে জ্ঞাপন করিল, "অত বড় মহীরুহ সমূলে উৎপাটন করা অসম্ভব। অতএব কি আদেশ?" বণিকনেতা তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা দিলেন, "উহার মূল ছেদন কর!"

পেয়ারা তরুর মূলে শত শত শানিত কুঠারের আঘাত পড়িতে লাগিল। তদ্দর্শনে কনকদ্বীপবাসী প্রথমে ত অবাক হইল, পরে বুঝিল, ব্যাপারখানা কি! তাহারা প্রথমতঃ অনুনয় বিনয় দ্বারা জিন বণিককে বৃক্ষচ্ছেদনে বাধা দিল,—পরে সওদাগরের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া সরোদনে নিষেধ করিল। কিন্তু জিনেরা কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। তখন কনকদ্বীপে ভয়ানক হৈ চৈ পড়িয়া গেল, শান্তিপূর্ণ দেশটির দিকে দিকে অশান্তি-অনল জ্বলিয়ে উঠিল! জিন তবু নাছোড়বান্দা! তাহারা বরং সুবর্ণকায়দিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল : "ঈশ্বর যখন জ্ঞানফল মানবের পক্ষে নিষিদ্ধ করিয়াছেন এবং এই ফুল গ্রহণদোষেই আদিমাতা স্বর্গবিচ্যুত হইয়াছিলেন, তখন নিশ্চয় জানিও এ ফল মানবের অতীব অনিষ্টকারী। অতএব তোমাদের পরম উপকারের জন্যই আমরা এত পরিশ্রম করিয়া এ গাছ কাটিতেছি।"

---

১. সন্দেশ শব্দের প্রকৃত অর্থ 'সংবাদ'। কিন্তু বর্তমানে 'সন্দেশ' হচ্ছে—মিষ্টি বিশেষ। —সম্পাদক

দেশের লোকেরা যথেষ্ট জ্ঞান বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা আর ফাঁকা তর্কে ভুলিবার পাত্র নয়! তাহারা বলিল, "তবে তোমরা ও ফল খাও কেন? আগে পরীস্থানের পেয়ারাগাছ কাট গিয়া, পরে আমাদের গাছ কাটিও। আর আদি জননী যখন ঐ ফল বিনিময়ে স্বর্গ-সুখ তুচ্ছ করিয়াছেন তখন ও ফলের মূল্য কত, তাহা সহজেই অনুমেয়। স্বর্গ হইতে আনীত ফল মর্ত্যে অবশ্য অবশ্য অতি যত্নে রক্ষণীয়।" কিন্তু সে কথা শুনে কে?—এ যে আঁতে ঘা!

বৃক্ষ কর্তন উপলক্ষে কনকে কিছুকাল খুব বাক্ বিতণ্ডা চলিতে লাগিল। এই সময় কোন অশীতিপর পণ্ডিত বলিলেন, "এ বিকৃত পেয়ারা গাছের জন্য তোমরা বৃথা কলহ কর কেন? ইহা ত সে আদি জ্ঞানফলের রূপান্তরিত ফল মাত্র। তোমরা হাভা কর্তৃক রোপিত সেই আদি বৃক্ষের অনুসন্ধান কর। শাস্ত্র পাঠে জানা যায়, তাহা পৃথিবীর পূর্বাংশে আছে। চল, আমরা তাহারই সন্ধানে যাই।" বৃদ্ধের কথামতে সকলে বর্তমান ছাড়িয়া অতীতের সন্ধানে চলিল! বৃদ্ধ পণ্ডিত কিন্তু তাহাদের সঙ্গে গেলেন না,— তিনি উপদেশ দান করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন।

অনেক দিনের পর্যটনে বহু নদ, নদী, জনপদ, পর্বত, প্রান্তর এবং অরণ্য অতিক্রম করিয়া কনকবাসীরা যথাস্থানে একটি সুবৃহৎ মৃত তরুর সন্নিকটে উপস্থি হইল। অনেক শাস্ত্র দেখিয়া, বহু কিম্বদন্তী শুনিয়া তাহারা শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে এই শুষ্ক তরুই আদি জ্ঞানবক্ষ। তখন মর্মান্তিক ক্ষোভে, দুঃখে, হতাশে তাহাদের বক্ষ বিদীর্ণ হইতে লাগিল! তাহারা এত পরিশ্রম করিয়া দীর্ঘ প্রবাসে আহার নিদ্রা তুচ্ছ করিয়া, এত কষ্ট সহিয়া এ দেশে আসিল এই মৃত তরুর জন্য? স্থানীয় লোকেরা বলিল, প্রায় দ্বিশতাধিক বৎসর হইল গাছটি মরিয়াছে। জনৈক আগন্তুক তদুত্তরে বলিল, "তবু ভাল, তোমরা যে অনুগ্রহপূর্বক ইহাকে ইন্ধনরূপে অনলে উৎসর্গ কর নাই, তাই রক্ষা!"

এখন কি করা যায়? কি উপায়ে জ্ঞানবৃক্ষ পুনর্জীবিত হইবে? কেহ বলিল, প্রাণপণে জল সেচন কর, কেহ বলিল, অশ্রুসেক কর; কেহ বলিল, হৃদয়ের শোণিত দান কর, ইত্যাকার নানা প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে লাগিল। এমনকি দুই-এক জন মানবের প্রাণবিনিময়ে যদি তরুবর সঞ্জীবিত হয়, তবে তাহারা তাহাতেও কুণ্ঠিত নয়।

সকলে শুষ্ক তরুর নানা প্রকার যত্ন করিতে লাগিল,—অশ্রুধারা-রক্তধারা—কিছুই দিতে কুণ্ঠিত হইল না! কিন্তু মৃত কবে সঞ্জীবিত হয়? সমুদয় চেষ্টা প্ররিশ্রম ব্যর্থ হইল দেখিয়া তাহারা মর্মাহত হইয়া নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিল। রোদনে ক্লান্ত হইয়া এক ব্যক্তি তরুমূলে শয়ন করিয়াছিলেন; তিনি তন্দ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন কোন সন্ন্যাসী বলিতেছেন :

"বৎস! ক্রন্দনে কোন ফল হইবে না। দুই একটি কেন, দুই লক্ষ নরবলি দান করিলেও জ্ঞানবৃক্ষ পুনর্জীবিত হইবে না। দুই শত বৎসর হইল এই দেশের অদূরদর্শী স্বার্থপর পণ্ডিত—মূর্খেরা ললনাদিগকে জ্ঞানফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করে; কালক্রমে ঐ নিষেধ সামাজিক বিধানরূপে পরিগণিত হইল এবং পুরুষেরা এ ফল নিজেদের জন্য একচেটিয়া করিয়া লইল। রমণীবৃন্দ এ ফলের চয়ন ও ভক্ষণে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় এ গাছের সেবা শুশ্রূষায় বিমুখ হইল। কালে নারীর কোমল হস্তের সেবা-যত্নে বঞ্চিত

সৃষ্টি তত্ত্ব

সে দিন গল্প করিতে করিতে আমাদের অধিক রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল, জিন, পরী, ভূত। কেহ শ্বেতশ্মশ্রু জিনকে নামাজ পড়িতে দেখিয়াছেন; কেহ দেখিয়াছেন, সিতবসনা পরী এবং কেহ ভূতকে মাছভাজা খাইতে দেখিয়াছেন! মিস ননীবালা দত্ত ঘুমাইয়া পড়িলেন আমি একটা সোফায় বসিয়াছিলাম। জাহেদা বেগম আমাকে শয়ন করিতে অনুরোধ করিয়া ল্যাম্প নিবাইয়া আপন কামরায় চলিয়া গেলেন। শিরীন বেগম আপন কামরায় না গিয়া আমারই পর্যঙ্কে শয়ন করিলেন। ল্যাম্প নিবিল, কিন্তু এক কোণে মোমবাতি জ্বলিতেছিল, তাহার আলোকে গৃহসজ্জা বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। বলিতে পারি না, আমি তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিলাম কি না, কিন্তু আমার বিশ্বাস আমি জাগ্রত ছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে ভয়ানক একটা শব্দ হইল। তাহাতে ননীবালা চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কিসের শব্দ হলো?"

"বলতে পারি না। কিছুদিন হলো আমি সংবাদপত্রে ছবি দেখেছিলুম, বিলেতে একটা এরোপ্লেন এঞ্জিন ভেঙে কোন বাড়ির ছাড়ের উপর পড়ে গিয়েছিল, আর এরোপ্লেনের আরোহী ভাঙ্গা ছাদ গলিয়ে অক্ষত শরীরে একেবারে কামরার ভিতর পালঙ্কের উপর গিয়ে পড়েছিল! আমাদের এ উলু খাওয়া ভাঙ্গা ছাদের উপরও কারুর এরোপ্লেন-টেন এসে পড়েনি ত? জানালা খুলে দেখুন না?"

মিসিস বীণাপাণি ঘোষ যথাবিধি পর্যঙ্কে শয়ন করিয়া গাঢ়নিদ্রা সুখ ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার দিকে চাহিয়া আমি বলিলাম, "বিছানা ছেড়ে উঠুন শিগগিরি!"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? আমি ননীকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা পুনরাবৃত্তি করিলাম।

ননী বলিলেন, "যে ঝম ঝম বৃষ্টি পড়ছে, জানালা খুলব কি করে। তাছাড়া আমার ভয় করে। আপনারা যত সব ভূতের গল্প বলেছেন!"

"আচ্ছা আমি জানালা খুলে দেখছি" বলিয়া বীণা গবাক্ষ খুলিয়া ফেলিলেন।

বাতায়ন খুলিবা মাত্র এক ঝাপটা বাতাস ও বৃষ্টি জল আসিয়া আমাদের ভিজাইয়া দিল—তৎসঙ্গেই মস্ত এক উল্কাপিণ্ড প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে আমাদের ত চক্ষু স্থির। গোলমাল শুনিয়া শিরীন জাগিয়া উঠিয়াছেন, অন্য কক্ষ হইতে আফসার দুলহিন দৌড়িয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাও নির্বাক! আমরা চিৎকার করিয়া বাড়িময় সকলকে জাগাইয়া তুলিব, না, ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিব, কিছুই স্থির করিতে না পারায় বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সেই অগ্নিস্তূপের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

অগ্নিস্তূপ ক্রমে এক জ্যোতির্ময় মনুষ্য মূর্তিতে পরিণত হইল। আমার মনে হইল, এই মহাপুরুষকে কোথায় যেন কখন দেখিয়াছি। কিন্তু ঠিক চিনিতে পারিলাম না। কারণ, মানুষের মুখ চিনিয়া রাখা আমার অভ্যাস নয়, সেজন্য অনেক সময় অপ্রস্তুতও হইতে হইয়াছে। আগন্তুক অগ্নিমূর্তি বলিলেন,—

"বৎসে! তোমরা অত্যন্ত ভয় পাইয়াছ? আমি অভয় দিতেছি, কোন ভয় নাই।"

শিরীন। সে দিন আমাদের এখানে একটা টিকটিকি বোবা ফকির সাজিয়া আসিয়াছিল, আপনি তাহাদেরই কেহ নাকি?

হওয়ায় জ্ঞানবৃক্ষ মরিয়া গিয়াছে! যাও, তোমরা দেশে ফিরিয়া যাও; এখন সেই পেয়ারার বীজ বপন কর গিয়া। জিনগন যে গাছ কাটিতে চাহে কাটুক; তোমরা তাহাদের বাধা না দিয়া গোপনে বীজ সঞ্চয় করিয়া রাখিও। এখন তোমরা নরনারী উভয়ে মিলিয়া নবঁ রোপিত পেয়ারা চারার যত্ন করিও, তাহা হইলে আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে। সাবধান! আর কন্যাজাতিকে পেয়ারায় বঞ্চিত করিও না! নারীর আনীত জ্ঞানফলে নারীর সম্পূর্ণ অধিকার আছে, একথা অবশ্য স্মরণ রাখিবে!" নিদ্রাভঙ্গে তিনি এই স্বপ্নবৃত্তান্ত সঙ্গীদিগকে বলিলেন, তাহারা ইহা শুনিয়া সকলে একবাক্যে বলিল, চল তবে ফিরিয়া যাই। জনৈক উদারহৃদয় ভদ্রলোক বলিলেন, "তাই ত, পুরুষেরা নদী পার হইয়া কুমীরকে কলা দেখাইয়াছিল,—নারীর আহৃত জ্ঞানে নারীকেই বঞ্চিত করিয়াছিল, —তাহার ফল হাতে হাতে!"

কনকদ্বীপের উদ্যমশীল বালকেরা উদ্যানের এক কোণে খানিকটা স্থান পরিষ্কার ও চিহ্নিত করিল, পরে বালিকাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আইস ভগিনি! তোমরাও যোগদান কর; আমরা কোদালি দ্বারা ভূমি প্রস্তুত করি, তোমরা স্বহস্তে বীজ বপন কর! আজি কি শুভদিন, এখন হইতে আমাদের নিজের গাছ হইবে।" বিস্ময়স্তম্ভিত জিনেরা নীরবে দাঁড়াইয়া চাহিয়া রহিল, কনকবাসীর এ শুভকার্যে তাহারা বাধা দিতে পারিল না। নব উৎসাহে অণুপ্রাণিত কনকবাসীদের এ মহৎ কার্যে—জিন দূরে থাকুক,—দৈত্যও এখন বাধা দিতে অক্ষম!

অতঃপর কনকদ্বীপ পুনরায় দ্বিগুণ ত্রিগুণ ধনধান্যে পূর্ণ হইল; অধিবাসীগণ পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। তাহারা আর কোন প্রকার ইন্দ্রজালে ভুলিবার পাত্র নয়! কারণ এখন ললনাগণ জ্ঞান কাননের অধিষ্ঠাত্রী হইয়াছেন।

'কনকের রূপকথা' অমৃত সমান,
মৃত ব্যক্তি যদি শুনে পায় প্রাণদান!

ননী। আপনারা মওলানা সাহেবের বাড়ির কাছে বাসা নিয়াছেন, তাই ত টিকটিকির উপদ্রব।

অগ্নিমূর্তি। (সতেজে) না মা! আমি সে সব কিছুই নই। আমি বিশ্বস্রষ্টা ত্বস্তি।

"ত্বস্তি" নাম শ্রবণ করিবা মাত্র বীণা ও ননী তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তখন আমারও স্মরণ হইল, কলিকাতায় "নারী সৃষ্টি" লিখিবার সময় আমি এই জ্যোতির্ময় মহাত্মার দর্শনলাভ করিয়াছিলাম। আমরা সসম্মানে ত্বস্তিদেবকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলাম। বীণা বলিলেন, "অসময়ে নরলোকে পদধূলি (বর্ষাকালে "ধূলি" না বলিয়া "পদকর্দম" বলিতে হয়!) দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

ত্বস্তি। কারণ? (আমার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া) কারণ ঐ মেয়েটা!

আমি সবিস্ময়ে, সভয়ে, সবিনয়ে বলিলাম, "মহাত্ম্য বলেন কি, আমি?"

ত্বস্তি। হ্যাঁ, তুমি! আমার নারী সৃজনের ইতিহাস বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া এই গোলমাল বাধাইয়াছ। তা, তোমারই বা দোষ কি; কতক দোষ "সওগাত" আফিসের।

ননী। সে কি রকম?

ত্বস্তি। তাহা এই ঃ ইনি ইনি "নারী সৃষ্টি" লেখাটা "সওগাত" নামক মাসিক পত্রিকায় দিয়াছিলেন। সে সময় সম্পাদক মহাশয় কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন না, আফিসের গণ্ডমূর্খগুলো ইহার লিখিত পাদটীকা দুইটি বাদ দিয়া তাহা প্রকাশ করে। পাদটীকা অভাবে রচনাটি স্থলবিশেষে দুর্বোধ হইয়াছে। সুতরাং সুবোধ পাঠকেরা উহা সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারায় তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না! তখন তাঁহারা বলেন,"ডাক ব্যাটা ত্বস্তিকে, ইহার কোথায় কি ভ্রান্তি আছে, বুঝাইয়া দিয়া যাউক!" তাই দেখ না, সময় নাই, অসময় নাই, একটা প্ল্যানচেট পাইলেই ইহারা আমাকে সুরলোক হইতে ডাকিয়া আনিয়া বিরক্ত করে। অদ্যকার ঘটনা শুন : কতকগুলি যুবক "সত্যগ্রহ" ব্রত লইয়া মাতিয়াছে। রাজপুরুষেরা বলেন, 'তোমরা "সত্যগ্রহ" ছাড়িয়া "মিথ্যাগ্রহণ" কর। কিন্তু ইহারা অবোধ বালক, হিতোপদেশ মানে না। "মিথ্যাগ্রহণ" না করার ফলে পুলিশের তাড়াহুড়া খাইয়া দুইজন উকিল বাবু পলাইয়া রাঁচি আসিয়াছেন। তোমাদের বাড়ির অদূরেই তাঁহাদের বাসা। কিন্তু জান, 'চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী।" রাঁচির এই অবিরাম বৃষ্টি কাদাতেও তাহাদের শান্তি নাই। তাঁহারা আদা জল খাইয়া, দিনেরবেলা বালি কাঁকর কাদা জল মাখিয়া "মিথ্যাগ্রহণ" এর বিরুদ্ধে সত্যপ্রচার প্রয়াসে লেকচার দিয়া দিয়া দেশের শান্তি নষ্ট করিয়া বেড়ান; আর রাত্রিকালে দুই বন্ধুতে প্ল্যানচেট লইয়া দেবলোকের শান্তিভঙ্গ করেন! রাত্রি ১২টা/১টা পর্যন্ত উকিল বাবুদের ডাকাডাকির জ্বালায় অস্থির থাকিতে হয়। তোমাদের নরলোকে যা হোক শান্তিনেশে যুবকদের শাস্তি দিবার জন্য সি. আই. ডি. আছে; কিন্তু সুরলোকে তাহাদের জব্দ করিবার জন্য কোন ব্যবস্থাই নাই। তাই দেখ না, এত রাত্রে উকিল বাবুদের বাসা হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় আমার বাষ্পরথ তোমাদের ছাদের কলসে আটকাইয়া পড়ে, আমিও সশব্দে পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছি। বৃদ্ধ বয়সে বৃষ্টি ভেজা সহ্য হয় না, তাই যেমনই বীরবালা বীণা বাতায়ন খুলিয়াছেন, অমনি আমি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছি।

ননী। কিন্তু দেব! বাতায়নে লোহার গরাদে আছে যে।

ত্বস্তি। আরে, রাখ তোমার উইদষ্ট গরাদে! বিশেষত আমাকে আটকায় কে?

ননী। দেব! আপনি কি কি উপাদানে পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা জানিতে বড় কৌতূহল হয়।

তৃপ্তি। না বাছা! আমার সময় নাই। এখন আমি আসি। তোমরা ঘুমাও।

কিন্তু আমরা সকলেই তাঁহাকে বেশ করিয়া ধরিয়া বসিলাম। পুরুষ সৃষ্টির রহস্য না শুনিয়া তাঁহাকে কিছুতেই যাইতে দিব না।

শিরীন। আপনি অনেকক্ষণ বৃষ্টিজলে ভিজিয়াছেন, এক পেয়ালা গরম চা খাবেন। আপনি গল্প বলুন, আমি চা প্রস্তুত করিতে বলি। (অতঃপর তিনি উচ্চঃস্বরে ডাকিলেন) মারো—

তৃপ্তি। (সচকিতে) সে কি? কাহাকে মারিবে?

শিরীন হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া আঁচলে মুখ ঢাকিয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

তৃপ্তি। উনি লাঠিয়াল ডাকিতে গেলেন না কি?

বীণা। (কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া) না, তিনি চাকরাণী ডাকিতে গেলেন। উঁহার চাকরাণীর নাম "মারো"![১] আপনি এখন গল্প বলুন। ঐ দেখুন, শিরীন বেগম সাহেবাও ফিরিয়া আসিয়াছেন।

তৃপ্তি। তোমরা নেহাৎ ছাড়িবে না, তবে আর কি করা। তোমরা মেয়েরাও দেখিতেছি, উকিল বাবুদের চেয়ে কম নও! তাঁহারা তবু আইন কানুনের দোহাই মানেন, তোমরা কিছুই মান না। শুনিলে ত তোমাদের মনে থাকিবে না। তবে ননি, তুমি কাগজ কলম লইয়া বস। আমি বলিয়া যাই, তুমি তাড়াতাড়ি লিখ। দেখ, খুব দ্রুতগতিতে লিখিবে।

ননী যতক্ষণ কলম দোয়াত অন্বেষণ করিতেছিলেন, ততক্ষণে বীণা কাগজ পেন্সিল হস্তে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "দেব! সময়ের অল্পতার জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। আপনি বলুন, আমি শর্টহ্যান্ডে লিখিয়া ফেলিতেছি। আমি মিনিটে শর্টহ্যান্ডের তিন শত শব্দ লিখিতে পারি।" ইহা শুনিয়া মহাত্মা তৃপ্তি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলেন, বীণা লিখেন, আর আমরা নীরবে শ্রবণ ও দর্শন করিতে লাগিলাম।

দেখিলাম, বেচারা তৃপ্তিদেব নিদ্রায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন। তিনি কখনও বা হাই তুলিয়া ঘুমে ঢুলু ঢুলু নয়নে অনুচ্চস্বরে বলিতেছিলেন; আবার কখনও চক্ষুমর্দন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছিলেন এবং বীণা ঠিক লিখিয়াছেন কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলেন। ভুল থাকিলে তাহা কাটিয়া পুনরায় লিখাইতেছিলেন। তিনি যে নিদ্রা-কাতর নহেন, এতখানি, বাগাড়ম্বর দ্বারা যেন তাহাই প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন! একবার তিনি গর্জনস্বরে বলিলেন,

---

১. বেচারি চাকরাণীর সুন্দর "মরিয়ম" নামটি বিকৃত হইয়া "মারো"তে পরিণত হইয়াছে। আমি বেহার অঞ্চলে থাকাকালীন অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের কতিপয় মহিলার নাম শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। যথা— "হাশো", "লাতো", "দল্লু" "উল্লু জুব্বা" ইত্যাদি। নামগুলির স্বরূপ না দেখাইলে উহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে এবং পাঠিকা ভগিনী ও তৃপ্তিদেবের মত ভীত হইতে পারেন। তবে শুনুন, "হাশমত আলা" "লতিফন্নেসা", "দৌলতন্নেসা" "অলিউন্নেসা" এবং "জোবেদা"।

ইসলাম

কোন ধর্ম পরীক্ষা করিতে হইলে, আমাদিগকে চারিটি বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয়। সর্বপ্রথম সেই ধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস, যাহার প্রভাব তাহাতে (সেই ধর্মে) লুক্কায়িত থাকে। দ্বিতীয়, তাহার প্রকাশ্য বা বাহ্যিক মত অথবা শাখা পল্লব, যাহার সহিত সাধারণে সম্পর্ক রাখে। তৃতীয়, ধর্মের দর্শন যাহা বিগ্নান এবং সুশিক্ষিত লোকদের জন্য। চতুর্থ, ধর্মের গূঢ় রহস্য, যাহাতে সাধারণত মানবের আপন অহং বা অস্তিত্বজ্ঞানের ভাণ্ডারের সহিত মিশিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা প্রকাশ পায়। আমি এই কষ্টিপাথরে ইসলামকে পরীক্ষা করিয়া আপনাদিগকে দেখাইতে চাই যে, সর্বপ্রথমে আরব ও শামদেশের অবস্থার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া দেখুন, সে দেশের কি দশা ছিল।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন সমস্ত আরব, শাম ও আজমদেশে অসভ্যতার ঘোর অন্ধকারে কুসংস্কারের প্রবল ঝঞ্ঝানিল বহিতেছিল; যুদ্ধকলহ ও পরস্পরের রক্তারক্তি এক দলকে অন্য দল হইতে পৃথক করিতেছিল; হিংসা দ্বেষ এমন প্রবল ছিল যে, একই বিষয়ের ঝগড়া কয় পুরুষ পর্যন্ত চলিত; যথা এক ব্যক্তি কোন বিষয় লইয়া অন্য একজনের সহিত বিবাদ করিল, অনন্তর শত বৎসর পরে একের পৌত্র অপরের পৌত্রকে শুধু এই অজুহাতে হত্যা করিত যে, "ইহার পিতামহ আমার পিতামহের শত্রু ছিল!" ইহা সেই আরব দেশ—সেখানে কেবল এই কথায় যুদ্ধ আরম্ভ হইত যে, "তোমার উষ্ট্র আমার উষ্ট্রকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইল কেন?" বাস, এই সামান্য কারণে রক্তনদী প্রবাহিত হইত— শবরাশি স্তূপীকৃত হইত! এই সেই আরব দেশ— যেখানে নিষ্ঠুর পিতা, মাতার ক্রোড় হইতে শিশু কন্যাকে কাড়িয়া লইয়া গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে জীবন্ত প্রোথিত করিয়া আসিত। আর নিরুপায় মাতা আপন স্বাভাবিক মাতৃস্নেহপূর্ণ হৃদয়ের অসহ্য বেদনা লইয়া মরমে মরিয়া থাকিত। স্ত্রীলোক হওয়ার দরুণ পাষণ্ড স্বামীর ঐ নির্মম অত্যাচারে আপত্তি করিতে পারে, এতটুকু ক্ষমতাও তাহার ছিল না। কাহাকেও জামাতা বলিতে না হয়, এইজন্য কন্যা হত্যা করা হইত। ইহা সেই দেশ, যেখানে ঘৃণিত পৌত্তলিকতা বিরাজমান ছিল— ঘরে ঘরে নতুন দেবতা; এক ঠাকুর আবার অন্য ঠাকুরের প্রাণের শত্রু। প্রতিমার সম্মুখে নরবলিদান' ত নিত্য ক্রীড়া ছিল; যেখানে মানবজাতির প্রতি স্নেহ মমতার পরিবর্তে বিলাসিতা ও আত্মপরায়ণতা পূর্ণ মাত্রায় রাজত্ব করিত। যে কোন প্রবল ব্যক্তি আপন দুর্বল প্রতিবেশীকে বিনা কারণে কিম্বা অতি সামান্য কারণে হত্যা করিয়া ফেলিত; তাহার ঐ দুষ্ক্রিয়ায় বাধা দিবার লোক'ত দূরে থাকুক, একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবারও কেহ ছিল না।

তদানীন্তন আরবে বিলাসিতার ও অন্যান্য "মকারাদি" কুক্রিয়ার অন্ত ছিল না; এক স্বামী ভেড়া ছাগল প্রভৃতি পশুর ন্যায় অসংখ্য ভার্য্যা গ্রহণ করিত; আর এই বিষয়ে গৌরব করা হইত যে অমুক ধনী ব্যক্তি এত সংখ্যক স্ত্রীর স্বামী। ঈশ্বরের সৃষ্টি—স্ত্রীজাতি এমন জঘন্য দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধা ছিল যে, তাহারা নিতান্ত অসহায় গৃহপালিত পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিত। মোটের উপর এমন কোন নিকৃষ্ট পাপ ও জঘন্য দোষ নাই, যাহা তৎকালীন আরবে না ছিল।

"জান বৎসেগণ! কন্যা রচনার সময় আমার হস্তে কোন বস্তুই ছিল না; সুতরাং আমাকে কোন দ্রব্যের গন্ধ, কোন বস্তুর স্বাদ এবং কোন পদার্থের বাষ্প মাত্র সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পুরুষ নির্মাণের সময় আমাকে কিছুমাত্র ভাবিতে হয় নাই। আমার ভাণ্ডারে সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ছিল,—হস্ত প্রসারণ করিলে যাহা হাতে ঠেকিয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। যথা—দন্ত নির্মানের সময় *সর্পের বিষদন্ত* আমূল লইয়াছি; হস্ত পদ নখ প্রস্তুত করিতে শার্দ্দূলের সমস্ত নখর লইয়াছি, মস্তিষ্কের কোষসমূহ (cells) পূর্ণ করিবার সময় *গর্দভের গোটা মস্তিষ্কটাই* ব্যবহার করিয়াছি। নারী সৃজন কালে আমি শুধু অনলের উত্তাপ লইয়াছিলাম; পুরুষের বেলায় একেবারে *জ্বলন্ত অঙ্গার* লইয়াছি। বাছা! তুমি তাহাই লিখ।"

বীণা লিখিলেন, (জ্বলন্ত অঙ্গার)।

ত্বস্তি। বৎসে! মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর, রমণীর বেলায় আমি তুহিনের শৈত্যটুকু মাত্র লইয়াছিলাম পুরুষের বেলায় *তুষার খণ্ড*,—এমনকি আস্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা ব্যবহার করিয়াছি। তাহা কি তুমি লিখিয়াছ বীণা?

বীণা কাগজ দেখাইলেন- (তুষার কাঞ্চনজঙ্ঘা)

শিরীন। আগ্নেয়গিরি বিসুবিয়াস (Visuvius) এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা যে পাশাপাশি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাই আমরা পুরুষের নিজের ভাষায়ই পুরুষের বর্ণনা এইরূপ দেখিতে পাই যে এখনই—

"জ্বলিল ললাট বহ্নি প্রদীপ্ত শিখায়
বহ্নিময় হৈল সেই শূন্যব্যাপী দেশ,
ধরিল, সংহার মূর্তি, রুদ্র ব্যোমকেশ
গর্জ্জিয়া সংহার শূল করিলা ধারণ।"

আবার পর মুহূর্তেই (অবশ্য "পার্বতী বাক্যেতে রুদ্র ত্যাজি উগ্রভাব")

'সহাস্য বদনে ইন্দ্রে সম্ভাষি কহিলা,
আখণ্ডল, বৃত্রবধ অনুচিত মম।"

শ্রুতলিপি শেষ হইলে মহাত্মা ত্বস্তি বলিলেন, "দেখ বাছা! তুমি ইহা সহজ ভাষায় লিখিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবে, যেন একটি শব্দ, এমন কি একটি ছেদ পর্যন্তও এদিক ওদিক না হয়।"

বীণা। তাহাই হইবে; আপনি ভাবিবেন না। আমি বেশ সাবধানে লিখিব। নচেৎ প্রভুর অত্যন্ত কষ্ট হইবে— এখন ত কেবল পুরুষেরা ডাকাডাকি করে, তখন মেয়েরাও জ্বালাতন করিয়া মারিবে!

অতঃপর ত্বস্তিদেব বিদায় হইলে সকলে যে যাহার শয্যা আশ্রয় করিলেন। কিন্তু আমি শয়ন করিতে যাইবার সময় কি জানি কিরূপে পড়িয়া গেলাম। সেই পতনে আমি চমকিয়া উঠিলাম। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি আমি তখনও সোফায় বসিয়া; গৃহকোণে মোমবাতিটা মিটিমিটি জ্বলিতেছে, আর শিরীন ও বীণা মড়ার সহিত বাজী রাখিয়া ঘুমাইতেছেন! দূরাগত কুক্কুটধ্বনি শ্রবণে বুঝিলাম, রজনীর অবসান হইয়াছে। তবে কি এতক্ষণ আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম?

সেই স্বার্থ, অত্যাচার ও আত্মপরতার পূতিগন্ধময় জলবায়ু পরিবেষ্টিত এক কোরেশগৃহে একটি শিশু (সে পবিত্র শিশুরত্নের উদ্দেশে সহস্র দরুদ!) জন্মগ্রহণ করিলেন, যাঁহার পিতা তাঁহার জন্মের কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আর তিনিও সেইরূপ পিতা ছিলেন, যিনি তদীয় পিতৃকর্তৃক কোন প্রতিমার সম্মুখে নরবলিরূপে আনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশত দেবালয়ের সেবিকার কৃপায়– সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন।[১] এই শিশু এমন একটি হতভাগিনী দুঃখিনী নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ইনি ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেই বিধবা হইয়াছিলেন,– আর দারুণ বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া কয়েক মাস পরেই এ অবোধ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিঃসহায় অবস্থায় ফেলিয়া স্বামীর অনুগমন করেন। ইহার ফলে এই পিতৃমাতৃহীন শিশু কিছুদিন স্বীয় পিতামহ কর্তৃক প্রতিপালিত হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার পিতামহও কয়েক বৎসর পরে দেহত্যাগ করিলেন। তখন সেই অসহায় বালক বয়োপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত, স্বীয় পিতৃব্য আবু তালেবের আশ্রয়ে রহিলেন। ইহা ত অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে, এইরূপ বিপদগ্রস্ত পিতৃমাতৃহীন সহায়সম্পদশূন্য একটি অজ্ঞান বালক যে শিক্ষাদীক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। বাস্তবিক কার্যতঃও তাহাই হইয়াছিল। শিক্ষা, বা অধ্যয়ন বলিতে একটি অক্ষরের সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় হয় নাই, নীতি বা আচার নিয়মের অনুশাসনের বাতাস পর্যন্ত তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তথাপি তাঁহার শৈশবকাল, অতি পবিত্র জীবনের উচ্চ আদর্শ ছিল। তাঁহার নির্মল জীবনে মানবের বাঞ্ছনীয় যাবতীয় সদ্‌গুণরাজি—যথা, দয়া, সৌজন্য, প্রেম, ধৈর্য, নম্রতা, বিনয়, শান্তিপ্রিয়তা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি স্বভাবতঃ বিরাজমান ছিল। তিনি নানা গুণে সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বাল্যজীবন অতিক্রম করিয়া তিনি কৈশোরে উপনীত হইলেন। এখন জীবিকা-অর্জনের নিমিত্ত তিনি আপন কোন বিধবা আত্মীয়ার গৃহে কর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। উক্ত বিধবা খদিজা বিবি তাঁহাকে পণ্যদ্রব্যসহ বাণিজ্য উপলক্ষে শামদেশে প্রেরণ করিতেন। এই বিষয়কর্মে খদিজা বিবি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার এই নূতন কর্মচারী অতিশয় ধর্মভীরু, ন্যায়পরায়ণ, মিতব্যয়ী এবং অতি বিশ্বাসী। অতঃপর তিনি ইঁহার সহিত পরিণীতা হন।

ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এই নবীন যুবক যাঁহার নাম মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওসাল্লাম) ছিল, সে সময়ে পয়গম্বর হন নাই। আর তাঁহার পত্নী হজরত খদিজাও তাঁহার ধর্মবিশ্বাসের অনুবর্তিনী ছিলেন না; তিনি স্বয়ং অল্পবয়স্ক তরুণ এবং তাঁহার জায়া তদপেক্ষা দ্বিগুণ বয়োজ্যেষ্ঠা ছিলেন। কিন্তু বিবাহের পর তাঁহারা এমন সুখের দাম্পত্য জীবন ভোগ করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীতে তেমন মধুর দাম্পত্যজীবনের উচ্চ আদর্শ আর কেহ দেখাইতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ—আর তেমনই ভাবে তাঁহাদের বিবাহ জীবনের পূর্ণ ২৬ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। তাহার পর হজরত খদিজার মৃত্যু হইল। অতঃপর পয়গম্বর সাহেবের স্বভাব চরিত্র ও কার্যকলাপ সর্বদাই অতি প্রশংসনীয় ছিল। যখন তিনি মক্কার সঙ্কীর্ণ গলিকুচাতে যাতায়াত করিতেন, সে

সময় তত্রত্য ক্রীড়ারত অবোধ শিশুগণ তাঁহার পদযুগল জড়াইয়া ধরিত, আর তিনি সততই তাহাদের সহিত স্নেহসিক্ত মিষ্টভাষায় কথা বলিতেন, তাহাদের মস্তকে হস্তামর্শন করিতেন। কেহ কখনও শুনে নাই যে, তিনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াছেন। তিনি সর্বদা বিপদগ্রস্তের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকিতেন; বিধবা ও পিতৃহীন শিশুদের সান্ত্বনা ও প্রবোধ দান তাঁহার নিত্য কর্ম ছিল। প্রতিবেশীবর্গ তাঁহাকে "আমীন" (বিশ্বস্ত) বলিয়া ডাকিত। "আমীন" শব্দের অর্থ বিশ্বাসভাজন—এমন উচ্চ ভাবপূর্ণ উপাধি কেবল শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিই বিশ্ব জগতের নিকট প্রাপ্ত হইতে পারে। এখন আপনারা একটু চিন্তা করিয়া দেখুন ত; যে ব্যক্তির বাহ্যিক জীবন জগতের পক্ষে এমন উপকারী এবং সুখ শান্তিপ্রদ ছিল, তাঁহার আভ্যন্তরীণ জীবন কেমন হইতে পারে। অহো! (সত্য তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত) তাঁহার আন্তরিক ব্যাকুলতার বন্যাস্রোতের তাড়না তাঁহাকে বনে বনে ও জনপ্রাণিশূন্য মরুভূমে ভাসাইয়া লইয়া যাইত। তিনি কতবার দিবানিশি অনশনে অনিদ্রায় বিপদসঙ্কুল পর্বতকন্দরে বাস করিতেন। তিনি যেভাবে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ঈশ্বর-অনুসন্ধান করিতেন, তাহা বর্ণনা করিবার উপযুক্ত ভাষা দুর্লভ; অথবা ইহার মর্ম কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারেন, যাঁহারা একাগ্রচিত্তে খোদার পথে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

ক্রমে হজরত মোহাম্মদের (দ) এই প্রকার ধ্যান-আরাধনা এত বৃদ্ধি পাইল যে, তিনি লোকালয় পরিত্যাগপূর্বক দূরে—অতি দূরে—ঘোর অরণ্যে চলিয়া যাইতেন; দুর্গম ও ভয়ঙ্কর গিরিগুহায় মাসাধিককাল পর্যন্ত বাস করিতেন— সেখানে শুধু সিজদায় (নতশিরে) পড়িয়া অনবরত রোদন ও বিলাপ ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন কাজ ছিল না। এমনকি তিনি অন্যূন পঞ্চদশ বর্ষ এইভাবে যাপন করিলেন— অবশেষে সেই শুভ মুহূর্ত আসিল, যখন দৈববাণী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "উঠ! খোদায় পাকের (পবিত্র ঈশ্বরের) নাম উচ্চারণ কর!" কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন না, সে শব্দ কাহার; অথবা ঐ আকাশবাণী বাস্তবিকই বিশ্বাসযোগ্য দৈববাণী কি না? কারণ তিনি বেশ জানিতেন যে, তিনি নিরক্ষর লোক ছিলেন। তাঁহার সন্দেহ হইত যে, ইহা হয়ত তাঁহার ভ্রম বা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র—কিম্বা তাঁহার অহংজ্ঞান তাঁহাকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত ঐরূপ শব্দ করিতেছে; এবং সম্ভবতঃ ইহা সেই দৈববাণী নহে, যাহা স্বয়ং খোদাতালার নিকট হইতে পয়গম্বরগণ শুনিতে পাইতেন, যাহাকে "এলহাম" কিম্বা "অহি" বলে।

অবশেষে আর একবার যখন তিনি ঈশ্বর-চিন্তায় অত্যন্ত আকুল ছিলেন, সহসা তাঁহার চতুষ্পার্শ্ব এক অলৌকিক স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, আর সেই আলোকরাশির মধ্যে একটি জ্যোতিষ্মান মূর্তি দেখা দিয়া বলিলেন, "যাও, সত্য নাম উচ্চারণ কর।" একবার সাহসে ভর করিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কাহাকে ডাকিব?" ইহার উত্তরে স্বর্গদূত তাঁহাকে ঈশ্বরের একত্ব, ফেরেশ্‌তাদের রহস্য, পৃথিবীর সৃষ্টি এবং মানবজাতির অস্তিত্ব বিষয়ে শিক্ষাদান করিলেন এবং তাঁহাকে সেই দায়িত্বপূর্ণ গুরুতর কর্মভারের (পয়গম্বরীর) কথাও বলিলেন, যে জন্য তাঁহার জন্ম হইয়াছে। অর্থাৎ দেবদূত বলিয়া দিলেন যে, তাঁহাকে বিশ্ব জগতের ধর্মপথ প্রদর্শক এবং উপদেষ্টার কার্যভার সমর্পণ করা হইয়াছে।

এদিকে দেবদূত অদৃশ্য হইলেন, ওদিকে হজরত মোহাম্মদ (দ) যিনি এখন হইতে আরব দেশের পয়গম্বর নামে অভিহিত হইবেন, অত্যন্ত অস্থির ও ভীতি বিহ্বল চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অর্ধ অচৈতন্য অবস্থায় ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন। পতিপ্রাণা সতী হজরত খদিজা উপযুক্ত শুশ্রূষা সহকারে তাঁহার তাদৃশ বিহ্বলতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যুত্তরে পয়গম্বর সাহেব আনুপূর্বিক সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় ইহা আমার মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ।" ইহাতে পতিপরায়ণা সাধ্বী রমণী অতিশয় সান্ত্বনাপূর্ণ মধুর বচনে তাঁহার নিস্তেজ হৃদয়ে বল সঞ্চার করিয়া বলিলেন, "না, না, তুমি সত্যবাদী—বিশ্বাসী—"আমীন"; প্রতিজ্ঞা পালনে যত্নবান; পিতৃহীনের প্রতি স্নেহ বর্ষণ কর; দরিদ্র, আতুর ও বিধবার প্রতি দয়া করিয়া থাক— এমন লোককে বিশ্বপিতা কখনই অকালে নষ্ট করিবেন না। প্রভু খোদাতালা কখনও বিশ্বাসী ভক্তদিগকে প্রবঞ্চনা করেন না। উঠ, এখন সেই দৈববাণী— প্রকৃত সত্য দৈববাণীর প্রত্যাদেশ অনুসারে কার্য কর।"

সেই পুণ্যবতী মহিলা, যিনি সর্বপ্রথমে পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন,— এমনই সঞ্জীবনীসুধা পূর্ণ প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন যে তিনি— যিনি নিজের দুর্বলতায় জড়ীভূত ও নিরুদ্যম হইয়া সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করিয়া বসিয়াছিলেন, এখন পূর্ব সাহসে ও উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে, একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন! আর সে মোহাম্মদ কেবল মোহাম্মদ মাত্রই রহিলেন না— বরং প্রবল প্রতাপশালী পয়গম্বর হইয়া গেলেন! তিনি একটা অসভ্য, অরাজক দেশকে শান্তিপূর্ণ এবং একটা জনপ্রাণীবিরল নগণ্য উপদ্বীপকে এক মহা সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী ইউরোপে ধর্ম ও জ্ঞানের আলোক লইয়া গেলেন, এই দুইটি বস্তু যেখানে প্রায় ছিলই না। তাঁহার অনুবর্তিগণ পৃথিবীতে বড় বড় সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থানে করিলেন। তাঁহার সমবিশ্বাসীগণ এমন নিষ্ঠার সহিত এলাহীর ধ্যান ও স্মরণে নিমগ্ন হইলেন যে, তাহার আদর্শ অন্য কোন ধর্মে পাওয়া সম্ভবপর কি না সন্দেহ। কারণ আপনারা একটু চিন্তা করিলে এবং ন্যায়চক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবেন যে, অন্য কোন ধর্ম এমন নাই, যাহাতে এমন অকপটহৃদয় সত্যবিশ্বাসী লোক পাওয়া যায়। এই জ্ঞান বিশ্বাস তাহারা (মুসলমানেরা) আরবদের পয়গম্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে।

যদি বেন সাহেবের কথামত ইহাই সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় যে, সাধারণ আচার ব্যবহার হইতে ধর্মবিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে আপনারা ঐ ধর্মের অনুবর্তিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন এবং ভাবিয়া দেখুন, তাঁহার (হজরতের) বাক্যসমূহ তাঁহার শিষ্যবর্গের হৃদয়ে কেমন স্পষ্টভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। মুসলমানেরা আরবের পয়গম্বর হইতে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের বিশ্বাস এমন সুদৃঢ় যে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ স্থান পায় না।

একজন মুসলমান— যদ্যপি এমন কোন স্থানে এমন কতকগুলি লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, যাহারা তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের ছুরিকায় খণ্ড খণ্ড করে এবং তাহার পয়গম্বরের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে— নমাজে মস্তক অবনত করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হয় না।

আপনারা আরও একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন, পয়গম্বরের সুপারিশের (শাফা'আতের) প্রতি তাহাদের বিশ্বাস কেমন অটল যে, তাহারা মৃত্যুভয় একেবারে জয় করিয়া ফেলিয়াছে। আফ্রিকার দরবেশবৃন্দের সৎসাহসের তুলনা কেহ আমাকে দেখাইতে পারেন কি?— যাঁহারা ভয়ঙ্কর রক্তপিপাসু তোপ- কামানের সম্মুখে স্থিরভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবার জন্য এমনই আনন্দের সহিত অগ্রসর হইতেন, যেন বরযাত্রিরূপে কোন বিবাহ সভায় যাইতেছেন! এবং যে পর্যন্ত তাঁহাদের দলের কয়েক ব্যক্তি শত্রুসেনা পর্যন্ত পৌঁছিতে না পারিতেন, সে পর্যন্ত দলে দলে কামানে ধ্বংস হইতেন। সে কোন্ উদ্দীপনা ছিল, যাহা তাঁহাদিগকে এমন ভীষণ মৃত্যুমুখে লইয়া যাইত? তাহা কেবল পয়গম্বরের— কোরআনের মহিমা, এবং ইসলামপ্রেম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, (তাঁহাদের) এই ভক্তি পৃথিবীতে ভবিষ্যতেও অটল রহিবে, বরং বর্তমান যুগ অপেক্ষা ভবিষ্যতে আরও উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিবে। (আমীন!)

ভদ্র মহোদয়গণ! এখন আমি আরবীয় পয়গম্বরের সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি প্রমাণ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। তাহা এই যে—পয়গম্বরের "নবুয়তে" সর্বপ্রথমে বিশ্বাস করিয়াছিলেন তাঁহার সহধর্মিণী—যিনি তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের সমুদয় রহস্য অবগত ছিলেন, আর তাঁহার অতি অন্তরঙ্গ আত্মীয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহার আশৈশব জীবনের স্বভাব-চরিত্র সমুদয় উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিলেন। এই যদি আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখেন, তবে, পয়গম্বরের সত্যপরায়ণতা সম্বন্ধে অতি জ্বলন্ত প্রমাণ পাইবেন। আপনারা নিজেরাই বেশ জানেন যে, কোন বিজ্ঞ বক্তৃতানিপুণ ব্যক্তি কোন সভা সমিতিতে গিয়া বেশ ঝাড়া দুই ঘণ্টা উৎকৃষ্ট বক্তৃতা প্রভাবে শ্রোতৃবর্গকে মোহিত ও চমৎকৃত করিয়া স্বমতে তাহাদের বিশ্বাস জন্মাইতে পারে— যেহেতু সে সময় রোকে তাহাকে কেবল বক্তৃতা-মঞ্চেই দেখে; তাহার আভ্যন্তরীণ জীবনের অবস্থা কিছু জানে না। কিন্তু ইহা বড় কঠিন, এমন কি অসম্ভব যে নিজের স্ত্রী, কন্যা, জামাতা প্রভৃতি অতি নিকটবর্তী আত্মীয়গণ তাহার সত্যতার সাক্ষ্য দান করে— যদি সে ব্যক্তি বাস্তবিক তদ্রূপ নির্মল ও সত্যপর না হয়। আমাদের মতে ইহারই নাম "পয়গম্বরী" এবং সত্য বলিতে এমন বিশ্বব্যাপী জয়লাভ হজরত মসিহের (যীশুর) ভাগ্যেও ঘটে নাই।

আরবীয় পয়গম্বরের সমুদয় আত্মীয়বান্ধবদের মধ্যে কেবল তাঁহার পিতৃব্য আবু তালেবই (?) এমন ছিলেন, যিনি কেবল নিজের একগুঁয়ে গোঁড়ামীর জন্য তাঁহার ধর্মমতে (প্রকাশ্যে) বিশ্বাস করেন নাই। তিনি সম্ভ্রান্ত কোরেশ বংশের দলপতি ছিলেন বলিয়া আপন পুরাতন পৈতৃক ধর্ম বিসর্জন দেওয়া নিজের জন্য মানহানিকর বোধ করিতেন; নতুবা তাঁহার কার্যকলাপে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইত যে, তিনি পয়গম্বরের ধর্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। কারণ তিনি রাসুলোল্লাহকে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছিলেন, "হে পিতৃব্যপ্রাণ! তুমি অসঙ্কোচে আপন কর্তব্য পালন করিতে থাক; আমার জীবদ্দশায় কাহার সাধ্য যে, তোমার দিকে কটাক্ষপাত করে?" একদিন আবু তালেব স্বীয় পুত্র হজরত আলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর ধর্ম বিশ্বাস কি? আর তুই মোহাম্মদ (দ) সম্বন্ধে কি মনে করিস?" হজরত আলী অত্যন্ত সম্মান অথচ উৎসাহের সহিত উত্তর করিলেন, "পিতৃদেব! আমি একমাত্র অদ্বিতীয় আল্লাহকে পূজনীয় মনে করি, এবং

মোহাম্মদকে আল্লাহ্‌তালার প্রকৃত প্রেরিত বলিয়া মানি। আর এইজন্য পয়গম্বরের সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইব না।"

ঈদৃশ উত্তর শ্রবণে পিতার অসন্তুষ্টি হইবারই সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু তাহা তো হইল না! বরং তিনি বলিলেন, "পিতৃ-প্রাণ-পুত্তলি! আমি তোমাকে অতিশয় সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ ও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে অনুমতি দিতেছি। যেহেতু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি তোমাকে সুপথ ছাড়া কুপথে পরিচালিত করিবেন না।"

নবুয়তের (পয়গম্বরী) তিন বৎসর পর্যন্ত পয়গম্বর সাহেব নীরবে, বিনা আড়ম্বরে আপন মিশনের কার্য করিতেছিলেন। সে সময় তাঁহার প্রতি বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা মাত্র ৩০ জন ছিল। অতঃপর তিনি প্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতা করিলেন, তাহাতে আল্লাহ্‌তালার একত্বের বিষয় অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং নরবলিদান, বিলাসিতা ও সুরাপান যে অতি কদর্য্য, তাহাও বিশদরূপে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ বক্তৃতার গুণে অনেকের হৃদয়ে বিশ্বাসের জ্যোতি প্রদীপ্ত হইল এবং তাঁহার শিষ্য সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবন্ধকতা-বহ্নিও পয়গম্বর সাহেবের বিরুদ্ধে দেশময় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। বিরোধী দলের হস্তে পয়গম্বর সাহেব যত প্রকার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও নিগ্রহ ভোগ করেন, সাধারণ মানব তাহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত না।

বিধর্মী শত্রুগণ পয়গম্বর সাহেবের ভক্ত, বিশ্বাসী লোককে যখন যেখানে দেখিতে পাইত, তন্মুহূর্তেই হত্যা করিত। কাহারও প্রতি অমানুষিক নির্যাতন করিত। কাহাকে বা হস্ত পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সূর্যের দিকে মুখ করিয়া মরুভূমিতে উত্তপ্ত বালুকার উপরে শয়ান করাইয়া তাঁহার বক্ষের উপর প্রস্তর চাপা দিয়া বলিত, "তুই মোহাম্মদ ও তাহার আল্লাহ্‌কে অস্বীকার কর!" কিন্তু এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও তাঁহারা মোহাম্মদের কলেমা পড়িতে পড়িতে অকাতরে প্রাণত্যাগ করিতেন!

একদা কোন দুরাত্মা জনৈক মুসলমানকে ধরিয়া তাঁহার দেহ হইতে খণ্ড খণ্ড মাংস কাটিয়া ফেলিতেছিল, আর বলিতেছিল, "এ তুই যদি নিজের পুত্র পরিবারের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে ঘরে থাকিতিস, আর তোর স্থলে তোর মোহাম্মদ এইরূপ ছিন্নদেহে ভূমে লুটাইয়া ছট্‌ফট্ করিত তবেই বেশ ভাল হইত!" কিন্তু সেই সত্য ধর্মপ্রাণ মুসলমান মৃত্যু পর্যন্ত এই একই উত্তর দিতেছিলেন, "আমার গৃহ, পুত্র কলত্র— সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, সমুদয় হজরত রসুলের পদতলে উৎসর্গ হউক। আমার সম্মুখে যেন তাঁহার চরণ কমলে একটি কণ্টকও বিদ্ধ না হয়।"

অবশেষে বিরোধী শত্রুগণ পয়গম্বর সাহেব ও তদীয় শিষ্যবর্গকে এত অধিক ক্লেশ দিতে লাগিল যে, তাঁহারা শেষে রসুলের ইঙ্গিতে দেশান্তরে গিয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। পয়গম্বর সাহেবের একদল অনুবর্ত্তী যখন শত্রু-তাড়নায় ব্যস্ত হইয়া হাবশ (আবিসিনীয়া) দেশে গেলেন, তখন শত্রুগণও তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সে দেশে উপস্থিত হইল, এবং তত্রত্য খ্রিস্টান রাজাকে অনুরোধ করিল যে, মুসলমানদিগকে উহাদের হস্তে সমর্পণ করা হউক। রাজা তখন হতভাগ্য প্রবাসীদিগকে ডাকিয়া তাঁহাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "রাজন্! আমরা অজ্ঞতা ও

মূর্খতার সমুদ্রে নিমগ্ন ছিলাম, আমরা ঘৃণিত পৌত্তলিক ছিলাম; আমাদের জীবন দুর্দান্ত পশুপ্রকৃতি নরপিশাচের ন্যায় নীচ ও জঘন্য ছিল; নরহত্যা আমাদের দৈনন্দিন ক্রীড়া ছিল; আমরা জ্ঞানান্ধ, ঈশ্বরদ্রোহী ও ধর্মজ্ঞান বিবর্জিত ছিলাম; পরস্পরের প্রতি স্নেহপ্রীতি বা মনুষ্যত্বের নামগন্ধ আমাদের মধ্যে ছিল না; অতিথি সেবা কিম্বা প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য পালন বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম; আমরা 'জোর যার মুলুক তার' ব্যতীত অন্য বিধিনিয়ম জানিতাম না। আমাদের এই ঘোর দুরবস্থার সময় আল্লাহ্‌তালা আমাদের মধ্যে এমন একজন মানুষ সৃষ্টি করিলেন— যাঁহার সত্যতা (ق ۲ م ى ÷ ب) সাধুতা এবং সরলতার উজ্জ্বল চিত্র আমাদের হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে; সেই ব্যক্তি আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, 'আল্লাহ্ এক, সর্ব কলঙ্ক হইতে পবিত্র, কেবল তাঁহারই উপাসনা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য; আমাদিগকে সত্য অবলম্বন এবং মিথ্যা বর্জ্জন করিতে হইবে; প্রতিজ্ঞা পালনে বিশ্বজগতের প্রাণিবৃন্দের প্রতি স্নেহ মমতা প্রদর্শনে, প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য পালনে যেন বিমুখ না হই; যেন স্ত্রীজাতির প্রতি সদ্ব্যবহার করি, পিতৃহীনের সম্পত্তি আত্মসাৎ না করি; নিয়ম মত দৈনিক উপাসনা ও উপবাস (রোজা) ব্রত পালনে অবহেলা না করি।" রাজন্! আমরা এই ধর্মে বিশ্বাস রাখি এবং এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছি।"

ভদ্র মহোদয়গণ। পয়গম্বর সাহেবের শিষ্যবর্গের বিশ্বাস এবং ধর্মমত এমনই উচ্চ ছিল যে, তাঁহারা প্রাণ হেন প্রিয় বস্তু করতলে লইয়া বেড়াইতেন! আমি আরবীয় পয়গম্বরের সত্যতার ও অকপট হৃদয়ের প্রমাণস্বরূপ আর একটি বিষয় আপনাদের শ্রবণগোচর করিতেছি।

একদা পয়গম্বর সাহেব আরবের কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময় একজন অন্ধ তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, "হে খোদার রসুল" আমাকে পথ দেখাইয়া দাও, আমি সত্য পথ লাভ করিবার আশায় আসিয়াছি।" পয়গম্বর সাহেব বাক্যালাপে অন্যমনস্ক থাকাবশতঃ তাহার উক্তি শ্রবণ করেন নাই। সে পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিল, "হে রসুলোল্লাহ্! আমার কথা শুন, ধর্মপথ দেখাও!" তদুত্তরে তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্তিকর সহিত তাহাকে অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু ইহাতে সে অন্ধ ক্ষুণ্নচিত্তে চলিয়া গেল। পর দিবস পয়গম্বরের প্রতি যে "অহি" (দৈবাদেশ) আসিয়াছিল, যাহা অদ্যাপি কোরআনে লিপিবদ্ধ আছে এবং চিরকাল থাকিবে, তাহার মর্ম এই :

"রসুলের নিকট এক অন্ধ আসিল, কিন্তু সে (রসুল) অবজ্ঞা করিল ও তাহার কথায় ভ্রূক্ষেপ করিল না। তুমি কি করিয়া জান যে, সে পাপমুক্ত হইবে না, উপদেশ গ্রহণ করিবে না এবং সেই উপদেশে সে উপকৃত হইবে না? যে ব্যক্তি ধনী, তাহার সহিতই তুমি সসম্ভ্রম সম্ভাষণ করিতেছ, যদ্যপি সে বিশ্বাসী (ইমানদার) না হইত, তজ্জন্য তুমি অপরাধী হইতে না। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বয়ং সরল হৃদয়ে সত্য ও মুক্তির অন্বেষণে আসিল, তাহার প্রতি মনোযোগ করিলে না। (ভবিষ্যতে যেন আর কখনও এরূপ না হয়)।"

ঐ দৈবাদেশ পয়গম্বর সাহেবের মনে অত্যন্ত ফলপ্রদ হইয়াছিল। তদবধি যখনই তিনি উক্ত অন্ধকে দেখিতেন, তখনই বলিতেন, ইহার আগমন শুভ। যেহেতু ইহারই উপলক্ষে আল্লাহ্ আমাকে শাসন করিয়াছেন। পয়গম্বর সাহেব উক্ত অন্ধকে অত্যন্ত আদর যত্ন করিতেন এবং দুইবার তাহাকে মদিনায় কোন উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ফল কথা এই যে, পয়গম্বর সাহেব কেবল অপরকেই উপদেশ দিতেন না, বরং নিজের আত্মাকে উপদেশ গ্রহণের নিমিত্ত সর্বাপেক্ষা অধিক প্রস্তুত রাখিতেন।

সচরাচর যেরূপ প্রত্যেক পয়গম্বরের সহিত হইয়া আসিয়াছে, সেইরূপ আরবীয় পয়গম্বরের বিরুদ্ধেও সাধারণের বৈরিতারূপ ঝঞ্ঝানিল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ধর্ম সংক্রান্ত শত্রুতা সাধনের নিমিত্ত পয়গম্বর সাহেব ও তদীয় শিষ্যমণ্ডলীর বিরুদ্ধে নূতন বিপদের সূত্রপাত হইতে লাগিল! অবশেষে অবস্থা এমন ভীষণ হইয়া দাঁড়াইল যে পয়গম্বর সাহেব সমুদয় মুসলমানকে আপন আপন প্রাণ লইয়া যত্রতত্র পলায়ন করিতে অনুমতি দিলেন। তখন হজরতের নিকট মাত্র একজন ব্যতীত আর কেহই রহিল না। কিন্তু পয়গম্বর সাহেব স্বীয় কর্তব্য তেমনই নির্ভীক চিত্তে পালন করিতে থাকিলেন। এই সঙ্কট সময়ে তাঁহার অরিকুল তাঁহার প্রাণ বিনাশের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাঁহার পিতৃব্য আবুতালেব আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া সস্নেহে বলিলেন, "হে পিতৃব্য-প্রাণ! কথা শুন, অমূল্য প্রাণ এমন অবহেলায় হারাইস না। আরবের রক্ত পিপাসু খঞ্জরসমূহ তোরই জন্য শাণিত হইতেছে! তুই নিবৃত্ত হ', তোর বক্তৃতা বন্ধ কর।"

তাঁহার কথায় পয়গম্বর সাহেব অতি সাহসের সহিত যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিবার উপযুক্ত বটে। তিনি বলিলেন:

"পিতৃব্যদেব! আমি নিরুপায়। আমি ত কিছুই করি না, কে যেন আমার দ্বারা করাইতেছে। যদি বিধর্ম্মীগণ আমাকে এক হস্তে সূর্য্য অপর হস্তে চন্দ্র দান করিয়া বলে, 'তুমি আপন কার্য পরিত্যাগ কর', তবু নিশ্চয় জানিবেন, আমি এ কার্য হইতে বিরত হইব না— যে পর্যন্ত ঈশ্বরের সেরূপ ইচ্ছা না হয়। অথবা আমি আমার এই সাধনার নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিব। তবে যদি আপনি নিজের জন্য ভয় করেন ত' বলুন, আমি এই মুহূর্ত্তে আপনাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাই— আমার আল্লাহ্ সঙ্গে থাকিবেন।" এই বলিয়া পয়গম্বর সাহেব সাশ্রুনয়নে গমনোদ্যত হইলেন।

কিন্তু পিতৃব্যের স্নেহের উৎস উথলিয়া উঠিল, তিনি ব্যস্তভাবে বলিলেন, "প্রাণাধিক! আমি তোকে কিছুতেই ছাড়িব না। তোর অরিকুল হইতে তোকে রক্ষা করিব। তুই নির্ভয়ে আপন কাজ কর।"

কিন্তু ভদ্র মহোদয়গণ! আরবীয় পয়গম্বরের এই স্নেহময় পিতৃব্য আর অধিক দিন তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পারেন নাই। সেই ঘোর দুর্দ্দিনে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। আর এই বৎসরই তাঁহার পতিপ্রাণা বনিতা খদিজা বিবিও প্রেম-পাশ ছিন্ন করিয়া অনন্ত ধামে প্রস্থান করিলেন। এই সময় বাস্তবিক পয়গম্বর সাহেবের পক্ষে অতি কঠোর শোক ও বিপদাকীর্ণ পরীক্ষার সময় ছিল। রসুলের শত্রুপক্ষ এই সময় প্রবল হইতে প্রবলতর হইল। (আহা! বিপদ কখনও একা আইসে না)।

ক্রমে অবস্থা এমন ভয়ানক হইল যে, পয়গম্বর সাহেব মক্কা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তখন হজরত আলী এবং আবুবকর সিদ্দীক– মাত্র এই দুইজন ব্যতীত, তাঁহার নিকট আর কেহই ছিল না। তমোময়ী নিশীথে পয়গম্বর সাহেব ত আবুবকরকে সঙ্গে লইয়া মদিনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এদিকে হজরত আলী তাঁহার শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন, যাহাতে শত্রুগণ নিশ্চিন্ত থাকে। মোহাম্মদ সাহেবের অরাতিকুল যথাকালে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে তথায় উপস্থিত হইল; বস্ত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া দেখিল, একি! এ ত মোহাম্মদ (দ) নহেন! এ যে আলী শয়ান রহিয়াছেন! উহারা তাঁহাকে কিছু না বলিয়া পয়গম্বর সাহেবের মস্তক আনয়নের নিমিত্ত বহুমূল্য পুরস্কার ঘোষণা করিল।

পয়গম্বর সাহেব যৎকালে একমাত্র সঙ্গী আবুবকর সিদ্দীক সহ গমন করিতেছিলেন, তখন আবুবকর অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্তে কহিলেন, "হে হজরত! আমরা ত মাত্র দুইজন!" তিনি উত্তর করিলেন, "না, না! আমরা তিনজন– ইঁহাদের একজন অতিশয় প্রতাপশালী– সমুদয় বিশ্বজগৎ একদিকে, আর তিনি একা একদিকে।" আবুবকর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "হজরত! সে তৃতীয় জন দ্বারা আপনি কাহাকে বুঝাইতে চাহেন?" উত্তর হইল, "সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত সঙ্গে আছেন।" এ কথায় আবুবকর নিশ্চিত হইলেন।

পয়গম্বর সাহেব মদিনা নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি আশাতীত যত্ন ও সমাদরে গৃহীত হইলেন। শত শত সমাজ-নেতা অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া লইতে আসিলেন, এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। হজরতের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অনুচরবর্গও ক্রমে ক্রমে মদিনায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পয়গম্বরের বিপক্ষগণ সেখানেও তাঁহাকে নিশ্চিন্ত মনে তিষ্ঠিতে দিল না। তাহারা এবার সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া পয়গম্বর সাহেবকে আক্রমণ করিল। তখন পয়গম্বর সাহেবও কেবল আত্মরক্ষা কল্পে স্বীয় ক্ষুদ্র যোদ্ধাদল লইয়া বাহিরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিলেন:

"জগৎপিতা! তুমি সমস্তই দেখিতেছ, এবং সবিশেষ অবগত আছ। অদ্য যদি আমার ক্ষুদ্র সেনাদল বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে তোমার সত্য নাম প্রচার করিবার লোক আর কেহ থাকিবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তুমি সত্যের সহায় হইবে।"

অবশেষে এই প্রথম রক্ত প্রবাহিনী যুদ্ধ– যাহা বদরের যুদ্ধ নামে বিখ্যাত হইয়া গেল। ওদিকে ত সহস্র সহস্র যোদ্ধা ধরাশায়ী হইল, এদিকে একশত বীরও ক্ষয় হইয়াছিল কি না সন্দেহ। কার্যত ইহা সুস্পষ্টই বোধ হইতেছিল যে, মুসলমানদের পক্ষে কোন অদৃশ্য শক্তি যুদ্ধ করিতেছিল, তাই স্বল্প সময়ের মধ্যেই মোসলেমগণ সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। পয়গম্বর সাহেবের জীবনে এই প্রথম রক্তপাত– যাহা তিনি অনন্যোপায় ইহায় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নতুবা তিনি এমন দয়ার্দ্রহৃদয় ও বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন যে, দুর্ধর্ষ লোকেরা তাঁহাকে ভীরু ও কাপুরুষ বলিত। এইরূপে কয়েকবার আরবের মোসলেম-বিদ্বেষিগণ মহা সমারোহে যুদ্ধায়োজন লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে, এবং পয়গম্বর সাহেব শুধু আত্মরক্ষা– শিষ্যমণ্ডলীর প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন। পরন্তু সর্বদা সত্য ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁহার সঙ্গে থাকায়

বিজয়ের উপর বিজয় লাভ করিতে থাকিলেন। এবং অযাচিত প্রভুত্ব লাভ করিলেন। এমনকি তিনি স্বাধীন রাজার ন্যায় সমগ্র আরব উপদ্বীপে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

এই সময় পয়গম্বরের অতীত ও বর্তমান জীবনে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইল। পূর্বে লোকে তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিলে তিনি তাহার প্রতিশোধ না লইয়া তাহাদের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করিতেন। এখন তিনি সৈন্য সেনানী ও যথাবিধি সমরায়োজন রাখিতে বাধ্য হইলেন– যাহা একজন সম্রাটকে করিতে হয়। এবং অপরাধীকে শাস্তিদান করিতেও হইত। কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি অতি উচ্চ আদর্শের দয়া ও ন্যায় বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন।

পয়গম্বর সাহেবের জন্মের পূর্বের অর্থাৎ যে সময়কে আরবীয় মুসলমানদের মূর্খতার যুগ বলা হয়, যুদ্ধে ধৃত বন্দীগণের প্রতি এমন নৃশংস নির্যাতন করা হইত যে, তাহার তুলনা নিতান্ত অসভ্য বর্বর জাতির মধ্যেও পাওয়া কঠিন। কিন্তু পয়গম্বর সাহেবের সময়ে যুদ্ধে ধৃত বন্দীদিগের প্রতি যেরূপ সদয়, সুভদ্র ব্যবহার করা হইত, তাহার আদর্শ অদ্যাপি কোন অতি সভ্য দেশ ও সমাজে পাওয়া যাইবে কি না, সন্দেহ। একদা রণযাত্রাকালে তাঁহাদের সমভিব্যাহারে একদল বন্দী ছিল। খাদ্য সামগ্রীতে (রসদে) আটা অল্প ছিল বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল; তচ্ছ্রবনে রসুলোল্লাহ আদেশ দিলেন যে, বন্দীদিগকে রুটি দান করা হউক, আর স্বাধীনেরা খর্জ্জূর ভক্ষণ করুক। (কি মহত্ত্ব!)

আর একবারের ঘটনা এই যে, যুদ্ধ জয়ের পর, লুণ্ঠিত দ্রব্য যখন বণ্টন করা হইল, তখন পয়গম্বর সাহেব স্বীয় নিকটবর্তী প্রিয় সহচরবৃন্দকে ভাগ লইতে দিলেন না। ইহাতে তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়া পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন। পয়গম্বর সাহেব তাহা অবগত হইয়া, সহচরদের ডাকিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ! তোমরা জান, পূর্বে তোমরা কিরূপ বিপন্ন ছিলে, আল্লাহ্ তোমাদের বিপন্মুক্ত করিয়াছেন; তোমরা একে অপরের রক্ত পিপাসু ছিলে, প্রভু তোমাদিগকে এখন ভ্রাতৃপ্রেম দান করিয়াছেন; তোমরা কোফরের (অধর্মের) অন্ধকারে কারারুদ্ধ ছিলে, তিনি বিশ্বাসের নির্মল জ্যোতিতে তোমাদের মন আলোকিত করিয়াছেন। তাঁহার এই সকল অনুগ্রহপুরস্কার কি তোমরা প্রাপ্ত হও নাই?" তাঁহারা এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ আমাদের অবস্থা বাস্তবিক এইরূপই ছিল, এবং এখন যে সুখ সম্পদ ভোগ করিতেছি, আল্লাহ্তায়ালারই অনুগ্রহে এবং আপনার দয়ায় আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে।" তিনি উহাদের কথায় বাধা দিয়া বলেন, "না, না; বল যে কেবল খোদার অনুকম্পা ছিল। আর যদি তোমরা এইরূপ বলিতে ত' আমিও সাক্ষ্য দিতাম। আমার সম্বন্ধে তোমরা ইহা বলিতে পার যে, তুমি এখানে পলায়ন করিয়া আসিয়াছ, আমরা তোমায় আশ্রয় দিয়াছি; তুমি দুঃখচিন্তা ভারাক্রান্ত ছিলে, আমরা তোমায় শান্তনা দিয়াছি।" (এ কথায় তাঁহারা কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহাদিগকে মৌনাবলম্বন করিতে দেখিয়া) পুনরায় পয়গম্বর সাহেব বলিলেন, "হে প্রিয় সহচরবৃন্দ! লুণ্ঠিত দ্রব্যের বিনিময়ে কি তোমরা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর না? খোদার কসম! খোদার সমস্ত রাজ্য বিপক্ষে দাঁড়াইলেও মোহাম্মদ আপন সহচরদের পক্ষে থাকিবে, যেহেতু তাঁহারা বিনা স্বার্থে– শুধু ঈশ্বরোদ্দেশে কষ্ট স্বীকার করিতেছেন।"

পয়গম্বর সাহেবের এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার সুফল এমন হইল যে, উক্ত সহচরগণ—যাঁহারা মরিতে মারিতে নির্ভীক, শৌর্য বীর্যে সিংহ-তুল্য জাতি ছিলেন, এক্ষণে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন; "হে রসুলোল্লাহ্! আমাদের বর্তমান অবস্থায় সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

আমার হিন্দু ভ্রাতৃগণ! আপনারা বাস্তবিক আরবীয় পয়গম্বরের অবস্থা কিছুমাত্র অবগত নহেন। আপনারা এ অলৌকিক ঐশিক শক্তি দেখিতে সক্ষম নহেন, যাহা তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্যকে কষ্ট স্বীকার ত তুচ্ছ—মৃত্যুর সম্মুখীন করিয়াছে; যাহা কোটি কোটি লোকের অন্তরে ঈশ্বর প্রেম অঙ্কিত করিয়াছে আপনার আরবীয় পয়গম্বরের নিরহঙ্কার ভাবও আত্মত্যাগের বিষয় একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন ত! তিনি অনুবর্তিগণকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন যে তাঁহাকে যেন কেহ দেবতা কিম্বা অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান না করে। তিনি বারম্বার বলিয়াছেন, "আমি তোমাদেরই মত মানুষ, এইমাত্র প্রভেদ যে, আমি তাঁহার (খোদার) দূত, তাঁহার সংবাদ তোমাদিগকে পৌঁছাই।" পয়গম্বর সাহেবের নিরভিমান ও সরলতার প্রমাণ এতদপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে। যে সময় তিনি রাজাধিরাজ সম্রাট ছিলেন, তখন স্বহস্তে আপন জীর্ণবস্ত্রে চীর সংলগ্ন করিতেন— ছিন্ন পাদুকা স্বহস্তে সেলাই করিতেন! তাঁহার শান্ত স্বভাব সম্বন্ধে তদীয় ভৃত্য আনাস বলিয়াছেন, "আমি দশ বৎসর তাঁহার নিকট ছিলাম, তিনি কদাচ অপ্রিয় বচন কহিবেন দূরে থাকুক, আমাকে 'তুই' পর্যন্ত বলেন নাই।" (হাদীস শরীফে তুই শব্দের উল্লেখ নাই), ভ্রাতৃগণ! এমনই আড়ম্বরশূন্য জীবন ছিল সেই সম্রাটের, যিনি ইচ্ছা করিলে পরিচর্যার জন্য সহস্রাধিক দাস দাসী রাখিতে পারিতেন।

আরবীয় পয়গম্বর যে 'মিশনের' জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সমাধা করিলে পর সেই (দারুণ) সময় আসিল, যখন একদিন (মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে) রোগক্লিষ্ট অবস্থায় তিনি বহু কষ্টে নমাজের নিমিত্ত মসজিদে আনীত হইলেন। (নমাজ শেষ হইলে) তিনি আপন পীড়িত ক্ষীণ কণ্ঠ যথাশক্তি উচ্চ করিয়া বলিলেন, "হে মুসলমানগণ! তোমরা সাধারণে ঘোষণা করিয়া দাও, যদি আমি এ জীবনে কাহারও প্রতি অত্যাচার অবিচার করিয়া থাকি, তবে সে অদ্য আমা হইতে প্রতিশোধ লউক, পরলোকের জন্য যেন স্থগিত না রাখে। যদি কাহারও কিছু প্রাপ্য থাকে, সে ঋণ শোধের নিমিত্ত আমার ঘরদ্বার তাহাকে সমর্পণ করিতেছি। অদ্য আমি সকল প্রকার জবাবদিহির জন্য উপস্থিত আছি।"

একজন বলিল, হজরতের নিকট তাহার ত্রিশ 'দেরেম' পাওনা আছে, তাহা রসুলোল্লাহ তন্মুহূর্তে শোধ করিলেন। এই তাঁহার মসজিদে শেষ আগমন। অতঃপর ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ৮ জুন আরবীয় পয়গম্বর নশ্বর মৃন্ময় দেহত্যাগ করিলেন, যাহাতে অতি উচ্চ অনন্তধামে গিয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠিত ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারেন। এই জীবন অতি উচ্চ, পবিত্র বিস্ময়কর এবং বাস্তবিক খোদার পয়গম্বরেরই যোগ্য ছিল। (অবশ্য, সাধারণ মানবের জীবন এরূপ হওয়া অসম্ভব)।

ভদ্র মহোদয়গণ! এখন আপনাদিগকে আরবীয় পয়গম্বরের প্রতি যে সব অন্যায় দোষারোপ করা হয়, তাহার বিষয় বলিতেছি। অনভিজ্ঞতা ও ন্যায়ান্যায় জ্ঞানাভাবে, অথবা শুধু কুসংস্কারবশত রসুলের প্রতি ঐসব দোষারোপ করা হইয়া থাকে। তাঁহার একতম দোষ এই বলা হয় যে, তিনি জীবনের শেষভাগে সর্বশুদ্ধ ৯ জন মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি বিবাহ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু আপনারা কি আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন যে, সেই ব্যক্তি, যিনি ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত কোন প্রকার "মকারাদি" কু অবগত ছিলেন না, পরে নিজের অপেক্ষা অনেক অধিক বয়স্কা একটি বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহারই সহিত অতি সুখে জীবনে ২৬টি বৎসর যাপন করিলেন; তিনি শেষ বয়সে, যখন মানুষের জীবনীশক্তি নির্বাপিত প্রায় হয়, শুধু আত্মসুখের জন্যই যে কতকগুলি বিবাহ করিবেন, তাহা কি সম্ভব? যদি ন্যায় বিচারের সহিত বিবেচনা করেন, তবে আপনারা বেশ জানিতে পারিবেন— সে বিবাহের উদ্দেশ্য কি ছিল। প্রথমে দেখিতে হইবে, তাঁহারা (হজরতের পত্নিগণ) কোন শ্রেণীর কুলবালা ছিলেন, আর কেনই বা তাঁহাদের রসুলের প্রয়োজন ছিল।—কতিপয় নারী এরূপ ছিলেন যে তাঁহাদের বিবাহের ফলে রসুলের পক্ষে 'নূর-ইসলাম' প্রচারের সুবিধা হইল। আর কয়েকজন এরূপ ছিলেন যে, বিবাহ ব্যতীত তাঁহাদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের অন্য কোন উপায় ছিল না।

আরবীয় পয়গম্বরের প্রতি আর একটি দোষারোপ এই করা হয় যে, তিনি রক্তপাতের প্রশ্রয় দিতেন এবং কারণে অকারণে কাফের হত্যা করিতে আদেশ দিতেন। এখন এ সম্বন্ধে আপনারা আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। যখন আইনের দুই দফা প্রায় একই প্রকার হয় অর্থাৎ একটি কোন শর্তের অধীন এবং অপরটি শর্তবিহীন তখন শর্তহীন ধারাও সর্বদা শর্তাধীন ধারা বলিয়াই মানিতে হয়। মুসলমানদের শাস্ত্রকারগণ সর্বদা এ বিষয়ের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন এবং কোরআনের বচনসমূহেও একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যথা একস্থলে বলা হইয়াছে, "কাফেরকে হত্যা কর", এবং অপর স্থলে বলা হইয়াছে, "হত্যা কর, যদি তাহারা তোমাদের ধর্মকর্মে বাধা দেয়।" এখন আমি আপনাদিগকে সেই মূলবচনসমূহের— যাহা রসুলের প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে, শাব্দিক অনুবাদ শুনাইতেছি। আমি নিজের ভাষায় বলিব না, কারণ যদি আপনারা মনে করেন যে আমি তাঁহাদের (মুসলমানদের) ধর্মপ্রচার করিতেছি। তবে শ্রবণ করুন :

"যদি তাহারা তোমাদের প্রতি শত্রুতাচরণ হইতে নিবৃত্ত হয়, তবে যাহা হইয়া গিয়াছে, ক্ষমা করা যাউক। কিন্তু যদি তাহারা তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়, তবে পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণের নিমিত্ত যেরূপ শাস্তি দেওয়া গিয়াছে সেইরূপ শাস্তি ভোগ করিবে। এজন্য উহাদের সহিত যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত উহারা পৌত্তলিকতা রক্ষার নিমিত্ত তোমাদের বিরুদ্ধাচরণে নিবৃত্ত না হয় এবং অদ্বিতীয় খোদার ধর্মকে অমান্য করে, যুদ্ধ করিতে থাকে। আর যদি তাহারা মানে তবে নিশ্চয় জানিও আল্লাহ তাহাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন। কিন্তু যদি তাহারা সত্যধর্মের বিরোধী হয় তবে আল্লাহ তোমাদের সহায় হইবেন। তিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অভিভাবক এবং সাহায্যকর্তা।"

আর একটি বিষয়, যাহা পয়গম্বরকে উপদেশ দানের নিমিত্ত কোরআনে অবতীর্ণ হইয়াছে, আপনাদের শ্রবণগোচর করিতেছি ;

"মনুষ্যদিগকে নম্র মৃদু ভাষায় যুক্তি সহকারে উপদেশ দিয়া আল্লাহতালার ধর্মপথে আহ্বান কর; তাহাদের সহিত অতিশয় ধৈর্য ও গাম্ভীর্যের সহিত সদয়ভাবে তর্ক কর, কেন না উহাদের কে সত্য পথ ভুলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছে এবং কে সত্যপথে আছে তাহা আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত আছেন। যদি তুমি প্রতিশোধ লও তবে লক্ষ্য রাখিও যে তাহা তোমার প্রতি যে অত্যাচার অনাচার হইয়াছে (ন্যায় বিচার অনুসারে) তাহার সমান হয়; আর যদি তুমি প্রতিশোধ না লইয়া সহ্য কর তবে সাবের (সহিষ্ণু) ব্যক্তির পক্ষে আরও ভাল কথা। সুতরাং ভাল হয় যদি শত্রুদের প্রপীড়ন ধীরতার সহিত সহ্য কর। কিন্তু স্মরণ রাখিও তোমার কার্যকলাপ তবেই সফল হইবে, যখন তাহার সহিত আল্লাহ্তালার অনুগ্রহ মিশ্রিত থাকিবে। কাফেরদের ব্যবহারে দুঃখিত হইও না এবং উহাদের চাতুরী শঠতায়ও ব্যতিব্যস্ত হইও না, কারণ আল্লাহ্ তাহারেই সাহায্য করেন— যাহারা সাধু ও ন্যায়পরায়ণ হয় এবং তাহাকে ভয় করে।"

আর একটি উপদেশ শ্রবণ করুন;— "ধর্ম কর্ম ব্যাপারে কাহারও প্রতি অত্যাচার করিও না; যদি সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তবে বুঝিও আল্লাহ্ তাহাকে সৎপথ প্রদর্শন করিয়াছেন, আর যদি ধর্ম স্বীকার না করে তবে আর কি করা— তোমার কাজ ত কেবল উপদেশ দান ও প্রচার করাই ছিল।"

আরও শ্রবণ করুন,— পয়গম্বর সাহেব কাফেরের কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, "কাফের তাহারাই যাহারা ন্যায় বিচারের বিপরীত কার্য করে; পাপী কেবল তাহারাই যাহারা ইসলাম ধর্মের বাহিরে।" ইহাতে সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ইসলাম ধর্মের বৃত্তি (ﻯ ﺮ ﺖ ﺐ) তত সঙ্কীর্ণ নহে যে কেবল পয়গম্বর সাহেবের শিষ্যবর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে।

আর একস্থলে (প্রত্যাদেশ) আসিয়াছে যে "যদি তাহারা তোমাদের বিরোধী হইয়া যায় কিন্তু তোমাদের সহিত যুদ্ধ কলহ না করে আর তোমাদের সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করে তবে তাহাদিগকে হত্যা করা কিম্বা তাহাদের বশীভূত করিতে চেষ্টা করা ঈশ্বরাদেশের বিরুদ্ধ।"

উপস্থিত মহোদয়গণ আপনারা কি বলিতে পারেন যে ইহা ন্যায় বিচারের কথা হইবে যে আমরা পয়গম্বর সাহেবের তাদৃশ মিলনপ্রয়াসী শান্তিসূচক বচনসমূহের প্রতি— যাহা সেরূপ যুদ্ধ কলহ এবং অত্যাচারের যুগে বলা হইয়াছিল, একটু মনোযোগ না করি, আর কেবল ঐ সকল বচন, যাহা তিনি কোন এক ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হইবার সময় উৎসাহিত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, সেগুলিকে ধরিয়া লই? আর আমার মতে যে কোন সেনাপতি এরূপ স্থলে থাকিতেন, তিনি এতদপেক্ষা অধিক যোগ্যতার কাজ আর কি করিতেন?

বেশ, এখন আপনারা সেই শান্তিপ্রিয়তা শিক্ষার আর একটি দৃষ্টান্ত, যাহা পয়গম্বর সাহেবের স্বকীয় ব্যবহারে দেখা যায়, একটু সমালোচনা করিয়া দেখুন ত অত্যাচার এমন কোন ছিল না, যাহা পয়গম্বরের প্রতি করা হয় নাই,— আর তিনি তাহা ক্ষমা না

করিয়াছেন; কোন নির্যাতন এমন হয় নাই যাহা তিনি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত না ছিলেন। হে ভ্রাতৃগণ! কোন ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থা জানিতে হইলে তাঁহাকে ঠিক সেইভাবে দেখুন যে অবস্থায় তিনি বাস্তবিক থাকেন, কুসংস্কারের চশমা পরিয়া দেখিবেন না।

প্রত্যেক ধর্মেই কিছু না কিছু দোষ জন্মিয়াই থাকে; সমস্ত সাধু প্রকৃতি লোকের কার্যকলাপে কোন না কোন দোষ থাকেই, বিধর্মী এবং মূর্খ শিষ্য একে আর বুঝিয়া থাকে। কোন ধর্ম দেখিতে হইলে সেই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে দেখা উচিত; তাহা না করিয়া কোন নরাধমকে দেখিয়াই তাহাকেই দৃষ্টান্ত বলিয়া ধারণা করা অন্যায়। তবেই আমরা একে অপরকে ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিতে শিখিব এবং বন্য অসভ্যদের মত একে অপরকে ঘৃণার চক্ষে দেখিব না।

আমার দুঃখ হইতেছে যে সময়াভাবে আমি ইসলামের শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারলাম না। যদিও সে বিষয়টিও আপনাদের ভাল লাগিত কিন্তু তাহা তত প্রয়োজনীয় নয় বলিয়া আমি এস্থলে সে বিষয় পরিত্যাগ করিলাম।

প্রত্যেক ধর্মেই বাহ্যিক অবস্থার পরে দর্শন থাকে। যদি এ সময় ইসলামের বর্তমান অবস্থায় আমরা তাহার স্বল্পতা দেখিতেছি, (তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই) কারণ, আমরা যখন সেই সময়ে– যখন ইসলামের জ্যোতি আরম্ভ হইয়াছিল, দৃষ্টিপাত করি তাহার গুণ ব্যাখ্যার উপযুক্ত ভাষা ও শব্দ পাই না।

এখন আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, আরবীয় পয়গম্বর তের শত (১৩০০) বৎসর পূর্বে শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন;– "বিদ্যা শিক্ষা কর; যে বিদ্যা শিক্ষা করে সে নির্মল চরিত্র হয়; যে বিদ্যার চর্চা করে সে ঈশ্বরের স্তব করে; যে বিদ্যা অন্বেষণ করে সে উপাসনা (এবাদত) করে; যে উহা শিক্ষা দেয় সেও উপাসনা করে; শিক্ষাই সুপথ প্রদর্শন করে; শিক্ষাই নির্জনে নির্বাসনে প্রকৃত বন্ধুর কাজ করে; বনবাসে সান্ত্বনা প্রদান করে; বিদ্যা আমাদিগকে উন্নতির মার্গে লইয়া যায় এবং দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে। বন্ধু সভায় বিদ্যা আমাদের অলঙ্কার স্বরূপ; শত্রু সম্মুখে অস্ত্র স্বরূপ। বিদ্যার দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার বিপন্ন দাস পুণ্যের সর্বোৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়।"

পয়গম্বর সাহেবের নিম্নোক্ত বচনসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমি ভক্তিপ্রেমে অভিভূত হইয়া পড়ি। তিনি বলিয়াছেন, "বিদ্বানের (লিখিবার) মসী শহীদ (ধর্মার্থ সমরশায়ী)-দের রক্তাপেক্ষাও অধিক মূল্যবান।" ভ্রাতৃগণ! বিদ্যার গৌরব বর্ণনা এতদপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে?

হজরত আলী যিনি পয়গম্বর সাহেবের প্রিয় জামাতা ছিলেন, আর যাঁহার সম্বন্ধে পয়গম্বর সাহেব বলিয়াছেন যে "আলী ইসলামে বিদ্যা জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ।" মুসলমানদের মধ্যে হজরত আলীই প্রথমে এল্‌মে-এলাহী প্রচার আরম্ভ করেন। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হজরত আলীর যে সকল বক্তৃতা আছে তাহা পাঠের উপযুক্ত। তিনি যুদ্ধ বিগ্রহের সময় ও (যুদ্ধক্ষেত্রে) ধর্ম বক্তৃতা (খোতবা) পাঠ করিতেন।

বিদ্যার প্রশংসা বিষয়ে আলীর রচনাবলী হইতে কয়েকটি আমি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

"অন্তর আলোকিত করিবার জন্য সুশিক্ষা উজ্জ্বল রত্ন; সত্য তাহার (বিদ্যার) লক্ষ্য; ঈশ্বরত্ব (এলহাম) তাহার পথ-প্রদর্শক; বুদ্ধি (সুবোধ?) তাহাকে গ্রহণ করে; মানবের ভাষায় বিদ্যায় যথোচিত প্রশংসা হইতে পারে না।"

ওদিকে মুসলমানেরা দেশসংক্রান্ত কর্তব্যসাধনে মগ্ন ছিলেন, এদিকে হজরত আলীর শিষ্যবর্গ শিক্ষা বিস্তার করিতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা যেখানেই যাইতেন শিক্ষার মশাল সঙ্গে লইয়া যাইতেন, তাহার ফলে এই হইল যে খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামের শিশুদের হস্তেও শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রদীপ দেওয়া হইয়াছিল। যেখানে তাঁহারা দেশ জয় করিতেন, সেইখানেই পাঠশালা ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতেন। ইহার প্রমাণস্বরূপ কাহেরা, বাগদাদ, হিসপানিয়া এবং কার্ডাভার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ প্রদর্শন করিতেছি।[১]

ইংল্যান্ডের লোকদিগকে মুসলমানরাই তাহাদের বিস্মৃত বিদ্যার বর্ণমালার পুস্তকাবলী অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। তাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, ভারতবর্ষের অসংখ্য বৈজ্ঞানিক পুস্তকের অনুবাদ করাইয়াছেন; রসায়ন এবং অঙ্কশাস্ত্রের পুস্তকাবলি রচনা করিয়াছেন।

জনৈক পোপ (দ্বিতীয় মিস্‌লউটিয়র) যিনি খ্রীস্টীয় ধর্মের অতি উৎকৃষ্ট পণ্ডিত ও গুরু ছিলেন, তিনি মুসলমানদেরই কার্ডাভা মাদ্রাসায় অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই কারণে লোকে তাঁহাকে বিধর্মী বলিয়া জনসমাজে অপদস্থ করিয়াছিল এবং তাঁহাকে "শয়তানের বাচ্চা" বলিয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় সে সময় ইউরোপের খ্রিস্টীয় বিভাগ কেমন ঘোর মূর্খতায় তমসাচ্ছন্ন ছিল, আর কেবল ইসলামের অনুবর্তিগণই তাঁহাদিগকে (ইউরোপীয়দিগকে) জ্ঞানের আলোকরশ্মি দেখাইতেছিলেন।

মুসলমানেরা শিল্প এবং আবিষ্কারেও পশ্চাৎপদ ছিলেন না। অনুবীক্ষণ তাঁহারাই নির্মাণ করেন; পৃথিবীর দৈর্ঘ্য-প্রস্থের পরিমাণ তাঁহারাই স্থির করেন। গ্রীকদের নিকট হইতে তাঁহারা অঙ্কবিদ্যালাভ করেন, সঙ্গীত ও কৃষিবিদ্যাকে তাঁহারা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই পর্যন্ত করিয়াই নিশ্চিত ছিলেন না, বরং ধর্মের দর্শন তত্ত্বের অতি সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া "ফানাফিল্লাহ"র গূঢ় তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন! তাঁহারা প্রচার করিলেন যে আল্লাহ অদ্বিতীয় এবং সমুদয় মানবজাতি এক জাতীয় (মানবের মধ্যে জাতিভেদ নাই)। আর এই বিধান তাঁহারা অতি মনোরম ভাষায় বুঝাইয়াছেন।

হে হিন্দু ভ্রাতৃগণ! আপনারা যদি ঐ শাস্ত্রবিধানসমূহের বিষয় চিন্তা করেন ত আপনারা উহাকে প্রকৃত (আসল) বেদান্ত স্বরূপ পাইবেন; মুসলমানদের মধ্যে পূর্ণ ছয় শত বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। অদ্য যদি আমার মুসলমান ভ্রাতৃগণ নিজেদের ঐ সকল জগন্মান্য পূর্বপুরুষদের রচিত শিক্ষা সংক্রান্ত পুস্তকাবলি আধুনিক প্রচলিত ভাষায় অনুবাদ করিয়া লয়েন এবং স্বর্বসাধারণে ঐ শিক্ষা প্রচার করেন তবে আমার দৃঢ়বিশ্বাস তাঁহারা ইসলামী দর্শনকে সমস্ত জগতের শীর্ষস্থানে তুলিতে সক্ষম হইবেন। আর ইসলামের আবালবৃদ্ধবনিতা—(কচি কচি শিশুগণ) ও ইসলামী দর্শন কণ্ঠস্থ করিতে পারিবে। (যেমন হিন্দুগণ এখন আপন বেদান্ত প্রচারে

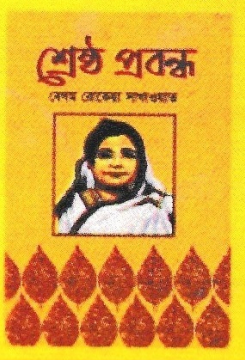
মনোযোগী হইয়াছেন)। আপনারা ভাবিয়া দেখিতে পারেন যে তাঁহারা ইসলামের প্রকৃত গৌরব সৃষ্টি জগৎকে দেখাইবার জন্য কিরূপে ধর্মের সেবা করিয়াছেন।

হজরত মোহাম্মদ, হজরত ঈসা, রজদশ্‌ত, মুসা, মহর্ষি বুদ্ধদেব— সকলে একই অট্টালিকায় আছেন। তাঁহারা এক জাতি হইতে অন্য জাতিকে ভিন্ন মনে করেন না। আর আমরা যে তাঁহাদের সামান্য শিষ্য তাঁহাদের শিশু সন্তান— আমাদের উচিত যে তাঁহাদের বিশ্বপ্রেমের সারতত্ত্ব লাভ করি। প্রেম দ্বারাই তাঁহারা আমাদের নিকটবর্ত্তী হন। পয়গম্বর মোহাম্মদ সাহেব স্বেচ্ছায় স্বীয় শিষ্যের নিকটবর্তী হন না, যে পর্যন্ত শিষ্য মনের কঠোরতা দূর না করে এবং তাহার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার না হয়।

হে আমার মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ! পয়গম্বর সাহেব যেমন আপনাদের সেইরূপ আমাদেরও আপন। যত পয়গম্বর মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলের উপরই আমাদের দাবি (হক) আছে। আমরা তাঁহাদিগকে ভালবাসি, তাঁহাদের সম্মান করি এবং তাঁহাদের সম্মুখে অতি নম্রভাবে ভক্তি সহকারে মস্তক অবনত করি।

খোদার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, তিনি সকলেরই আল্লাহ;— তিনি আমাদিগকে এইরূপ বুঝিবার শক্তি দান করুন যে তাঁহার নামের জন্য যেন আমরা পরস্পর ঝগড়া না করি— আমাদের শিশুসুলভ দুর্বল অধরে যে নামই উচ্চারিত হউক না কেন— কিন্তু তিনিই ত অদ্বিতীয় এবং সকলেরই উদ্দেশ্য (উপাস্য) একমাত্র তিনিই।

———



কথাশিল্প প্রকাশন